বিদ্রোহী কৈবর্ত

সত্যেন সেন

বুক হোম
৩২ কলেজ রো, কলিকাতা-৪

প্রকাশক :
তড়িৎ কুমার মজুমদার
বুক হোম
৩২, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : স্বখেন গুপ্ত

মুদ্রক :
রাজধানী প্রিন্টিং
১১৭।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য : নয় টাকা

বিদ্রোহী কৈবর্ত

স্বর্গত মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহাভারত পাঠ হচ্ছিল। মহারাজের মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বৎসরই এ উপলক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠ করা হয়ে থাকে। পাঠ পুরো এক মাস চলবে। লোক সমাগম মন্দ হয় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই আসে। জাতি ধর্ম বয়স নির্বিশেষে মহাভারত সকলের কাছেই অতি প্রিয়। বহুবার শুনে শুনেও তৃপ্তি হয় না।

বিশেষ করে এবার যিনি পাঠ করছেন, বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। অতি সুললিত তাঁর কণ্ঠস্বর, আর অপূর্ব তাঁর ব্যাখ্যা আর প্রকাশভংগি সেই জন্যই এবার লোকের ভিড় আরও বেশী। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

পাশা খেলায় রাজ্য হারিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদী বনবাসে চলেছেন, পাঠক ঠাকুর সেই কাহিনী তাঁর নিজস্ব ভংগিতে বর্ণনা করে চলেছেন। নগরের লোক মাথা চাপড়ে বিলাপ করছে: দুর্দিন! দুর্দিন! আমাদের অদৃষ্টে আর সুখ শান্তি নেই। এই অধর্মের রাজ্য কখনোই টিকতে পারবে না। চারদিকে কি সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে! দেখ না, দিনের বেলায়ই শিবারা কেমন অশুভ ডাক ডেকে উঠছে। আর দিবালোকে এমন উল্কাপাত, এ কি দেখেছে কেউ কখনও!

প্রাসাদকক্ষে গান্ধারী অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাচ্ছেন, মহারাজ, আমার মিনতি শুনুন। এখনও ওদের পাঁচ ভাইকে ফিরিয়ে আনুন,

ওদের ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন। ওরা তো বেশী চায় না, এতেই ওরা সন্তুষ্ট থাকবে।

তা আর হয় না, হয় না রানী, দুর্যোধন এতে কিছুতেই সম্মত হবে না। সে কারও কথাই মানবে না। ভাল হোক আর মন্দ হোক, যা হবার হয়ে গেছে। একে আর ফেরানো যাবে না।

কেন যাবে না, নিশ্চয় যাবে। দুর্যোধন যদি মানতে না চায়, ওকে বন্দী করে রাখুন। ও তো পুত্র নয়, কুলের কলঙ্ক। ওর পাপে আমরা সবাই পাপী। আর সেই পাপে সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

রানী, তুমি কি পাষাণ? বার বার সেই একই কথা বলবে। পরের পুত্রের জন্য নিজের পুত্রদের বিসর্জন দেব, মা হয়ে এমন কথা কেমন করে বলছো তুমি?

হ্যাঁ, মা হয়েও এ কথা বলতে হয় আমাকে। এ অনাচার ধর্মে সইবে না। তাই তো যে দিকে তাকাই সেই দিকেই নানা রকম দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

রানী, আমি সকল দিক দিয়েই অন্ধ, তুমি যতই দেখাও, আমি কিছুতেই দেখতে পাব না।

মহারাজ, ঘরে বাইরে সবাই বলছে, যে রাজ্যের রাজা তার ভাইদের উপর এমন অধর্ম করে, সে রাজ্যের কল্যাণ নেই।

রানী, আমি শুধু অন্ধ নই, বধিরও। তুমি যতই শোনাও আমি কিছুতেই শুনব না। হয় না, হয় না, হয় না, যে পথ দিয়ে এত দূর এগিয়ে এসেছি, সেই পথই নির্ধারিত পথ। এখন আর ফেরবার উপায় নেই।

মহারাজ বিগ্রহপালের বিধবা পত্নী রাষ্ট্রকুটনন্দিনী শংখদেবী মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আসনে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। পাঠক ঠাকুরের কাহিনীর দিকে তাঁর মন ততটা নেই, তাঁর কান উচ্চকিত হয়ে আছে তাঁর কাছাকাছি যে সব মেয়েরা আছে তাদের বলাবলির দিকে। কিন্তু

সে কথা বুঝবার উপায় নেই। তাঁর স্থির নিষ্কম্প মুখে, তাঁর উদাস দৃষ্টিতে কৌতূহলের রেখা মাত্র নেই। তাঁর মুখের দিকে তাকালে সম্ভ্রম জাগে, আর জাগে সহানুভূতি। কিন্তু সেই সহানুভূতি মুখে প্রকাশ করবার মত সাহস নেই কারও। লোকমুখে এ কথা প্রচলিত হয়ে এসেছে মহারাজ বিগ্রহপাল তাঁর শেষ বয়সে নামেই মাত্র রাজা ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও রাজদণ্ডটা মহারানী শংখদেবীর হাতে ন্যস্ত ছিল। আজ তাঁর সপত্নী পুত্রের রাজত্বে তাঁর এই দুর্দশা। তাঁর উপযুক্ত পুত্র কুমার রামপাল কারাগারে, আর তিনি নিজেও প্রাসাদে বন্দী জীবন যাপন করে চলেছেন। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল প্রকাশ্যে তাঁকে রাজমাতার সম্মান দিলেও ভিতরের কথাটা জানতে লোকের বাকী নেই। এককালে যিনি রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, এখন তাঁর স্বাধীন ভাবে চলবার ফিরবার, মন খুলে কথা বলবার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে তার সামান্য আভাসটুকুও পাবার যো নেই। কারাগারে বন্দী পুত্রের কথা মনে করে কেউ কোন দিন তাঁকে কাঁদতে দেখে নি। লোকে আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করে, কর্ণাটের মেয়েদের মন যেন লোহা দিয়ে গড়া। আমাদের গৌড়ের মেয়ে হলে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। কথাটা মিথ্যে নয়, শংখদেবী যেমন কাঁদতে জানেন না, তেমনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেও জানেন না। তাঁর চলা বলা ভাব ভংগি সব কিছুই অতি সংযত—নিস্তরংগ প্রশান্ত সমুদ্রের মত। সেই জন্যই তাঁর মনের ভিতরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মহাভারতের কাহিনী শুনতে শুনতে মেয়েরা নানা জনে নানা-রকম কথা বলে চলেছিল। একজন বলছিল, যুধিষ্ঠির তো দুর্যোধনের বড় ভাই, আর দুর্যোধন তার সংগে এমন ব্যবহারটা করল! ছি ছি! আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একজন তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল, আহ্ তুই থামতো নেকী, যেন কিছুই দেখেন না, শোনেন না, বোঝেন না, একেবারে দুধে ধোয়া বেলপত্তরটি। ধুত্তু

দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরই চোখে পড়ল, আর আমাদের দেশে কি চলছে এখন? এক বাপের তিন ছেলে, তাদের মধ্যেই এই অবস্থা, দুর্যোধন আর এমন কি বেশী দোষ করল? তা বটে, প্রথম কথাটা স্বীকার করে নিল। এরপর দুজনে গলার স্বরটা একটু নামিয়ে এই বিষয়টা নিয়েই বিশ্রম্ভালাপে মেতে গেল।

শংখদেবীর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। তাঁকে দেখলে কারও মনেই সন্দেহ জাগতে পারত না যে তিনি উৎকর্ণ হয়ে তাদের মৃদু উচ্চারিত কথাগুলো ধরবার জন্য জাল পেতে বসে আছেন। কোন কোন কথা ধরতে পারছিলেন, কোন কোন কথা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টা এতই পরিচিত যে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলোর সাহায্যেই তিনি তাদের বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝে নিতে পারছিলেন।

চুপ চুপ চুপ, মহারানী এদিকে আসছেন। সংগে সংগে সমস্ত গুঞ্জরণ থেমে গেল। সত্যসত্যই পট্টরাজমহিষী নন্দা দেবী তাঁর নাতিস্থূলদেহ নিয়ে হেলে দুলে মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেছন পেছন একজন অনুচরী চামর ব্যজন করতে করতে আসছে। পাঠক ঠাকুর তখন কুন্তী আর পাণ্ডবদের বিদায় পর্ব করুণ সুরে বর্ণনা করে চলেছেন। কিন্তু মেয়েদের মন সেদিকে নেই, তাদের সবার দৃষ্টি আর মন একই দিকে নিবদ্ধ। মুক্ত গবাক্ষের উচ্ছল আলোক সম্পাতে মহারানীর মহার্ঘ্য রত্নভূষণ তীক্ষ্ণ সূচী-ফলাকার মত দ্যুতি বিকীর্ণ করছে। সেই তীক্ষ্ণ আলোকসূচী মেয়েদের চক্ষু আর হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করে চলেছে।

শংখদেবী তাঁর আগমন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা তা তাঁর ভাব ভংগি দেখে বোঝার উপায় ছিল না। নন্দা দেবী যখন সামনে এসে অবনত হয়ে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন, তখনই যেন তিনি তাঁকে প্রথম দেখলেন। প্রণামের উত্তরে মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, কল্যাণ হোক। পেছন পেছন

একজন ভৃত্য একটি আসন বহন করে নিয়ে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্তা নন্দা দেবী সেই আসনে গা এলিয়ে দিয়ে একটু আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

তোমার আর দুই বোন কোথায়? তারা এল না? প্রশ্ন করলেন শংখদেবী।

নন্দা দেবী উত্তর দিলেন, না, এল না তারা।

কেন?

বলেছিলাম, কিন্তু ওরা আসতে চাইল না।

ও। শংখদেবী সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন। তারপর কিছুটা স্বগতঃ, কিছুটা প্রশ্নের সুরে বললেন, রাজ্যপাল কোথায়? বহুদিন তাকে দেখি না!

রাজ্যপাল? সে শিকারে গেছে! তার ফিরতে দেরী হবে।

শিকারে? কিন্তু ফিরতে দেরী হবে কেন? কোথায় গেছে শিকার করতে?

কোটাটবীতে।

কোটাটবী! চমকে উঠলেন শংখদেবী, সে কি! সে তো এখানে নয়, সে তো গৌড়রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশ। এ দেশ থেকে কেউ কখন সেখানে শিকার করতে যায়! তুমি বলছ কি নন্দা?

নন্দা দেবী উত্তর দিলেন, শিকারটা উপলক্ষ, আসল কথা দেশটা দেখবার জন্য ওর ঝোঁক চেপেছিল। অনেকদিন ধরেই এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করছিল। ওর মা নিষেধ করেছিল, আমরা সবাই নিষেধ করেছিলাম, এমন কি মহারাজ স্বয়ং নিজেও। কিন্তু কিছুতেই মানিয়ে রাখা গেল না। বিষম জেদ তো, অবিকল ওর বাপের মত। শেষকালে মহারাজ বাধ্য হয়ে বললেন, কি আর করা যাবে, যাক তবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। একজন বলাধ্যক্ষের অধীনে এক-দল সৈন্য তার নিরাপত্তার জন্য তার সংগে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিষম জেদ তো, অবিকল ওর বাপের মত, কথাটা মনের মধ্যে

খচ্ করে বিঁধল, কিন্তু কথাটা গায়ে না মেখে শংখদেবী বললেন, কাজটা ভাল হয়নি নন্দা। তোমরা ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে না কেন? ও কোনদিন আমার কোন কথা অমান্য করে না।

নন্দা দেবী হেসে বললেন, সেদিন আর নেই মা। আপনার সেই আদরের নাতি কি আর এখনও তেমনি আছে বলে মনে করেন? এখন সে বড় হয়ে উঠেছে, তার মন এখন বাইরের দিকে। আপনার আমার কথা কি আর এখন তার মনে ধরবে! কি করবেন, এই তো সংসারের নিয়ম।

শংখদেবী ভ্রূ-কুঞ্চিত করে কি একটু ভাবলেন, শেষে গলার স্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে এনে বললেন, একটা কথা সত্যি করে বলবে নন্দা, তোমরা কি রামপালের মতই ওকেও সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাও নাকি?

নন্দা দেবী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, ছি ছি ছি, এ কি কথা বলছেন মা! এ সব মিছে কথা কে বলেছে আপনাকে? আমরা ওর জন্য—নন্দা দেবী কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। আরও দু একটা অসংলগ্ন কথা আর অসমাপ্ত বাক্য যোজনার পর অবশেষে বললেন, আমি এখন যাই তা'হলে।

সে কি, এই মাত্র তো এলে! শংখদেবী বিস্ময়ের সুরে বললেন।

আমার কি আর নিশ্চিন্ত মনে পুণ্য কথা শুনবার যো আছে! একটু যদি না থাকি, প্রাসাদের সমস্ত কাজে বিশৃংখলা দেখা দেবে। এইজন্য অনেক কিছু থেকেই আমাকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

কথাটা শেষ করেই আর দেরী করলেন না, যে ভাবে এসেছিলেন, সেই ভাবেই প্রস্থান করলেন। তার পেছনে সেই অনুচরী আগেকার মতই চামর ব্যজন করে চলল। তারও পেছনে চলল আসনবাহক রত্নাসন কাঁধে নিয়ে। সমস্ত মেয়েরা স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েদের ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল অলক্ষ্মী, সর্বনাশী! স্বগতোক্তি নয়, স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত, সবাই শুনতে পেল।

কে, কে এই দুঃসাহসিকা, চমকে উঠল সবাই। শংখদেবীর কৌতুহলী চোখ দুটি ভিড়ের মধ্যে সন্ধান করে ফিরতে লাগল। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কথাটা সম্ভবত স্বগতোক্তি, মনের চাপা দেওয়া ঝাঁঝটা কেমন করে হঠাৎ সশব্দে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বলার সংগে সংগেই সে সামলে নিয়েছে আপনাকে।

এমন সময় বিদ্যুৎ শিখার মত চঞ্চল একটি মেয়ে হঠাৎ কোথেকে এসে প্রণামের ভংগিতে শংখদেবীর পায়ের উপর পড়ল।

কি রে, কি খবর? শংখদেবী মৃদু গুঞ্জনে প্রশ্ন করলেন।

খবর জরুরী।

তবে যা, বল গিয়ে দ্বিতীয় সংকেত।

বেশ, বলেই মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মেয়েরা আবার মন দিয়েছে মহাভারতে। পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী বনবাসে যাত্রা করেছেন। নগর ছেড়ে গ্রামের পথে এসে নেমেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের পেছন পেছন নগরের লোক দল বেঁধে আসছে। তারা বলছে, আমরাও যাব আপনাদের সংগে। এই অধর্মের দেশে আমরা কেউ থাকব না। আপনাদের যে গতি আমাদেরও সেই গতি। যুধিষ্ঠির তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বলছেন—আপনারা ফিরে যান, যে যার ঘরে ফিরে যান। আমাদের সংগে কোথায় যাবেন আপনারা? আমাদের সংগে গেলে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হবে।

হয় হোক, তারা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিল. সাধুসংগে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। মেয়েরা মন দিয়ে এই কাহিনী শুনছিল, কিন্তু হঠাৎ চারদিকে একটা কোলাহল উঠল, শংখদেবী অচৈতন্য হয়ে আসন থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছেন। কি হোল, কি হোল—সবাই উত্তেজিত, সবাই চঞ্চল, চারদিকে ডাক হাঁক পড়ে গেল—কি হোল? কি হোল?

এই দুঃসংবাদ শুনে পাঠক ঠাকুর সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ করে

উঠে গেলেন। রাজভৃত্যদের নির্দেশে দোলাবাহকেরা শংখদেবীকে দোলায় চাপিয়ে তাঁর নিজের কক্ষে বয়ে নিয়ে গেল। সেই সংগে একজন লোক ছুটল রাজবৈদ্যের সন্ধানে।

কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রুষার পর শংখদেবী একটু যেন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। কক্ষমধ্যে অনেক লোক জড় হয়েছিল, স্বয়ং মহ রানীও ছিলেন। নানা জনে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু শংখদেবী তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারলেন না, নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন

কি মা, কিছু বলছেন? নন্দাদেবী ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

শংখদেবীর মুখ থেকে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে গেল। সংগে সংগে তাঁর সর্বাংগ থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপর আবার তাঁর চোখ দুটি বুজে গেল, সমস্ত শরীর নিস্পন্দ স্থির, এক জন প্রাচীনা বলে উঠলেন, মাথায় জল দাও। আর এখন কেউ কোন কথা বোলো না।

একটু বাদে আবার তিনি চোখ মেললেন। রাজবৈদ্যও ঠিক এই সময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন।

এ কি ঘরের মধ্যে এত লোক কেন? রাজবৈদ্য ঘরে ঢুকেই উষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রশ্ন নয়, যেন প্রচণ্ড একটা ধমক। রাজবৈদ্যের উগ্র মেজাজের কথা কারও কাছেই অজানা নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে একে একে বেরিয়ে যেতে লাগল, বাকী রইল শুধু তিন-জন। রাজবৈদ্য এবার তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই দৃষ্টির অর্থ সুস্পষ্ট। দুজন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। থাকাটা প্রয়োজন।

নন্দা দেবী মিনতির সুরে বললেন, আমি থাকি?

কোন প্রয়োজন নেই, রাজবৈদ্য কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন। রাজকীয় মর্যাদায় আঘাত লাগলেও নন্দা দেবী সেটাকে হজম করে

নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। যে দাসী রোগিণীর মাথার ধারে বসে বাতাস করছিল, সে তার নিজের কাজ করে চলল। মহারানীর এই দুরবস্থা দেখে সে ভারী খুশী, ভিতরে ভিতরে হাসছিল। রাজ-বৈদ্য রোগিণীর নাড়ী ধরে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। শেষে মাথা তুলে দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, গরম জল নিয়ে এস, জলটা যেন ফুটন্ত গরম হয়।

দাসী উভয় সংকটে পড়ল। মহারানী যাবার আগে ইংগিতে জানিয়ে গেছেন, সে যেন এ কক্ষ ছেড়ে আর কোথাও না যায়। নির্দেশের তাৎপর্য কি, সেটা তার ভাল করেই জানা আছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত বুঝতে না পেরে সে নিঃশব্দে যা করছিল, তাই করতে লাগল।

তুমি কি কানে কম শোন নাকি? রাজবৈদ্য ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন।

দাসীর আর যাই দোষ থাক না কেন, শ্রবণ শক্তির দোষ যে নেই সে কথাটা সংগে সংগেই প্রমাণিত হয়ে গেল। এই যে নিয়ে আসছি, বলতে বলতে সে যেন পালিয়ে বাঁচল।

দাসী চলে যেতেই রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত খোলা দরজাটার সামনে গিয়ে বাইরে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন, না, কেউ নেই, কোথাও। আশ্বস্ত হয়ে শয্যাপার্শ্বে ফিরে এসে নীচুস্বরে ডাকলেন, রাজমাতা, চোখ খুলুন

শংখদেবী এই ডাকটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এবার চোখ মেলে একটু মৃদু হাসি হেসে বললেন, কি জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছেন বলুন।

হ্যাঁ সংবাদ আছে—কতগুলো দুঃসংবাদ। কিন্তু আমি জানি, যত বড় দুঃসংবাদই হোক না কেন, তাই শুনে আপনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন, তেমন ধাতু দিয়ে বিধাতা আপনাকে গড়েন নি।

এরা কতটুকু সময় দেবে বুঝতে পারছি না। আমি সংক্ষেপে

বলছি, আপনি শুনে নিন। প্রথমত রামপালকে কারাগার থেকে বার করে নিয়ে আসার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছিল, এক জন প্রহরীর অসতর্কতার ফলে সেই কথাটা ওদের কানে পৌঁছে গেছে।

বলেন কি! মথনকে ওরা এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে পারেনি তো?

না, সে দিক দিয়ে একটুর জন্য বেঁচে গেছি আমরা। যে দুজন প্রহরী এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল, শেষ মুহূর্তে ওদের দুজনকে সরিয়ে ফেলা গেছে। কাজেই আর কারও নাম প্রকাশ হবার আশংকা নেই। তবে ওরা ভীষণভাবে সজাগ হয়ে গেছে। ওদের তো ভয় পাবার কথাই। সামন্তদের মধ্যে অনেকেই ভিতরে ভিতরে রাজার বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার মত সাহস কারও নেই। আমাদের লোক গিয়েছিল তাদের কাছে, কিন্তু তারা এক পা এগোয় তো দু পা পেছোয়। তবে এ কথা ঠিক, আজ যদি রামপাল বাইরে থাকত এদের মধ্যে অধিকাংশই তার সংগে যোগ দিত। একটুকুর জন্য কি সুযোগটাই যে হারালাম আমরা!

কতগুলো দুঃসংবাদ আছে বলেছিলেন, একটা মাত্র বললেন, আর কি কি আছে বলে ফেলুন এক এক করে। আমার মনের ধাতু তো জানাই আছে আপনার, তবে আর এত ইতস্তত করছেন কেন?

হ্যাঁ বলছি, একটু অপেক্ষা করুন। বৈদ্য হরিগুপ্ত আবার খোলা দরজাটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসে বললেন, সেই পরিকল্পনাটা প্রকাশ পাবার পর থেকে রামপালকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

শৃংখলাবদ্ধ? শংখদেবী কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, পরে নিজের মনে মনে বললেন, তা তো হবেই। এর ফলে কত কিছু ঘটবে, কে বলতে পারে! হ্যাঁ বলুন, তারপর?

আজ ওরা রাজ্যপালকে এক দল সৈন্যের সংগে রাজধানী থেকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

শংখ দেবী বললেন, সে কি আজই মাত্র গেছে? তবে যে শুনলাম কোটাটবীতে নাকি শিকারে না ভ্রমণে গেছে—

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, এই কথাই ওরা প্রচার করেছে বটে। আমরা কিন্তু এ কথা বিন্দু মাত্র বিশ্বাস করি না। আমাদের মনে হয় রাজধানীর বাইরে কোথাও তাকে আটক করে রাখবে।

শংখদেবী তার কথার সমর্থন করে বললেন, আমারও কতকটা সেই রকমই মনে হয়েছিল।

আরেক কথা, আজই আর এক জন ধরা পড়েছে ওদের হাতে। সেও রামপালের মতই কারাগারে বন্দী হয়ে আছে।

কে, কে সে? এইবার তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্য হারিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন শংখদেবী।

হরিগুপ্ত হেসে বললেন, এত উৎকণ্ঠিত হবেন না। ওরা কারাগারে পাঠিয়েছে শূরপালকে।

শংখদেবী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, শূরপালকে? কিন্তু কেন? ওরা সন্দেহ করছে, সেও এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত আছে। আবার এও হতে পারে এই উপলক্ষে মহারাজ তার ভবিষ্যৎ পথ-কণ্টককে দূর করবার চেষ্টা করছেন। কিছুই অসম্ভব নয়।

হ্যাঁ, কিছুই অসম্ভব নয়, প্রতিধ্বনির মতই বলে উঠলেন শংখদেবী। কিন্তু আমি ভাবছি এ অবস্থায় রামপাল আর রাজ্যপালের প্রাণের আশংকা নেই তো?

হরিগুপ্ত একটু চিন্তা করে বললেন, এ আশংকা একেবারেই নেই, এমন কথা জোর করে না বলতে পারলেও একটা কথা বলতে পারি, রাজা এদের গায়ে হাত দিতে সত্যসত্যই ভয় পান। তাঁর ভয় দেশের প্রজারা এতে ক্ষেপে উঠতে পারে। অমাত্য বরাহস্বামী রামপালের মৃত্যুদণ্ডের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু রাজাকে কিছুতেই সম্মত করাতে পারেন নি।

দূরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, কে যেন দ্রুত পদে চলে আসছে। দুজনে একই সংগে সেই শব্দ শুনতে পেয়ে সচকিত হয়ে উঠলেন। হরিগুপ্ত বললেন, রাজমাতা, এই মুহূর্তে আবার অচৈতন্য হয়ে যান শংখদেবী বৈদ্যের নির্দেশ যথোচিত ভাবে পালন করলেন। হরিগুপ্ত হাতের নাড়ী ধরে নিবিষ্ট চিত্তে বসে রইলেন। তাঁর কপালে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

আর এক জন দাসী এসে ঘরে ঢুকল। বৈদ্যের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কেমন বুঝছেন?

হরিগুপ্ত হতাশার ভংগিতে মাথা দুলিয়ে বললেন, না, রকমটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না। ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে কিনা। কিন্তু যাকে গরম জল নিয়ে আসতে বলেছিলাম সে কোথায় গেল?

দাসী উত্তর দিল, জল গরম করা হচ্ছে। হয়ে এল বলে, এক্ষুনি নিয়ে আসবে। মহারানী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, যা তুই শিয়রে বসে বাতাস কর গিয়ে। ভাল হয়েছে, এসেছ। যাও তো মা লক্ষ্মী দৌড়ে গিয়ে একমুঠো সরষে নিয়ে এসো। যাবে আর আসবে, দেরী করবে না।

দাসী আদেশ পেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। শংখদেবী চোখ মেলে তাকালেন। হরিগুপ্ত একটা চিঠি বার করে শংখদেবীর হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন মথনদেবের চিঠি। তিনি এর উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছেন। আপনার বিচার বুদ্ধির উপর তাঁর অসীম নির্ভরতা। আজ রাত্রির মধ্যেই এর একটা উত্তর লিখে রাখবেন। আপনি কিন্তু শয্যা ছেড়ে উঠবেন না। মনে রাখবেন আপনার জীবন সংশয় ব্যাধি। আমি কাল সকালে আবার আপনাকে দেখতে আসব। তখন উত্তর নিয়ে যাব।

শংখদেবী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এরা কি আপনাকে মনে মনে সন্দেহ করে?

না, আমি কারও সন্দেহের পাত্র নই। ক্ষ্যাপাটে আর বদমেজাজী

লোক বলে আমার খ্যাতি আছে। সেই খ্যাতিই আমাকে বর্মের মত রক্ষা করছে।

শংখদেবী বললেন, তাই যদি হবে, তা হলে আজ ওরা আপনাকে এমন করে আগলে রাখতে চাইছে কেন? নন্দার তো ঘর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। আমি চোখ বুজে থাকলেও ওর মুখের ভাবটা স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম। সে নিশ্চয়ই আমার অসুস্থতার জন্য দুর্ভাবনায় নয়। আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে ওরা তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। বলতে গেলে আপনি ওকে বল প্রয়োগ করে ঘর থেকে বার করে দিলেন। আপনার উপরে সন্দেহ যদি নাই থাকবে, তবে এমন করে আপনাকে পাহারা দেবে কেন?

একটু ভুল করলেন, হরিগুপ্ত হেসে বললেন, আমাকে নয়, এরা পাহারা দিচ্ছে আপনাকে। এরা ভয় করছে, পাছে আপনি প্রশ্ন করে বাইরের খবরাখবর জেনে নেন।

শংখদেবী একটু ভেবে বললেন, কে জানে হয়তো আপনার কথাই ঠিক। হঠাৎ একটা কথা মনে করে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, কিন্তু একটা কথা বলুন, আপনি ক্ষ্যাপাটে আর বদমেজাজী মানুষ এটাই কি সত্যি কথা?

সত্যি কথা বই কি, নগরশুদ্ধ সবাই তাই বলে। না হলে তারা বলবে কেন?

তা বলুক, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। আমি এতদিন ধরে দেখে আসছি আপনাকে, কিন্তু কই কোনদিন তো আপনার ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের পরিচয় পাইনি! আর কোনদিন যে মেজাজ দেখিয়েছেন আমাকে সে কথাও তো মনে পড়ে না। বরঞ্চ—

হরিগুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শংখদেবী তাঁর কথা শেষ করলেন, আপনার কাছ থেকে চিরদিন সহানুভূতি আর সুমিষ্ট ব্যবহারই পেয়ে আসছি।

হরিগুপ্ত একটু সময় চুপ থেকে তারপর বললেন, আপনি রাজমাতা, পূজনীয়া।

ক্ষ্যাপাটে লোকেরও তা হলে পাত্রাপাত্রের বিচার বিবেচনা থাকে?

শংখদেবীর লঘু পরিহাস সীমা তরল কণ্ঠস্বরে হরিগুপ্তের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সংকটের পর সংকটে যার জীবন ক্ষতবিক্ষত, সে কেমন করে এমন অবিচলিত থাকে। মনে হয়, কিছুই যেন তাঁর গায়ে লেগে থাকে না। দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় দাসী সরষে নিয়ে ছুটে আসছে।

দুই

কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন? আশ্চর্য কথা তো! প্রথম অমাত্য বরাহস্বামী মন্তব্য করলেন। রাজা মহীপাল বললেন। আশ্চর্যের কি আছে এতে? কিছুদিন থেকে এ রকম তো মাঝে মাঝেই হয়ে আসছে। রাজবৈদ্য বলছেন, এ এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। একদিন এই রোগেই হয়তো তাঁর প্রাণান্ত ঘটবে।

বরাহস্বামী অধৈর্যের স্বরে বলে উঠলেন, এই কথা তো সেই কবে থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু কই, তার লক্ষণ তো দেখছি না কিছুই। শুধু তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখবার জন্যই একদিন মহাভারত পাঠ শুনতে গিয়েছিলাম। একটুকুর জন্য দর্শনের সৌভাগ্যও হয়েছিল। দেখলাম স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই আছে, কোন দিক দিয়ে কোন বিকৃতি লক্ষ্য করতে পারলাম না। সেই শ্বেত পাথরের গড়া অক্ষয় অটুট মূর্তি, সেই অননুকরণীয় কথার ভংগি, সেই অমায়িক হাসি, কিছুই যেন পরিবর্তন হয়নি। আজ থেকে বিশ বছর আগে যেমনটি দেখেছিলাম, এখনও অবিকল তাই। দেখে মনে হয় যেন মন্ত্রসিদ্ধা। এই বয়সে শুধু দেহের গঠনই নয়, প্রভাত চন্দ্রিমার শেষ লাবণ্য রেখাটুকু এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন। আর এই মায়ার জাল ছড়িয়েই তিনি আপনার কার্য সিদ্ধি করে আসছেন। অদ্ভুত—এমনটি আর দেখিনি।

প্রথম অমাত্য বরাহস্বামী, মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ, মহাপ্রতিহার কীর্তিবর্মা আর রাজা এই চার জন রাষ্ট্রের গূঢ় বিষয় নিয়ে

পরামর্শ করছিলেন। শংখদেবীর অসুস্থতার কথাটা প্রথমেই উঠে পড়ল। আর কথাটা তুললেন বরাহস্বামী নিজেই। কিন্তু আর সবার সামনেই যে ভাবে তিনি তাঁর রূপের ও রূপের মায়াজালের উল্লেখ করে বক্রোক্তি করলেন, তাতে রাজ্যের মর্যাদায় একটু বাধল। হোক প্রতিপক্ষ, কিন্তু তাঁর মাতৃস্থানীয়া তো বটে।

বরাহস্বামী রাজার মুখের ভাবে তাঁর মনোভাবটা বুঝতে পারলেন। কথাটা এ ভাবে না বললেও চলত। কিন্তু তাঁর এই অমাত্য জীবনে শংখদেবীর সংগে প্রতিযোগিতায় বহুবার তাঁকে হটে যেতে হয়েছে, অনেক রকমে নাকাল হতে হয়েছে, সে সব কথা তিনি কেমন করে ভুলে যাবেন! শংখদেবী প্রখর বুদ্ধিশালিনী এ কথা তিনি সব সময়ই স্বীকার করেন। কিন্তু বুদ্ধিবলই কি তাঁর একমাত্র বল? লীলাময়ী নারীর দৃষ্টিতে হাসিতে লীলাভংগিতে যে প্রচণ্ড যাদুর শক্তি পুরুষ বরাহস্বামীর পক্ষে তা আয়ত্তের বাইরে। এ যেন সশস্ত্রের সংগে নিরস্ত্রের অ-সম যুদ্ধ। সে জন্য অনেক আক্রোশ তাঁর মনের মধ্যে জমে আছে। আর তাই তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলেই তাঁর কথাগুলো তীর্যক রূপ ধারণ করতে চায়।

বরাহস্বামীর কথায় একটু অপ্রসন্ন বোধ করলেও রাজাকে মনো-ক্ষোভটা মনে মনেই হজম করে নিতে হয়। বরাহস্বামীর মুখের উপর কোন কঠিন কথা বলবার মত সাহস তাঁর নেই। এটা তিনি ভাল করেই বোঝেন যে তিনি তাঁর প্রথম অমাত্যের কাছে নানা দিক দিয়েই বাঁধা। আর এ বাঁধন দিনের পর দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা ও সৈন্য বিভাগ তাঁর প্রতি অনুগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের মূল আনুগত্য প্রথম অমাত্যের সংগে। প্রথম অমাত্য রাজার পক্ষ থেকে ভুক্তির শাসনকর্তা, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি. ও বীথিপতিদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন। তা ছাড়া মহা সান্ধিবিগ্রহিকের মাধ্যমে তিনি সামন্তরাজদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা

করে চলেন। ফলে বলতে গেলে সমস্ত শক্তি একটি লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। কোন কারণে প্রথম অমাত্যের সংগে সংঘর্ষ ঘটলে রাজার পায়ের তলায় দাঁড়াবার মত মাটি থাকবে না।

সহোদর ভাই শূরপালকে কারাগারে পাঠাবার ইচ্ছা রাজার একেবারেই ছিল না। আপত্তিও করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু বরাহস্বামীর প্রবল ইচ্ছার কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাথা নোয়াতেই হোল। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, বরাহস্বামীর মতের বিরুদ্ধতা করতে গেলে সর্বক্ষেত্রেই এইরকম পরিণতি ঘটবে। কিন্তু বুঝলেও এর কোন প্রতিকার নেই। তবে একটা কথা, বরাহস্বামী সত্য সত্যই তাঁর মংগলাকাঙ্ক্ষী। তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সে কথার সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

সে জন্য প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁকে তার মতেই মত দিয়ে চলতে হয়। তিনি যথাসম্ভব মতানৈক্যটা এড়িয়ে চলতে চান। তবে তিনি আজ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন, আপনি কি বলতে চান তিনি অসুস্থতার ভাণ করছেন? রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত বলছেন, তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। তাঁর কথা তো উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

বরাহামী একবার রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, না, ঠিক তা আমি বলছি না। তবে দুটো ব্যাপার এমন সংগে সংগে ঘটল যে এটাকে আকস্মিক মনে করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আগের দিন বিকেলবেলা রামপালকে শৃংখলিত করে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হোল। পরদিন সকালবেলা শূরপালকে কারাগারে পাঠানো হোল, আর স্থানান্তরিত করা হোল রাজ্যপালকে। আর ঠিক সেদিনই বিকেলবেলা মহাভারত পাঠ শুনতে শুনতে উনি মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। অথচ তার আগে তাঁর কোন রকম অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায় নি, আপনারাই এ কথা বলছেন। এটাকে কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? আমার

বিশ্বাস, যে কোন ভাবেই হোক, সমস্ত সংবাদগুলো ওঁর কানে এসেছে। ষড়যন্ত্রটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় উনি হয়তো মনে করেছেন, ওদের ভিতরকার গোপন কথা সব কিছুই ফাঁস হয়ে গেছে। এই উত্তেজনা ও আতংকের ফলেই হয়তো এমন ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির বহরটা এখনও ওঁর কাছে ধরা পড়েনি। উনি তো জানেন না, এই ষড়যন্ত্রের আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

সম্পূর্ণ অন্ধকারে ? এ কথা আপনি কেন বলছেন ? মহাপ্রতীহার কীর্তিবর্মা মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। আমাদের সতর্কতার ফলেই রামপালদেবের এই ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে আমাদের গুপ্তচরেরা এ ব্যাপারে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বরাহস্বামী দৃঢ় স্বরে বললেন, না, এই ষড়যন্ত্রের আসল স্বরূপটা এখনও প্রকাশিত হয়নি। রামপালকে শৃংখলিত করা হয়েছে, ঠিকই করা হয়েছে কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রকারী সে নয়। ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বাইরে থেকে। আমরা সন্দেহক্রমে শূরপাল আর রাজ্যপালকে আটক করেছি বটে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাদের কি ভূমিকা ছিল তা আমরা এখনও জানি না। এমনও হতে পারে এবং এটা হওয়া খুবই সম্ভব যে বাইরের মূল ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও সুস্থ শরীরে নিজ নিজ জায়গায় বসে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

রাজা বললেন, আপনি একটু বেশী ভয় করছেন। আমার তো মনে হয়, বাইরে যদি আর কেউ কেউ থেকেও থাকে, তবে তারা এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। এরপর আর শীগগির কেউ মাথা তুলতে সাহস পাবে না।

এ বিষয়ে আমি কিন্তু আপনাদের মত অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

বরাহস্বামী মন্তব্য করলেন। পরে মহাপ্রতীহার কীর্তিবর্মাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, পলাতক প্রহরী দুটো ধরা পড়েছে ?

কীর্তিবর্মা মুখ কাঁচু মাচু করে বললেন, না, ওদের পাওয়া যায় নি।

এখনও পাওয়া যায় নি। আজ তিন দিন হয়ে গেল, আর কবে পাওয়া যাবে ? অথচ যখন ষড়যন্ত্রটার কথা জানা গেল, তখনও ওরা নগরেই উপস্থিত ছিল। ছিল কিনা ?

কীর্তিবর্মা একটু থতমত খেয়ে বললেন, ছিল বলেই তো শুনেছিলাম।

ছিল বলেই শুনেছিলেন ? বরাহস্বামীর কণ্ঠে ব্যংগের সুর ফুটে উঠল। এইত আপনার লোকদের কাজের ধারা। একটু আগেই এদের কৃতিত্বের কথা খুব ফলাও করে বলছিলেন না ? ভাল কথা, পলাতক প্রহরীদের পরিবার পরিজনদের আটক করা হয়েছে তো ? ওদের উপর ভাল মত চাপ দিলে কিছু কিছু গোপন কথা বেরিয়ে পড়তেও পারে।

কীর্তিবর্মা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

কই, কিছু বলছেন না যে ?

পড়া না শেখা ছাত্রের মত মুখখানা কাঁচুমাচু করে কীর্তিবর্মা বললেন, ওদের দুজনের কারও বাড়ীতেই কোন লোক নেই, সবাই পালিয়েছে।

অপদার্থ যত সব ! বরাহস্বামী গর্জন করে উঠলেন, আপনাদের চোখের সমুখ দিয়ে পালিয়ে গেল. আপনারা সব চোখ বুজে ছিলেন ?

কীর্তিবর্মা আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য বললেন, আমরা ওদের আটক করবার জন্য দাণ্ডিকদের পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে—

এ ভাবে সময় হারিয়ে পাঠাবার মানে কি ? ওরা কি আপনার প্রেরিত দাণ্ডিকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বসে থাকবে ? মেয়ে

মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে সরে পড়া এত সহজ কথা নয়। বলতে গেলে আপনারাই ওদের সুযোগ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া তারা যে এই নগরের মধ্যেই আপনার চোখে ধূলো দিয়ে কোথাও ডুব মেরে নেই, এমন কথাই বা কে জোর করে বলতে পারে!

মহাপ্রতীহারের দূরবস্থা দেখে রাজা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন—না না, এত সাহস কি ওদের হবে?

বরাহস্বামী বললেন, যোগ্যতা যাদের আছে, সাহসই বা থাকবে না কেন? দেখছেন না, ওদের হাতের কাজ কি রকম পাকা? যেই মুহূর্তে আমরা ষড়যন্ত্রটা টের পেয়েছি, তখনই কথাটা ওদের কানে পৌঁছে গেছে, আর সংগে সংগে ওরা ওদের যা করণীয়, নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করেছে। আমাদের বহু ভাগ্য, একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে গেছি আমরা। কিন্তু সেজন্য আমাদের কিছুমাত্র কৃতিত্ব নেই। মূর্খ প্রহরীটা যদি তার স্ত্রীর কাছে এ নিয়ে গল্প না করত অথবা ওর স্ত্রী পেটের কথা পেটেই চেপে রাখতে পারত, তা হলে ওদের এই ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই সফল হোত। আর রামপাল যদি কোনমতে বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত ভেবে দেখেছেন একবার? এ রাজ্যে তাকে সাহায্য করবার লোকের অভাব নেই। তা ছাড়া সামন্তদের মধ্যে অনেকে তার সংগে ভিড়ে যেত।

না না, এ কথা ঠিক নয়, মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমি ওদের সব খবরই পেয়ে থাকি। সামন্তদের মধ্যে প্রায় সবাই আমাদের পক্ষে। কেউ কেউ অবশ্য নিরপেক্ষ কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষের সংগে কেউ যোগ দিতেন না।

বরাহস্বামী স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি বুঝি তাই মনে কর? আমার ধারণা তা নয়। শুনেছি সমস্ত রাজ্যগুলিতে রামপালের পক্ষে গোপন প্রচার কার্য চলেছে। মুক্ত হস্তে অর্থ নাকি ছড়ানো হচ্ছে। এই

সংবাদের কিছুটা হয়তো অতিরঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু সবটাই মিথ্যে নয়। আর এমনই অপদার্থ আমরা, আমাদের বুকের উপর বসে ওরা এই সমস্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এদিকে আমরা পরম নিশ্চিন্তে বসে আছি।

আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুটা কে মহাপ্রতীহারের সে কথা বুঝতে বাকি ছিল না। তবু এই প্রসংগে কোন কথা না বলাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

কিন্তু তিনি চুপ করে থাকতে চাইলেও বরাহস্বামী তাতে বাদ সাধলেন। প্রশ্ন করলেন, মথনদেবের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে তো ?

কীর্তিবর্মা বললেন, হ্যাঁ গত তিন মাস ধরে নিয়মিতভাবে পালা করে করে তার ওখানে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

তাদের কাছ থেকে কি খবর পাচ্ছেন ?

না, তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ অমূলক। তিনি ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞ লোক, শাস্ত্রচর্চা নিয়েই মেতে থাকেন। বাড়ীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সারাদিন পূজো চলছে। নগরের বহু লোক এখানে পূজো দিতে আসে।

হুঁ, তা তো আসবেই। কিন্তু কারা কারা আসে ?

অত কি আর বলা যায় ! জাগ্রত দেবতা কিনা, বহু লোকই পূজো দিতে আসে।

বরাহস্বামী মুখবিকৃতি করে বললেন, এই আপনার খবর ? কিন্তু এর জন্য আর লোক নিয়োগ করবার প্রয়োজনটা কি ? নগরের যে কোন লোকই তো এই খবরটা রাখে। আপনার লোকেরা কি সেখানে শুধু লোকের মেলা দেখতেই যায় ?

কীর্তিবর্মা মাথা চুলকোতে লাগলেন।

মথনদেবের পুত্র কাহ্নুরদেব কি করছেন ?

তিনি স্থল-বাণিজ্য করেন।

তা তো করেন, কিন্তু আর কি করেন ? তার পিছনে লোক রাখা হয়েছে তো ? শুনতে পাই তাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্য-গুলিতে দেখা যায়।

কীর্তিবর্মা বললেন, হ্যাঁ সে কথা ঠিক। তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশেই সে সব অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকেন।

সামন্তরাজদের সংগে তার দেখা শোনা হয় ?

তা হয় বই কি। বাণিজ্যে গেলে প্রথমেই রাজসভায় উপ-ঢৌকনাদি দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়, এটাই তো সাধারণ রীতি।

তা বটে। মথনদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজদেবের খবর কি ?

তিনি সম্প্রতি কর্ণাটে গেছেন।

কর্ণাটে, কেন ?

ভ্রমণ উদ্দেশ্যে। কর্ণাট যে তার পূর্বপুরুষের দেশ।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রশ্ন করলেন, আপনার কি এঁদেক উপর সন্দেহ আছে নাকি ?

বরাহস্বামী পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন, কেন, তোমার নেই ?

মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রশ্নের ভংগি শুনে বুঝলেন, এ ক্ষেত্রে সন্দেহ না থাকাটা অযোগ্যতার পরিচায়ক। তাই আপনাকে শুধরে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা-তা সন্দেহ তো একটু থাকতেই পারে।

বরাহস্বামী বললেন, কর্ণাটরাজ্য থেকে আগত সমস্ত লোকের উপরেই আমার সন্দেহ।

আমি তাদের কাউকে বাদ দিতে পারি না। তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস শংখদেবী সমস্ত কিছুর সংগে জড়িত আছেন।

রাজা প্রতিবাদ করে বললেন, আপনার এই ধারণা আমি কিছুতেই দূর করতে পারলাম না। স্বীকার করি তিনি খুবই বুদ্ধিমতী, কিন্তু বাইরের সংগে কোন রকম যোগাযোগ করবার সুযোগ তাঁর নেই। সত্য কথা বলতে গেলে তিনি প্রাসাদের মধ্যে

বন্দিনী অবস্থায় আছেন। বাইরের কোন লোক তাঁর সংগে একা দেখা করতে পারে না। অষ্টপ্রহর তাঁর পেছনে লোক রয়েছে।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভ বললেন, একে স্ত্রীলোক তাতে বৃদ্ধা, কিইবা তিনি করতে পারেন! তাঁর জন্য এত ভাবছেন কেন?

বরাহস্বামী হেসে বললেন, তুমি নবাগত, পুরানো দিনের অনেক কথাত তোমার জানা নেই। তা হলে এমন কথা কখনোই বলতে না। স্ত্রীলোক বলে একে সামান্য মনে কোরো না। স্বর্গীয় মহা-রাজের শেষ জীবনে ইনিই ছিলেন গৌড়ের সর্বাধিনায়িকা। সেদিন পদে পদে তাঁর সংগে শক্তির পরীক্ষা হয়েছে আমাদের। অনেক ক্ষেত্রে ঠকতেও হয়েছে আমাকে, এ কথা অস্বীকার করতে পারব না।

পদ্মানাভ আশ্চর্য হয়ে বললেন, বলেন কি?

বরাহস্বামী বললেন, চেদীরাজদুহিতা যৌবনশ্রী দেবী যখন মহারানী হয়ে এলেন, আমরাও তখন সেই সংগেইএসেছিলাম। স্বর্গীয় মহারাজের অনুগ্রহে চেদী থেকে আগত আমাদের মধ্যে অনেকেই রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজমাতা যৌবনশ্রী চিরদিনই রুগ্না ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রোগে ভুগে ভুগেই তিনি মারা যান। কিন্তু তিনি মারা যাবার কিছুদিন আগে রাষ্ট্রকুটনন্দিনী শংখ-দেবী এসে এই রাজসংসারের হাল ধরলেন। শুধু মাত্র ধরা নয়, মুষ্টিগত করে বসলেন। তারই ফলে এক এক করে চেদী থেকে আগত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পতন ঘটতে লাগল, আর রাষ্ট্রকুটবংশীয় লোকেরা সেই সমস্ত স্থান অধিকার করে বসছিল। একমাত্র বাকী রইলাম আমি—হংস মধ্যে বকো যথা। সে এক কঠিন সংকটের দিন। দিন দিনই আমার হাতের মুঠো আলগা হয়ে আসছিল। স্বর্গীয় মহারাজ শেষ দিকে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন শংখদেবীকে অতিক্রম করে তাঁর কাছে পৌছানো সহজ ছিল না। সেই দুর্দিনে চেদী থেকে আমরা যারা এসেছিলায তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সুযোগ সুবিধা সব কিছুই সংকুচিত হয়ে আসছিল। শংখ-

দেবী সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন। সমস্তই দেখতে পারছিলাম, বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু প্রথম অমাত্য হয়েও আমার হস্তক্ষেপ করবার কোন ক্ষমতা ছিল না। মহারাজ, আপনার মনে আছে তো সে সব দিনের কথা ?

আছে বই কি, রাজা সমর্থন সূচক ভংগিতে মাথা নাড়লেন।

শংখদেবী মহারাজের পরিবর্তে তাঁর নিজের ছেলে রামপাল-দেবকে সিংহাসনে বসাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজ রাজকুলের চিরাচরিত প্রথা ভংগ করতে সম্মত হন নি। তখন আমাদের মহারাজাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টাও হয়েছে।

বলেন কি ! কীর্তিবর্মা ও পদ্মনাভ দুজনেই চমকে উঠলেন, কই এমন কথা তো আমরা কোন দিন শুনিনি।

রাজা আপত্তি জানিয়ে বললেন, না না, এ কথাটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত বলেছিলেন আমার বিসূচিকা হয়েছিল।

বৈদ্যের চোখে সবটাই কি ধরা পড়ে ? বরাহস্বামী অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। তারপর তাঁর আগেকার কথাটার জের টেনে তিনি বলে চললেন—আমাদের মহারাজ সিংহাসনে বসবার পর থেকে আমরা আমাদের পুরাতন পদ ও প্রতিষ্ঠা আবার ফিরে পেয়েছি। কিন্তু শংখদেবী আর রামপালদেবের উচ্চাশার মূল এখনও উৎ-পাটিত হয়নি, দৃষ্টির আড়ালে তা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রকুটবংশীয়েরা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও নিশ্চেষ্ট নয়। শংখদেবীকে আমার মত এমন করে কেউ চেনে না। এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে, তিনি যেখানেই থাকুন বা যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাঁর প্রতিভা কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না।

পদ্মনাভ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, এত সব কথা তো জানতাম না।

হ্যাঁ, তোমরা পরে এসেছ, সেইজন্য তোমাদের অনেক কথাই

জানা নেই। কিন্তু তোমাদের এগুলি জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারবেনা।

পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন, রাষ্ট্রকুটবংশীয়দের সম্বন্ধে এই যদি আপনার ধারণা তাহলে মথনদেব এখনও বাইরে কেন?

মহাপ্রতীহার কীর্তিবর্মা নিষ্প্রভ হয়ে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে কোন কথা বলবার সুযোগ পাননি। তাঁর মনে হচ্ছিল এতক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে থাকাটা তাঁর পক্ষে ঠিক শোভা পাচ্ছে না। তাই তিনি ফস্ করে বলে উঠলেন, আমিও সেই কথাই বলি।

না, আপনি সে কথা বলেন না, বরাহস্বামী সংগে সংগেই বলে উঠলেন, একটু আগেই আপনি বলেছেন, মথনদেবের সম্বন্ধে সন্দেহ অমূলক, তিনি ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞ লোক, তিনি শাস্ত্রচর্চা নিয়েই মেতে থাকেন।

ক্রোধে অপমানে কীর্তিবর্মার মনটা রি রি করে উঠল। কিন্তু মনের ক্রোধ মনেই হজম করে নিতে হয়। বরাহস্বামীর এই কথার সত্যিই তো কোন উত্তর নেই।

রাজা বললেন, না সেটা ঠিক হবে না। মথনদেব নগরের হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর গায়ে হাত পড়লে তার প্রতিক্রিয়াটা খুবই খারাপ হবে।

বরাহস্বামী এ বিষয়ে রাজার সংগে একমত। তিনি বললেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু একমাত্র এটাই কথা নয়, আরও কথা আছে। এই ষড়যন্ত্র সুদূরপ্রসারী, আর আমার বিশ্বাস মথনদেবের ভবন এর কেন্দ্র-স্থল। কিন্তু সবই আমাদের অনুমান, তারই উপর নির্ভর করে আমরা অন্ধকারে হাতড়ে মরছি। বিশেষভাবে সেই জন্যই মথনদেবকে বাইরে রাখবার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়েই ওদের কার্যকলাপ আর সূত্রগুলির অনুসরন করবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের গুপ্ত পুরুষদের মাথায় যদি আর একটু পদার্থ থাকত! আমি দেখছি, এরাই আমাদের প্রতিপক্ষের সব চেয়ে বড় সহায় হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এদের পেছনে অর্থব্যয় করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

কীর্তিবর্মা ব্যর্থ উত্তেজনায় ওষ্ঠ দংশন করলেন।

রাজা মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কি একটা বক্তব্য আছে বলছিলেন, সেটা বলুন এবার।

পদ্মনাভ তাঁর বক্তব্যটা উপস্থিত করলেন ঃ

সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি বার বার আপনাদের জানিয়েছি, কিন্তু আপনারা এদিকে তেমন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আমি বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের কথা বলছি। ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সেখান থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে সেগুলো ভাল নয়। এখানে ওখানে একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। আমাদের প্রতিপক্ষ যদি ওদের এই অসন্তোষটাকে তাদের কাজে লাগায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বরাহস্বামী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কেন, কৈবর্তদের কি হোল আবার?

পদ্মনাভ উত্তর দিলেন, না নতুন কিছু হয়নি। বহু দিনের অসন্তোষ চাপা পড়া আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। হঠাৎ মাঝে মাঝে অগ্নিশিখার রূপ নিয়ে ফেটে বেরিয়ে আসে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের রাজপুরুষদের দায়িত্বও কম নয়। তাদের আরও একটু বিবেচনা করে কাজ করা উচিত।

কিসের জন্য এই অসন্তোষ? কি চায় ওরা? রাজা প্রশ্ন করলেন।

অভিযোগ এদের একটা নয়, অনেক। প্রথমত ওরা বলে, ওদের কাছ থেকে যে ভূমিকর সংগ্রহ করা হয় তা নাকি অবৈধ।

অবৈধ? তার মানে? রাজার ভূমিতে বাস করবে, আর রাজাকে কর দেবে না। এটা আবার কোন বিধি? ওদের কাছ থেকে কি অত্যধিক পরিমাণ ভূমিকর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

অথবা রাজ পুরুষেরা কি অন্যায় ভাবে অতিরিক্ত শস্যের জন্য চাপ দেন ?

না, তা নয়। অন্য সব অঞ্চলে যেই ব্যবস্থা এখানেও তাই উৎপন্ন শস্যের ছ' ভাগের এক ভাগ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আর কোন রকম কর দেয় এরা ?

না, এদের উপর আর কোন কর ধার্য করা হয় নি।

রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, তবে তো অন্যান্য প্রজাদের চেয়েও এরা সুখে আছে। এরা কি যে বলতে চায়, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

পদ্মনাভ বললেন, ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার নিজের মনেও একটু খটকা আছে। আমি যে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি, এমন কথা আমিও বলতে পারি না। তবে ওরা যেটা বলে থাকে তা বলছি। ওরা বলে, ভূমি ওদের নিজস্ব সম্পত্তি, ওরা জন্ম সূত্রে তাকে ভোগ করে আসছে। তার উপর রাজার কোন অধিকার নেই।

রাজার অধিকার নেই! রাজা এমন অদ্ভুত কথা তাঁর জীবনে কখনও শোনেন নি।

ওরা বলে, বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহের পরম ভট্টারক মহারাজ ধর্ম পালদেবের সংগে ওদের নাকি একটা সন্ধি হয়—

সন্ধি ?

হ্যাঁ, সন্ধি। সেই সন্ধিতে এই শর্ত ছিল, ওদের ভূমির উপর রাজা হাত দেবে না। তবে বিদেশী শক্তির সংগে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটলে ওরা সৈন্য যোগাতে বাধ্য থাকবে। এ ছাড়া লেন-দেন এর ব্যাপারে রাজার সংগে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না ওদের। সেইজন্যই ওরা বলে, ওদের কাছ থেকে যে ভূমি-কর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তা বৈধ নয়।

বরাহস্বামী এতক্ষন কোন কথা বলেন নি, এবার তিনি মুখ

খুললেন, এই শর্ত সম্বলিত কোন লিখিত পত্র তাদের কাছে আছে?

আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম তাদের, পদ্মনাভ বললেন, কিন্তু তারা বলে, আমরা অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ, ও সব লেখালেখির ধার ধারি না। আমরা যুগ যুগ ধরে এই মুখের কথা দিয়েই কাজ চালিয়ে এসেছি, কোন দিন কোন গোলমাল হয় নি। এই লেখালেখি ঢুকিয়েই যত অনর্থের সৃষ্টি করেছ তোমরা। মানুষ মুখ দিয়েই কথা বলে, তাই মুখের কথাই সব চেয়ে বড় কথা।

বরাহস্বামী বললেন, তা হলে যে যা বলবে, তাই মেনে নিতে হবে নাকি? ওদের মত মূর্খের মুখেই এ কথা সাজে। কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কি? ওদের কাছ থেকে ভূমি-কর সংগ্রহ বন্ধ করে দিতে হবে?

না না, তা বলছি না আমি। আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

তবে সেখানকার রাজপুরুষদের এ ব্যাপারে দায়ী করছ কেন তুমি? তাদের যা কর্তব্য তাই তো তারা করছেন।

পদ্মনাভ এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না, কিন্তু নিঃশব্দে মেনেও নিতে পারলেন না। বললেন, তাদের ব্যবহার বড় বেশী রূঢ়, এমন কি আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি সময় সময় কর সংগ্রহের জন্য কঠিন ভাবে শারীরিক নির্যাতনও করা হয়ে থাকে।

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, ভাল হোক আর মন্দ হোক, এটাই স্বাভাবিক রীতি। কর কেউ ইচ্ছা করে দিতে চায় না। তাই সব সময় হাসিমুখে মিষ্টি কথা বলে কর সংগ্রহ করা যায় না। ইক্ষুর রস নিষ্কাশন করতে হলে প্রবল চাপ দিতে হয়, এও ঠিক তাই। কর সংগ্রাহক কোন দিনই কর দাতার কাছে প্রিয় হতে পারে না।

কথাটা মহাপ্রতীহার কীর্তিবর্মার মনে ধরল। তিনি বলে উঠলেন, ঠিক বলেছেন ছোট লোকগুলোকে সব সময় শাসনের উপর রাখতে হয়, কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। একটু প্রশ্রয় দিয়েছেন

কি মাথায় উঠে বসবে। রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি রক্ষা করে চলতে হলে দণ্ডকে সব সময় সক্রিয় রাখতে হয়।

মহাপ্রতীহার এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। সেই মুহূর্তের জন্য তিনি প্রথম অমাত্যের সংগে একাত্মতা অনুভব করলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের কি এই কথাই, না আরও কোন কিছু বক্তব্য আছে?

পদ্মনাভ উত্তর দিলেন, হাঁ, আরও আছে। গোলযোগগুলো বিশেষ করে ঘটছে তাই নিয়েই। সেই কথাই বলছি। অনেকদিন থেকে ওদের মাঝখানে কিছু কিছু বাইরের লোক এনে বসানো হচ্ছে।

বাইরের লোক মানে? রাজা প্রশ্ন করলেন।

বাইরের লোক মানে আমাদের এখানকার ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতির লোকেরা ওদের অঞ্চলগুলিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে।

রাজা বললেন, এতে যে ওদেরই লাভ এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও কি ওদের নেই? ওরা অশিক্ষিত, ধর্মাধর্মজ্ঞানবর্জিত—এদের সাহচর্যে ওরা শিক্ষার আলোক পাবে, প্রকৃত ধর্মের সংস্পর্শ লাভ করবে, সুনীতি ও সদাচারে অভ্যস্ত হবে—এক কথায় বলতে গেলে অর্ধ-পশুর পর্যায় থেকে মানুষের পর্যায়ে উঠবে, এ তো ওদের বহু ভাগ্যের কথা। এ আমরা সব সময়ই অনুমোদন করে আসছি, করবও।

বরাহস্বামী পদ্মনাভের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে হেসে বললেন, কিন্তু তোমার মুখের ভাবে মনে হচ্ছে, তুমি যেন এটা ঠিক অনুমোদন করতে পারছ না। তোমার বক্তব্যটা কি, বলেই ফেল না।

পদ্মনাভের কণ্ঠস্বর এবার একটু গম্ভীর হয়ে এল। তিনি বললেন, তা হলে হয় তো আপনাদের মতই বলতাম। আপনাদের কথার কোনই সত্যতা নেই, এমন কথাও আমি বলি না। কিন্তু এঁরা তো

এঁদের বসবাসের ভূমি সংগে করে নিয়ে যান না, ওখানে গিয়ে ওদের ভূমি অধিকার করে বসেন। সমস্যা দেখা দেয় তখনই।

রাজা বললেন, আপনার কথাটা বুঝলাম। কিন্তু ভূমি তো এরা বলপূর্বক অধিকার করেন না, রাজপুরুষদের সংগে ব্যবস্থা করেই করেন।

পদ্মনাভ তিক্ত হাসি হেসে বললেন, কিন্তু এই দুর্ভাগাদের কি সান্ত্বনা তাতে? যে-ভূমির উপর এদের একান্ত নির্ভর, তার অংশ যদি এ ভাবে হাত-ছাড়া হয়ে যায়, তবে ওরা কি খেয়ে বাঁচবে? কিন্তু এইখানেই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কেউ যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, পরকে প্রবঞ্চনা করে ছলে বলে কৌশলে নিজের কার্যসিদ্ধ করে নিতে পারে, এ সমস্ত কথা ওরা আগে কল্পনাও করতে পারত না। এখন ক্রমশই এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠছে। কিন্তু ওদের বাছা বাছা ভূমিখণ্ডগুলো কেমন করে নবাগতদের হাতে চলে যায়, এ রহস্য ওরা আজও বুঝতে পারে না। ওরা ওদের সমাজের পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে এ সব জানায়। পঞ্চায়েত তাদের পক্ষ হয়ে রাজপুরুষদের কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু তাতে কোনদিনই কোন ফল হয় না।

বরাহস্বামী প্রথমে ধৈর্য ধরে শুনছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে পড়ল। একটু তপ্ত সুরেই তিনি বলে উঠলেন, তুমি কি ওদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলতে এসেছ নাকি?

বরাহস্বামীকে সবাই সমীহ করে কথা বলে। এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত। তাঁর অপ্রীতিভাজন হলে পতন অবশ্যম্ভাবী, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু পদ্মনাভের কি যে হয়েছে আজ, বহু দিনের সঞ্চিত কথাগুলি চেপে রাখতে পারছেন না, বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তিনি সংযত স্বরে বললেন, না, আমি কারও মুখপাত্র নই। ছোট বড় সকলের স্বার্থ রক্ষা করা রাজার কাজ। সেইজন্যই নিজের চোখে আমি যা দেখেছি, সেই কথাটাই আমি জানাতে চাই,

অবশ্য যদি আপনি আদেশ করেন। বলে তিনি অনুমতি প্রার্থী হয়ে রাজার মুখের দিকে তাকালেন।

রাজা অনুমতি দিলেন, বেশ তো, বলুন না।

পদ্মনাভ বলে চললেন :

বছর তিনেক আগে বরেন্দ্রীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য কতকগুলি অঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেশ দেখবার জন্যই গিয়েছিলাম কিন্তু তার চেয়েও বেশী মানুষ দেখতে। জানি না কেন, এই কৈবর্ত জাতির লোকগুলি আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। যেমন ছেলেরা, তেমনি মেয়েরা। এমন মানুষ আমি আর কোনদিন দেখিনি। যে অঞ্চলে গিয়েছিলাম সেখানকার রাজপুরুষেরা আমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করেছিল। কথাটা রটে গেল। ওরা মনে করল, আমি খুব বড় দরের লোক, আমার কাছে দুঃখ জানালে হয় তো তার প্রতিকার হতে পারে।

ওরা টেনে নিয়ে যেত আমাকে ওদের মোড়লদের কাছে। তাদের কাছে অনেক কথাই শুনতাম। একবার একজনের সংগে দেখা হয়েছিল পাঁচ বছর আগেও যার দশ কুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ছিল। কিন্তু তখন তার এক কনাও বাকী নেই। বহিরাগত এক বৈশ্য পরিবার কলে-কৌশলে তার সমস্ত ভূমি গ্রাস করে নিয়েছে। আর সেই অভাগা এখন সেই বৈশ্যের কাছেই দাস্যবৃত্তি করছে। সে, তার বৌ, আর তার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের সেই ক্ষেতেই কাজ করছে, আর ফসল উঠছে সেই বৈশ্যের ঘরে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, শুধু সে-ই নয়, তার মত আরও অনেকে এইভাবে জমি হারিয়ে নিঃস্ব হতে চলেছে।

রাজপুরুষদের কাছে কথাটা বলতেই তারা সোজা অস্বীকার করে বসল। বলল, সমস্তই ব্যাটাদের বানানো কথা। ভূমি সংগ্রহের ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ বৈধভাবেই সম্পাদিত হয়েছে, এর মধ্যে কেউ কোন ফাঁক বার করতে পারবে না। তারপর যেখানে সেখানে যার

তার কাছে যাই বলে তারা আমাকে বেশ একটু গঞ্জনাও দিল। পরে শুনেছি তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পাঠিয়েছিল যে আমি নাকি তাদের কর্তব্য কর্মে বাধা সৃষ্টি করেছি। প্রথম অমাত্য নিশ্চয়ই তাদের সেই অভিযোগ সম্পর্কে অবগত আছেন।

বরাহস্বামী বললেন, হ্যাঁ, সেই অভিযোগ পত্র আমি নিজে দেখেছি। এ বিষয়ে অনুসন্ধানও করিয়েছিলাম। তাতে দেখলাম ব্যাপারটা নিতান্তই সামান্য, তাই এই নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করতে চাইলাম না।

করলেই কিন্তু ভাল হোত, পদ্মনাভ মন্তব্য করলেন, তার ফলে আমার ভাগ্যে যা-ই হোক না কেন, এর মধ্য দিয়ে অনেক গোপন রহস্য বেরিয়ে আসতে পারত।

বরাহস্বামী বললেন, তুমি কি মনে কর ওখানে কি ঘটছে না ঘটছে, আমরা তার কোন খবরই রাখি না? কিন্তু ভাল মন্দ সব জায়গাতেই আছে। কোথায় নেই? আর তুমিই বা ওরা যা বলেছে সমস্তই সত্য বলে মনে করে নিয়েছ কেন? এ তোমার কোন দেশী বিচার?

পদ্মনাভ বললেন, ওরা তো মিথ্যে কথা বলতে জানে না।

বরাহস্বামী হো হো করে হেসে উঠলেন, সত্য যুগ সারা পৃথিবী থেকে সরে গেছে, শুধু ওই জায়গাটাতেই বুঝি এখনও আটকে আছে?

তার সংগে পাল্লা দিয়ে কার্তিবর্মাও হাসলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি আরও কিছু বলার আছে?

পদ্মনাভ বললেন, হাঁ, আরও একটু বলার আছে। এবার কিছু-দিন আগে ওখানে গিয়েছিলাম। নতুন একটা পরিবর্তন দেখে এলাম। সেই শান্ত শিষ্ট সরল সাদাসিধে মানুষগুলি কেমন যেন মারমুখো হয়ে উঠেছে। এটা নিয়ে ওটা নিয়ে এখানে ওখানে প্রায়ই

হাংগামা বাঁধছে। নিজের চোখে একটা ঘটনা দেখেছিলাম। ওরা দল বেঁধে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

কীর্তিবর্মা গর্জে উঠলেন, কি, এত বড় সাহস! তারপর—তারপর কি হোল?

তারপর কি যে হয়েছিল, তা বলতে পারব না। তার পরেই আমি চলে এলাম কি না।

বরাহস্বামী বললেন, এর পরে কি হয়েছিল, সে কথা আমার কাছ থেকে শুনে নিতে পার। ওই গ্রামটার মধ্যে ওদের যতগুলি বাড়ী ছিল, সবগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছিল।

পদ্মনাভ চমকে উঠে বললেন, এ্যা!

আর গ্রামের সমস্ত বয়স্ক পুরুষদের প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কশাঘাত করা হয়েছিল।

বলেন কি? পদ্মনাভ মাথায় হাত দিলেন, কার আদেশে দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে এই দণ্ড দেয়া হয়েছিল?

সেখানকার রাজপুরুষরা নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দণ্ডদানের পর তারা এই সংবাদটা আমাদের জানান। আমরা তাদের এই উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রশংসা করে পাঠিয়েছিলাম। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্দয়ভাবে দণ্ডদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়, যাতে এই পথে আর কেউ ভুলেও যেন পা না বাড়ায়।

ঠিক ঠিক, কীর্তিবর্মা সমর্থন জানালেন, কোন অবস্থাতেই এর প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

বরাহস্বামী বললেন, তুমি বলছ ওরা শান্তশিষ্ট মানুষ! ওদের মুখের দিকে তাকালে প্রথমে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু ওদের ভিতরটা এর বিপরীত। সময় বিশেষে ওরা বাঘ আর সাপের মতই দুর্দান্ত আর হিংস্র হয়ে ওঠে। উপযুক্ত ওষুধ না পড়লে শান্ত হয় না। স্বর্গীয় মহারাজের আমলে একবার বিষম ক্ষেপে উঠেছিল। তারপর যখন উপযুক্ত ওষুধ পড়ল, তখন সব ঠাণ্ডা। অনেকদিন হয়ে গেছে

কিনা, ওরা বোধ হয় সে কথাটা ভুলে এসেছে। আর একবার ভাল করে সে কথাটা মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বরাহস্বামীর কথা শুনে পদ্মনাভ বুঝলেন, এতক্ষণ ধরে বৃথাই তিনি এ সমস্ত কথা বলে চলেছেন। বরেন্দ্রীর অবস্থা সম্বন্ধে এঁরা হয়তো তার চেয়েও ভাল করেই জানেন। আর সমস্ত জেনে শুনেও দমননীতি চালাতে চান। এ অবস্থায় এ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু এই কি তার উপযুক্ত সময়? আপনি নিজেই তো বলছিলেন, আমরা এমনিতেই কঠিন সংকটের মধ্যে আছি।

হ্যাঁ, বলছিলাম। আর সেই জন্যই যেটা অবশ্য করণীয় তা অবিলম্বে করে ফেলা প্রয়োজন। নইলে শেষে হয়তো আর করার মত সময় থাকবে না। কিছুদিন ধরে বরেন্দ্রী থেকে নানারকম অশান্তি আর গোলযোগের সংবাদ আসছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। এত বাড়া ভাল নয়। ব্যাধি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই ওষুধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ঠিক কথা, ঠিক কথা, কীর্তিবর্মা আন্তরিক সমর্থন জানালেন।

পদ্মানাভ রাজার মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তার মনোভাব কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবে মনোভাব যাই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রথম অমাত্যের মতেই মত দিয়ে চলতে হবে, সভাসদদের মধ্যে এ কথা সবাই জানেন। পদ্মনাভের কাছেও এ কথাটা অজানা নয়।

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, মহারাজের কাছে আমার একটা প্রার্থনা। বরেন্দ্রীর দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলে আমার পক্ষে ভাল হয়।

রাজা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি, আপনি তো কখনোই কর্মকাতর নন, তবে অব্যাহতি চাইছেন কেন? আপনি কি আমাদের কোন কথায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন?

না, না মনঃক্ষুণ্ণ নয়। আর কাজ যতই গুরুভার হোক না কেন সেজন্য আমি ভয় পাই না, তাও ঠিক। কিন্তু কথা তা নয়। আসল কথা আমার মনে হয় ওখানকার কাজের পক্ষে আমি একান্তভাবে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। ওখানকার রাজপুরুষদের ব্যবহারে মনে হয়, তারাও মনে মনে সেইরকম ধারণাই পোষণ করেন। তাদের কথায় বুঝতে পারি তারা প্রতি বিষয়ে এমন কি অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এখান থেকে বিস্তারিত নির্দেশ পেয়ে থাকেন। অথচ আমি তার বিন্দু বিসর্গ জানি না। সময় সময় এমনও হয় যে এখান থেকে যে সমস্ত নির্দেশ যায় তার সংগে আমার কথার সংগতি থাকে না। এটা খুবই অসুবিধাজনক—সেখানে নিযুক্ত রাজপুরুষদের পক্ষেও বটে, আমার পক্ষেও বটে। তারা আমাকে কিছুটা বাহুল্য বলেই হয়তো মনে করেন। তাদের পক্ষে এ রকম মনে করাটা খুবই স্বাভাবিক।

রাজা বরাহস্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। বরাহস্বামীকে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তোমার অসুবিধাটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, পরে এ বিষয়ে তোমার সংগে কথা বলব।

তা বলবেন। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন বরেন্দ্রী কি আমাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল ?

রাজা বললেন, নিশ্চয়। এতদিন বাদে এমন একটা প্রশ্ন কেন ?

পদ্মনাভ কথাটা মাটিতে পড়তে না দিয়েই সংগে সংগে বলে উঠলেন, বেশ কথা, তাই যদি হবে তা হলে মহাসান্ধিবিগ্রহিক হিসাবে বরেন্দ্রীর দায়িত্ব আমার উপর পড়বে কেন ?

বরাহস্বামী আপত্তি জানিয়ে উঠলেন, না না, ঠিক তা নয়। এই বরেন্দ্রী অঞ্চলে ছোট ছোট সামন্ত উপসামন্ত প্রভৃতি আছে।

তাই যদি হবে, তবে বরেন্দ্রী মণ্ডলে এখানকার রাজপুরুষেরা নিযুক্ত আছেন কেন ?

আর সামন্তদের প্রজাদের কাজ থেকে তারাই বা কোন নিয়মে কর সংগ্রহ করেন ?

কথাটার যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নেই। বরাহস্বামী সংগে সংগেই কথাটার উত্তর দিতে পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, বরেন্দ্রী অঞ্চল সম্পর্কে এ এক বিশেষ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু বরেন্দ্রী সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করার মত সময় পাওয়া গেল না। একজন পরিচারক দ্রুতপদে এসে সংবাদ দিল কর্ণসুবর্ণ থেকে একজন দূতক মহাসান্ধিবিগ্রহিকের দর্শনাকাংক্ষী।

কোথায় আছেন তিনি? পদ্মনাভ ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। পরিচারক উত্তর দিল, তিনি রাজঅতিথিশালায় আছেন।

রাজার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে পদ্মনাভ চলে গেলেন। বরাহস্বামী চিন্তিত দৃষ্টিতে তাঁর গতিশীল মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাজাও সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। পদ্মনাভ দৃষ্টির আড়াল হতেই বললেন, মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মনটা বড়ই কোমল—

রাজাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কীর্তিবর্মা বলে উঠলেন, হ্যাঁ, একেবারে কাদা-কাদা, এমন লোককে দিয়ে এ সব কাজ— কিন্তু কথাটা আর শেষ করা হোল না, বরাহস্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি মাঝপথেই থেমে গেলেন।

বরাহস্বামী বললেন, এমন নিষ্ঠাসম্পন্ন কাজের লোক দুর্লভ। অদ্ভুত তার কাজের শৃংখলা। তেমনি তার ব্যবহার। এই ক'বছরের মধ্যেই দেশের লোক ও বাইরের রাজন্য বর্গের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কীর্তিবর্মা বললেন, ঠিক কথা। এ রকম লোক—

এবারও তিনি তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না বরাহস্বামীর চোখ দুটি আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে।

কীর্তিবর্মা এ জিনিসটা কিছুতেই বুঝতে পারেন না, তিনি যাই

বলতে যান, বরাহস্বামীর কাছে সেটাই যেন অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বরাহস্বামীর কথার প্রতিবাদ করে দেখেছেন বরাহস্বামী অল্পেতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আবার তাঁকে সমর্থন করতে গেলে আরও যেন অগ্নিশর্মা হয়ে যান। একটানা চুপ করে বসে থাকা সেটাই বা কেমন দেখায়? এই সব কারণ অনেক দিন থেকেই বরাহস্বামীর বিরুদ্ধে তার ভিতরে ভিতরে বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু বিক্ষোভের মাত্রা যত বেশীই হোক না কেন, কিছুই করবার উপায় নেই। তাই মনের ঝালটা মনেই হজম করে নিতে হয়।

রাজা পদ্মনাভের সেই কথাটায় ফিরে এলেন, যাই বলুন কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবার মত। আর সব জায়গা থেকে বরেন্দ্রীতে এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন? কি আশ্চর্য, আমার নিজের মনেও এই প্রশ্নটা কোন দিন জাগেনি। যা চিরাচরিত, সহজ সংস্কারের বশে সেই-টাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করে এসেছি।

বরাহস্বামী আশ্চর্য হয়ে বললেন, সেকি, এ কথাটা আপনার মনে নতুন করে জাগল? এর পিছনকার ইতিহাসটা তো আপনার জানা থাকার কথা।

পিছনকার ইতিহাস? কি ইতিহাস? আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বরাহস্বামী বললেন, কৈবর্তেরা যে সন্ধির কথা বলছে, তাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কথাটা মূলতঃ সত্য।

বলেন কি! রাজা অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন, গৌড় সম্রাট সন্ধি করতে যাবেন এই বর্বর কৈবর্তদের সংগে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য না হলেও উপায় নেই। পুরাতন রাজকীয় লেখ সমূহে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে। তবে একটা কথা ওরা ভুল বলে, সন্ধিটা পরমভট্টারক ধর্মপালদের সময়ে হয়নি, হয়েছিল

পরমভট্টারক প্রথম বিগ্রহপালদের সময়ে। কৈবর্তদের আজ যে অবস্থায় দেখছেন, আগে তা ছিল না। এখন তো এরা পোষ মেনে এসেছে। কিন্তু এক সময় এরা ছিল ভীষণ দুর্ধর্ষ জাতি। গৌড়ের সম্রাটদের এদের সংগে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে আসতে হয়েছে।

আপনার কথাগুলি আমার কাছে প্রহেলিকার মতই লাগছে। উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটদের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এই বর্বরদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব ?

ঠিকই বলেছেন, কথাটা কিছুটা প্রহেলিকার মতই শোনাবে। অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। তা ছাড়া আমাদের গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী আর পদাতিক এই চতুরঙ্গ বাহিনী, আর ওদের সবাইকেই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে হত। কিন্তু ওদের সবচেয়ে বড় শক্তি ওদের সংঘশক্তি। সেই শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি সেদিন। ওরা বার বার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাতেও ভেংগে পড়েনি, কোন পরাজয়কেই ওরা চূড়ান্ত, পরাজয় বলে মেনে নেয় নি। সে সময় বরেন্দ্রীর এখানে ওখানে গহন অরণ্য। সেইগুলি ছিল ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। ওদের কোনমতেই অবরুদ্ধ করে ফেলার উপায় ছিল না। অবস্থা সংকট-জনক বুঝলে ওরা ওদের সেই অরণ্য দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে প্রবেশ করত। গৌড়ের সৈন্যবাহিনীর সাধ্য ছিল না যে সেখানে গিয়ে তাদের উপর হানা দেয়। কিন্তু শুধু প্রাণ বাঁচাবার জন্যই যে ওরা আত্মগোপন করত তা নয়, নিশ্চিন্ত জনপদবাসীদের মনে মহা আতংকের সৃষ্টি করে ওরা অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের উপর। লোকে বলত, ওরা মানুষ নয়, মায়াবী দানব। এমন কি একবার ওরা রাজধানী গৌড়ে এসেও চড়াও হয়েছিল।

বলেন কি! রাজা চমকে উঠে বললেন, এতই সাহস। কিন্তু ঘটনাটা সত্য তো, না উড়ো কথা ?

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, না উড়ো কথা নয়। রাজকীয় লেখমালায় এর উল্লেখ আছে। আর সাহসের কথা বলছেন, সাহসের অভাব ওদের ছিল না। তার দৃষ্টান্ত আজও দেখা যায়। আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কৈবর্তেরাই সব-চেয়ে সাহসী বলে পরিচিত, এ কথা সবাই স্বীকার করবে।

কিন্তু সে সময় ওদের কি আমাদের মত সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ছিল ? নিয়মিত সৈন্য পোষণ করবার ব্যয় বহন করতে পারত তারা ?

না সৈন্যবাহিনী বলতে আমরা যা বুঝি ওদের তা ছিল না। ওদের মধ্যে সমর্থ যারা তারা সবাই সৈন্য হিসাবে গণ্য ছিল। তা ছাড়া তেমন প্রয়োজন হলে মেয়েরাও যুদ্ধে যোগ দিত।

মেয়েরা ?

হ্যাঁ মেয়েরা। আমাদের মেয়েদের দিয়ে এদের বিচার করবেন না। এদের মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। ওখানে গেলে এখনও তাই দেখতে পাবেন। কিন্তু কৈবর্তদের আরও একটা জোর ছিল। কোচ, মেচ প্রভৃতি যে সব বর্বর জাতি বরেন্দ্রীর নানা অঞ্চলে বসবাস করত তারাও এদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে ওদের সংগে যোগ দিয়েছে। সমস্যাটা সেই জন্য আরও বেশী কঠিন হয়ে উঠত।

রাজা প্রশ্ন করলেন, এত সমস্ত কথা আপনি কেমন করে জানলেন ? এর সব কথাই কি রাজকীয় লেখমালায় উল্লিখিত আছে ?

না, না, বংশানুক্রমে লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে এ সব কাহিনী। কীর্তিবর্মা সমর্থন করে বললেন, হ্যাঁ, এ সব কথা আমরাও শুনেছি।

রাজা একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, লোকের মুখের কথা, তার কি মূল্য আছে ? কতদিন আগেকার কথা, লোকের মুখে মুখে তিল থেকে তালে পরিণত হয়ে যায়।

বরাহস্বামী প্রতিবাদ করে বললেন, না, না, লোকের মুখের কথা বলে উড়িয়ে দেবেন না। এ শুধু আমাদের এখানকার লোকের কথা নয়। কৈবর্তদের মধ্যে এক রকম লোক আছে, যারা গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। এটাই তাদের বৃত্তি। এরা বিশেষ করে সেই সব প্রাচীন দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী নিয়ে গান করে। আমি নিজে সেই সব গান শুনেছি। আমাদের এখানকার প্রচলিত কাহিনীর সংগে-তার বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজা বললেন, আচ্ছা ও কথা থাক। কিন্তু আপনি সেই সন্ধির কথা বলুন। সেই সন্ধির শর্ত ছিল কি ?

সন্ধির শর্ত অনুসারে কৈবর্তদের বরেন্দ্রীকে আমরা স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তবে তার সংগে এই কথাটাও ছিল যে, বাইরে থেকে কোন শক্তি এসে আক্রমণ করলে আমরা উভয় পক্ষ মিলিত ভাবে তার প্রতিরোধ করব।

বটে! বটে! আপনার কথাটা সত্য হলেও আজকার দিনে এটা বিশ্বাস করা সহজ নয়। কিন্তু সেই সন্ধি ভেংগে গেল কেন ? সে জন্য দায়ী কে ?

বরাহস্বামীর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি কীর্তি-বর্মার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার নাকি কি একটা প্রয়োজন ছিল ?

কীর্তিবর্মা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থা। দায়িত্ব নিয়ে দেখা শোনা করবার মত লোক ঘরে নেই। তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে আমি চির দিনই গৌণ বলে মনে করে থাকি।

আহা, তা কি আর জানি না !

কথাটা বিদ্রূপোক্তি না সরল ভাবেই বলা হয়েছে, কীর্তিবর্মা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রথম অমাত্যের কথার তাৎপর্য নিয়ে এরকম মাঝে মাঝেই তাকে সংশয়ে পড়তে হয়।

বরাহস্বামী রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনার অনুমতি পেলে উনি যেতে পারেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়, অবশ্যই যাওয়া উচিত, রাজা সম্মতি জানালেন।

অনুমতি পেয়ে কীর্তিবর্মা চট্‌পট বিদায় নিলেন।

রাজা সকৌতুকে হেসে বললেন, মহাপ্রতীহারকে বিদায় দেবার জন্য আপনি হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বলে মনে হল ?

বরাহস্বামীও হাসলেন, আমার এই হঠাৎ ব্যস্ততাটা আপনার চোখে ধরা পড়ে গেছে ? এ সব কথা নিয়ে যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল। কিন্তু মহাপ্রতীহার মন্ত্রগুপ্তির সার্থকতা এখনও বুঝে উঠতে পারেন না। মহাপ্রতীহারের মুখ যদি এত পাতলা হয়, তা হলে তিনি কেমন করে তাঁর কাজ করবেন ? আগে আমার খেয়াল ছিল না, নইলে এই প্রসংগটা কখনোই তুলতাম না। আপনি বলছিলেন, সেই সন্ধি ভেংগে যাবার জন্য দায়ী কে ? এর সঠিক উত্তর দেযা কঠিন। আমাদের পক্ষের লোকেরা বলে ওরা আর ওরা বলে আমরা।

সন্ধি ভংগ করে ওদের লাভটা কি ? রাজা প্রশ্ন করলেন, আমাদের পক্ষ কি বলে ?

আমাদের পক্ষ ? তারা বলে, ওদের সমাজের দুরবস্থা, বিশৃংখলা ও গৃহবিবাদের ফলে আমাদের বাধ্য হয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। ওরা নিজেরাই আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে সেই দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারছি না। আমার আগে যিনি প্রথম অমাত্য ছিলেন তাঁর মুখেই এ কথা শুনেছি।

আর ও পক্ষ ? ও পক্ষ কি বলে ?

ওদের মধ্যে খুব ধুরন্ধর যারা, তারা বলে, ওদের ভিতরকার বিশৃংখলা আর গৃহবিবাদ সবই নাকি আমাদের সৃষ্টি। আর তারই উপলক্ষ করে আমরা নাকি ওদের উপর চেপে বসে আছি।

আপনি কি মনে করেন ? কাদের কথা সত্য ?

সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আমি কেমন করে বলব! তবে ওদের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে আমি আমার পূর্ববর্তীদের যোগ্যতার অবশ্যই প্রশংসা করব। যে জালের মধ্যে ওরা জড়িয়ে পড়ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসা ওদের পক্ষে আর কোনদিন সম্ভব হবে না।

কিন্তু এ কি নীতি সম্মত কাজ ?

বরাহস্বামী রাজার প্রশ্ন শুনে মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, নীতি সম্মত কি না ? অবশ্যই নীতিসম্মত। এর নাম রাজনীতি। ব্যক্তিগত নীতি আর রাজনীতি এক জিনিস নয়। প্রথমটি ব্যক্তির পক্ষে সত্য, দ্বিতীয়টি সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে। এ সম্পর্কে আপনার সংগে আরও এক দিন আলাপ হয়েছিল।

হ্যাঁ আপনি পরম জ্ঞানী কৌটিল্যের কথা বলছিলেন। কিন্তু তিনি কি এই নীতি সমর্থন করেন ?

সমর্থন নয়, এই নীতি তাঁরই সৃষ্টি। আমরা গুরুগৃহে তাঁর গ্রন্থ পাঠ করেই রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেছি। এ সম্পর্কে তিনি কি বলছেন শুনুন :

"সংঘের আসন্নবর্তী হইয়া সত্রি নামক গূঢ় পুরুষগণ সংঘগুলির পরস্পরের মধ্যে দোষ, দ্বেষ বা রোষ, অপকারাদি নিমিত্তক বৈর বা দ্রোহ ও কলহের কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবোশত ভেদ ঘটাইবে এবং বলিবে 'অমুক সংঘ তোমাদের সংঘের এইরূপ অপবাদ করে।' অন্য সংঘের প্রতিও এই ভাবে বলিয়া তাহারা উভয় পক্ষ মধ্যে ভেদ আনয়ন করিবে। পরস্পরের প্রতি রুষ্ট ভাবাপন্ন সংঘীদিগের মধ্যে আচার্য নামক গূঢ় পুরুষগণ বিদ্যা, শিল্প, দ্যূত ও বৈহারিক বিষয়ে বালকলহ উৎপাদন করাইবে। তাহারা সংঘমধ্যে হীনগণের সহিত বিশিষ্টগণের এক পংক্তিতে ভোজন ও বিবাহসম্বন্ধ নিবারণ করিবে। ......অথবা সংঘমধ্যে

কোন ব্যবহার ন্যায্যভাবে নির্নীত হইলেও তাহারা ইহার বিপরীত ন্যায় সমর্থন করিয়া শুনাইবে বা বুঝাইবে। অথবা তীক্ষ্ণ নামক গূঢ় পুরুষেরা রাত্রিতে সংঘীগণের মধ্যে কোন বিবাদ বিষয় উপস্থিত হইলে এক পক্ষের দ্রব্য, পশু ও মনুষ্য নষ্ট করিয়া, অপর কোন পক্ষের উপর সেই দোষ আরোপ করিয়া তাহাদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিবে। ……বিক্রমের অবসর উপস্থিত হইলে শৌণ্ডিক ও সৌরিকের বেশধারী গূঢ় পুরুষগণ নিজেদের পুত্র ও স্ত্রীর মরণচ্ছলে ইহা প্রেতের উদ্দেশ্যে দেয় 'নৈষেচনিক' নামক মদ্য এই বলিয়া মদনরসযুক্ত শত শত মদ্যকুম্ভ সংঘের নিকট প্রদান করিবে। …… অথবা কুলটা স্ত্রীর পোষণকারী, অথবা প্লবক, নট, নর্তক ও সৌভিক-গণের অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকগণের বেশধারী গূঢ় পুরুষেরা গুপ্তচরের কার্যে ব্যাপারিত থাকিয়া পরমরূপযৌবনবিশিষ্টা স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘমুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। সংঘমুখ্যেরা এই ভাবে স্ত্রীকামী হইলে তাহাদের মধ্য হইতে অন্যতমের কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, মিলনের সংকেতস্থল ঠিক হইলে সেই রমণীকে অন্য এক সংঘমুখ্য দ্বারা অন্যত্র নেওয়াইয়া বা অন্য সংঘমুখ্য তাহাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা কথা রটনা করাইয়া, সংঘমুখ্যদিগের মধ্যে তাহারা কলহ উৎপাদন করিবে। এই ভাবে কলহ উৎপন্ন হইলে তীক্ষ্ণ নামক গূঢ় পুরুষেরা তাহাদের নিজকার্য সমাধা করিবে অর্থাৎ কোন একজন সংঘমুখ্যের হত্যা সাধন করিবে এবং রটাইয়া দিবে 'এই কামুক ব্যক্তি প্রতিকামুক অন্য ব্যক্তি দ্বারা হত হইয়াছে'। অথবা এই সংঘমুখ্যগণের মধ্যে যদি কেহ ঝগড়া করিতে না চাহেন, তাহা হইলে সেই রমণী এই প্রকার বলিবে—'আপনার প্রতি আমি জাতকামা হই—ইহাতে অমুক সংঘমুখ্য বাধা প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি ইহা ইচ্ছা করেন না। তিনি জীবিত থাকিলে আমি আর এখানে আপনার নিকট থাকিতে পারি না। এই বলিয়া সে তাহার বধের আয়োজন করিবে।"……

রাজা এ কথায় চুপ করে রইলেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখে কোন কথা ফুটল না।

অবশেষে তাঁর সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, ব্যক্তিগত ভাবে কেউ এ সমস্ত কাজ করলে বিচারে তার চরম দণ্ডের ব্যবস্থা হোত।

বরাহস্বামী মাথা নেড়ে বললেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু এ তো ব্যক্তির প্রশ্ন নয়, এটা সমূহের প্রশ্ন। সেই মান দিয়েই এই প্রশ্নকে বিচার করতে হবে।

তা হলে সংসারে মূল নীতি বলে কি কোন কথা নেই?

বরাহস্বামী হেসে বললেন, এ সংসারের মূল কি কেউ কখনও খুঁজে পেয়েছে? নীতির মূল বা মূল নীতির সন্ধানই বা কেমন করে পাওয়া যাবে! আমরা স্থান, কাল, পাত্র এবং অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি বা নিতে বাধ্য হই।

কথাটা চিন্তনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজা সবটা পুরোপুরি হজম করে নিতে পারছিলেন না। একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনার কথাটা বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে এমন কতগুলো সাধারণ নীতি কি নেই যা সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব অবস্থায় প্রযোজ্য?

এ কথার উত্তর দেবে কে? আমাদের পিছনে অতীতের সমুদ্র, তার কতটুকু আমরা দেখতে পাই? সামনে ভবিষ্যতের অন্তহীন মহাসমুদ্র, তার সবটাই আমাদের দৃষ্টির বাইরে। এরমধ্যে সীমাবদ্ধ কাল ও সীমাবদ্ধ পরিবেশে বর্ধিত মানুষ আমরা-আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সামর্থ্য কোথায়?

রাজা বললেন, কেন, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষরাও কি বলতে পারেন না?

বরাহস্বামী সশব্দে হেসে উঠলেন, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ! আছেন নাকি তারা কোথাও? সত্যমিথ্যে ভগবান জানেন, শুনেছি সত্য যুগে তাঁরা নাকি সত্য সত্যই ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, এ

যুগে তেমন কোন মহাপুরুষের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়নি এখনও। হলে জিজ্ঞাসা করে নেব।

তাঁর মুখের ভাষায় তাঁর মনোভাব যতটা প্রকাশিত হোল, তার চতুর্গুণ প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যংগমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে। এই দুঃসাহসী ব্রাহ্মণের এই ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত। তবে বরাহস্বামী সর্বত্র মন খুলে এ সব কথা বলেন না। এ সব কথা বলবার মত তাঁর দু'চারজন অন্তরঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য লোক আছে। রাজা তাদের মধ্যে একজন। তিনি মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলে বসেন, যা শুনতে রাজার ভয় ভয় করে, অথচ ঔৎসুক্যও জাগে।

ত্রিকালের কথা বাদ দিয়ে আমাদের এই খণ্ডিত বর্তমানের দিকেই চেয়ে দেখুন না। এখানে বালকদের পক্ষে যে নীতি প্রযোজ্য বয়স্ক লোকেদের পক্ষে তা প্রযোজ্য নয়, পুরুষের পক্ষে যা প্রযোজ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তা নয়, সুস্থের পক্ষে যা প্রযোজ্য অসুস্থের পক্ষে তা নয়, প্রজার পক্ষে যা প্রযোজ্য রাজার পক্ষে তা নয়, শূদ্রাদি ইতর লোকের পক্ষে যা প্রযোজ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে তা নয়। অন্য দিকে দেখুন, আমাদের আর্যদের পক্ষে যেটা দুর্নীতি, আর্যদের কোন কোন জাতির মধ্যে সেটাই নীতিসম্মত। আবার আমরা যাকে সদাচার বলে শ্রদ্ধা করি, কেউ কেউ তা শুনলে অবাক হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে তারা হাসাহাসি করে। বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ সংস্কার ও প্রতিভা অনুযায়ী নিজস্ব পন্থায় নিজেদের জীবনকে নিয়মিত করে আসছে। তার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে তাদের নীতি।

বরাহস্বামীর কথার তোড়ে রাজার মনের খট্‌কাটা আপাতত চাপা পড়ল।

তিনি বলে উঠলেন, কিন্তু কি অদ্ভুত শাণিত বুদ্ধি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, কত প্রাচীন দিনের লোক, কিন্তু কূট রাজনৈতিক প্রতিভার দিক দিয়ে কত দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই

তুলনায় আমরা—তাদের বংশধরেরা কোথায় পড়ে আছি! এই প্রতিভা জাতির গৌরব।

হ্যাঁ, গৌরব তো বটেই, বরাহস্বামী সমর্থনের সুরে বললেন, আর্য জাতির যে সমস্ত মহামূল্য সম্পদ আছে, কৌটিল্যের রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরে কৌটিল্যের নীতি অনুসরণ করে চলবার ফলেই কৈবর্তদের মধ্যে আমরা এই সাফল্য লাভ করতে পেরেছি। অবশ্য এই সাফল্যকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য আরও অনেক কিছু করবার প্রয়োজন আছে। এ কথা মিথ্যা নয়, বিদ্রোহের অগ্নি কণাগুলি ছাইয়ের তলায় এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ কণিকাটিকে নিবিয়ে ফেলা না যায়, ততক্ষণ বিশ্রাম নেবার অধিকার নেই আমাদের?

শুনলাম ওদের মধ্যে কোথায় কোথায় নাকি গোলমালের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, প্রশ্নের সুরে রাজা কথাটা বললেন।

হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাটাও ঘোরালো হয়ে উঠছে দিন দিন। রাষ্ট্রকুটরা যে ষড়যন্ত্রের খেলা খেলে চলেছে, তাই নিয়ে বিব্রত আছি আমরা। তারই ফলে কৈবর্তদের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের মহাপ্রতীহারের মাথাটা একেবারে নিরেট না হয়ে কিছু পদার্থ যদি থাকত। তার কাজের বিবরণ শুনে নিজের হাত নিজেই দংশন করতে ইচ্ছা হয়। একমাত্র দণ্ড চালনা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না তিনি। ফলে সমস্যার সমাধান করবার পরিবর্তে নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টি করবার ব্যাপারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন।

রাজা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে আমরা যেমন ওদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়েছিলাম, ওরা তেমনি সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করে। আমাদের এই সংকটের সময় ওরা যদি বিদ্রোহ করে বসে—

না না, সে ভয় করবেন না, বরাহস্বামী আশ্বাস দিয়ে বললেন, সে শক্তি ওদের নেই। ওখানকার অবস্থা আমাদের আয়ত্তেই আছে। ওদের অনেক লোক প্রকাশ্যে ও গোপনে আমাদের পক্ষ হয়ে কাজ করে চলেছে। সেইখানেই ওদের চরম দুর্বলতা। সেটা ওদেরও অজানা নেই।

আপনি কি এ বিষয়ে এতই নিশ্চিন্ত?

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি এক কালে গণিতের মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিলাম। আমার গণনায় বড় একটা ভুল হয় না। সামন্ত দিব্বোকের প্রভাব সমস্ত কৈবর্তদের উপর পরিব্যাপ্ত। তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। যতক্ষণ তিনি আমাদের পক্ষে আছেন, ততক্ষণ কৈবর্তদের বিদ্রোহ অসম্ভব।

তিন

এখন আমরা বলি বরেন্দ্রী, তাই বলে আগে এর নাম বরেন্দ্রী ছিল না।

বরেন্দ্রী ছিল না, কি নাম ছিল তবে?

ওরা সবাই গোল হয়ে বসে গল্প শুনছিল, এক সংগে কলরব করে উঠল।

কি নাম ছিল, ও বুড়ো ভাই, বল কি নাম ছিল?

ভলকু বুড়ো এত সহজে পেটের কথা ছাড়ে না, রহস্যটাকে আরও একটু ঘনীভূত করে তুলবার জন্য হাসি হাসি মুখে ওদের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কৌতুকে তার চোখ পিট পিট করছিল।

ও বুড়ো ভাই, বল না। ওরা অধৈর্য হয়ে উঠল।

নাম? এর নাম ছিল কট্টলি।

কট্টলি। কট্টলি কি আবার একটা নাম নাকি? পিছন থেকে একটা ছেলে ফস্ করে বলে উঠল।

কি, কি বললি, কট্টলি নামটা মনে ধরল না বুঝি? বুড়ো চটে উঠল, এমন একটা নাম আছে কোথাও, শুনেছিস্ কখনও? বরেন্দ্রী নামটা ভালই, মন্দ বলছি না, কিন্তু তাই বলে কি কট্টলির মত অমন মিষ্টি?

ওদের মধ্যে একজন বুড়োকে খুশী করবার জন্য বলল, ঠিকই বলেছ বুড়ো ভাই, কট্টলির মত নাম হয় নাকি? কিন্তু কট্টলি নাম রাখল কে?

কে আবার রাখবে? শুধু মানুষের মধ্যেই নাম রাখারাখি, আর কেউ নাম রাখে না। আর সবাই যে যার নাম নিয়েই জন্মায়।

নাম নিয়েই জন্মায়? সে কেমন কথা?

হ্যাঁ, নাম নিয়েই জন্মায়। এই যে সামনে গরুটা দেখছিস্, ওর এই গরু নাম দিয়েছিল কে?

প্রশ্নটা কঠিন, সবাই নিরুত্তর হয়ে রইল।

তবে? আমাদের গায়ের চামড়া যেমন গায়ের সংগে লেগে থাকে, ওদের নামও তেমনি। সেই জন্যই তো যেখান থেকে যেই আসুক না কেন, প্রথম দৃষ্টিতেই বলে দেবে এটা গরু, গরু ছাড়া আর কিছু নয়।

এই কথার উপর কেউ কোন প্রতিবাদ করবার ভরসা পেল না। বুড়ো বলল, এই কট্টলি আমাদের সবার মা, তার মাটি থেকেই আমাদের জন্ম।

একজন বলল, বা রে, সে কেমন করে হবে? মাটি থেকে গাছ-পালা জন্মায়, পোকা মাকড়ের সৃষ্টি হতেও দেখেছি, শুনেছি কাছিমের জন্ম এই মাটি থেকেই। কিন্তু মানুষ কি কখনও মাটি থেকে জন্মাতে পারে? মানুষের জন্ম মায়ের পেট থেকে।

আরে পাগল, তখন বাপ মারাই বা আসবে কোত্থেকে? এ দেশে তখন জন মনিষ্যি ছিল নাকি? তখন সারা কট্টলি বনে বনে বনারণ্য। আর তার মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত দত্যি-দানব, দেও-দেবতা, জন্তু-জানোয়ার, পাখী-পাখলা, সাপ-খোপ, পোকা-মাকড় আরও কত কি! কিন্তু এত পেয়েও মন ভরে না কট্টলির।

একদিন কি এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন কট্টলি। উঠে কপালে চাপড় মেরে বললেন, হায় হায়, কোথায় গেল সে? আমার কোল খালি, আমার বুক খালি, আমি কি নিয়ে থাকব?

সবাই বলল, সে কি গো, তোমার কোল খালি হবে কেন? এখানে যারা পায়ে হেঁটে বেড়ায়, বুকে চলে বেড়ায়, ডানার উপর ভর করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, জলের মধ্যে যারা সাঁতরে বেড়ায়, সেই আমরা সবাই তো তোমার ছিষ্টি, তোমার অভাব কিসের?

না: না, এত নিয়েও আমার সুখ নেই। সকল ছিষ্টির সেরা ছিষ্টি সেই যদি না এল, তবে আমার সব মিথ্যা, আমার সব থেকেও কিছু নেই।

কে, কে, কে গো সে? শত কণ্ঠে প্রশ্ন উঠল।

সে এক দামাল ছেলে। স্বপ্নে দেখলাম, আমার পেট থেকে বেরিয়ে এসেই বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐ টুকুন ছেলে কিন্তু গায়ে অসুরের মত বল, দু হাতে আমার একটা মাই চেপে ধরে চোঁ চোঁ করে টান মারল। সে কি টান, আমার মনে হোল সেই সংগে সারা গায়ের রক্ত উঠে আসবে। ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম, পারলাম না। ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা। বড় বেদনা, কিন্তু বড় সুখ! এমন সুখ আর কোন দিন পাইনি। বললাম, কে রে তু' ? ওরে দস্যু, তুই কোত্থেকে এলি? তুই কি আমাকে খেয়ে ফেলবি নাকি? ও ওর মাথাটা দিয়ে আমার বুকের উপর ঢুঁ মারতে মারতে বলল, "আমার যে বিষম খিদে। আমি তোমায় খাব, নইলে এ খিদে মিটবে না।"

আমি আমার গা ছেড়ে দিয়ে বললাম, খা খা, তোর মন যা চায় তাই কর।

তোর নাম কি রে? কি বলে তোকে ডাকব?

সে বিকট স্বরে গর্জে উঠল—আমি কৈবর্ত।

পাশেই জন কয়েক পুরুষ আর মেয়ে একটা মাটির ঘর তুলছিল। ভলকু বুড়োর গল্পের গন্ধ পেয়ে ওরা হাতের কাজ ফেলে রেখে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভলকু বুড়োর গলায় যে এত জোর তা কে জানত! সে বাঘের মত গর্জন করে উঠল--আমি কৈবর্ত। আর এমন বিচিত্র তার বলবার ভংগি যে ছোট বড় সবার মধ্যেই কেমন একটা উত্তেজনার শিহরণ খেলা করে গেল।

ভলকু বুড়ো একটু থেমে আবার বলে চলল, কট্টালি বললেন, সে কি গর্জন। সংগে সংগে আমার ঘুম ভেংগে গেল। চোখ মেলে

চেয়ে দেখি সেই কুচকুচে কালো, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল সেই দুর্দান্ত ছেলেটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু আমার বুকটা তখনও টনটন করছে।

পশুপাখীদের মধ্যে পেঁচার মত বিজ্ঞ আর কেউ নেই। সে বার কয়েক চোখের পাতা খুলল আর বুজল, শেষে মৃদু কণ্ঠে বলল, মা জননী, শান্ত হও। অমন উতলা হয়ে লাভ নেই, সব স্বপ্ন সত্য নয়, তোমার ছেলে তোমাকে কামড়ে খাবে, এটা কি একটা কথা! পরিষ্কার মনে হচ্ছে, এ কোন অপদেবতার মায়া।

না না, মিথ্যা নয়, এই দেখ না তোমরা।

সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাই তো, মাইয়ের উপর আঁচড়ের রেখা, আর বোঁটার কাছেই পরিষ্কার দাঁতের দাগ। একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল, এরপর আর কারও বলার মত কোন কথা রইল না। পেঁচা নিরুত্তরে চোখ বুজল।

কট্টলি দেবতাদের উদ্দেশ করে বললেন, ওগো দেবতারা, আমার স্বপ্ন পূর্ণ হোক। সে আসুক, আসুক। এসে আমাকে কুড়ে কুড়ে ছিঁড়ে ছিড়ে খাক, তবু সে আসুক। সে না এলে যে সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাবে।

আকাশের দেবতারা উত্তর দিলেন, তাই হোক, তাই হোক। বনের দেবতারা ডেকে বললেন, তাই হোক, তাই হোক। জলের দেবতারা সাড়া দিলেন, তাই হোক।

কট্টলির পা বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে নামতে লাগল। উঃ সে কি রক্ত। লাল টকটকে রক্ত।

কিসের রক্ত গো? একটা ছেলে আঁতকে উঠে বলল।

ভলকু বুড়ো গর্জে উঠল—চোপ্। সবাই চুপ চুপ বলে তাকে থামিয়ে দিল। দুটো সেয়ানা মেয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল। ওরা এক জন আর এক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে উঠল। বুড়ো ভলকু বলে চলল, রক্তের ধারা

নামছে, নামছে, পা বেয়ে গড়িয়ে মাটিতে নামছে। শেষে মাটিতে নামছে। শেষে মাটিতে স্রোত হয়ে বয়ে চলল। সেই স্রোত নদী হয়ে নামল। সেই নদীই তো লালনদী, আমাদের এই লালনদী।

সেই নদীই লালনদী? বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন উঠল।

দেখেছিস্ তো, তার জল এখনও কেমন লাল।

দেখেছি দেখেছি, সমস্বরে বলে উঠল অনেকে।

সেই নদীর জলে নাইলে বাঁজা মেয়ের ছেলেপিলে হয়। তাই তো আমাদের কৈবর্তদের মধ্যে ছেলে মেয়ের এমন বাড় বাড়ন্ত। পৃথিবীশুদ্ধু মানুষ এ কথা জানে। ছেলেমেয়ে পাওয়ার আশা করে দেশ বিদেশের মেয়েরা এই নদীতে আসে নাইতে, আর যাবার সময় ঘড়ায় ঘড়ায় জল নিয়ে যায়।

মেয়ে দুটোর খোঁপায় গোঁজা লাল টকটকে ফুল। বুঝি কট্টলির রক্তের মতই লাল। গল্পটা চলতে চলতে হঠাৎ লালনদীর দিকে ভেসে যাচ্ছে দেখে ছেলেদের একজন বলে উঠল, তারপর কি হোল গো। কট্টলি কি করল সেই কথাটা বল না।

বুড়ো ভলকু বাধা পেয়ে চোপ্ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়ে দুটোর খোঁপায় গোঁজা সেই গাঢ় রক্তবর্ণ ফুলগুলির দিকে চোখ পড়তেই থমকে গিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেষে বলে চলল, দেবতারা ডেকে বললেন, ফুল যখন ফুটেছে, ফল হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এবার তোমার স্বপ্ন সফল হবে। সূর্যের মন্ত্র পড়। তাতেই আশা মিটবে।

কট্টলি বললেন, ওগো দেবতারা, তোমরা আমার সহায় থেকো। তারপর কট্টলি কি করলেন?

কট্টলি আদ্যি কালের যাদুকরী। তার ছেলেমেয়েরা জন্মায়, বড় হয়, বুড়ো হয়, মরে যায়। কিন্তু কট্টলির যৌবন অক্ষয়, অমর। মুহূর্তে মুহূর্তে তার রং বদলায়, রূপ বদলায়, বার বার নতুন হয়ে ফিরে আসে।

উঠে দাঁড়ালেন কট্টলি। সেই লাল রক্ত মাটির উপর চন্দনের মত জমে আছে। তাই দিয়ে বড় করে এক ফোঁটা পরলেন কপালে। তারপর সূর্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। মন্ত্রসিদ্ধা কট্টলি, কত মন্ত্রই না তাঁর জানা আছে। আর সে মন্ত্রের শক্তি বজ্রের মত, কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। প্রথমে শুধু ঠোঁট দুটি নড়ছিল, তারপর মৃদু গুনগুনানি, ক্রমে স্বর উঁচুতে উঠতে লাগল। তারপর এক অঞ্জলি ধুলো ছুঁড়ে মারলেন সূর্যের দিকে। এক অঞ্জলিতে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। এবার দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কট্টলি। পাথরের মত স্থির। শুধু ঠোঁট দুটি নড়ছে।

এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল। তার পরে সূর্যের প্রচণ্ড তেজ একটু একটু করে নরম হয়ে আসতে লাগল। সবাই বুঝল, এবার কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কি যে ঘটবে, সে কথা কেউ জানে না। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আকাশ জুড়ে মেঘের গর্জনের মত ভীষণ গর্জন উঠল। কিন্তু কোথায় মেঘ! পরিষ্কার আকাশ, মেঘের চিহ্নটুকুও নেই। তারপর সবাই দেখতে পেল শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ করে প্রচণ্ড শব্দে উপর থেকে বিরাট কি একটা নেমে আসছে। এ কি ঝড়? কিন্তু ঝড় কি কখনও সোজা উপর থেকে এমন করে নেমে আসে? আর ঝড়ের কি কোন আকার থাকে? এ যে বিরাট একটা পাখীর মত। কিন্তু এত বড় পাখী কেউ কখনও দেখেনি। তার ডানার আড়ালে সূর্য যেন ঢাকা পড়ে গেছে। পাখী নয়তো যেন দৈত্য। হায় হায়, কি সর্বনাশা মন্ত্র পড়ল কট্টলি। এবার আর কারও রক্ষা নেই। ভয়ে দিশাহারা হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটল। যে পারল গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পশু পাখী, সাপ খোপ, পোকা মাকড় কেউ রইল না। শুধু একা দাঁড়িয়ে রইলেন কট্টলি। আকাশটাকে ভেংগে চুরে নেমে আসছে পাখী। তার বিরাট ডানার ঝাপটায় গাছ পালা পাগলের

মত মাথা কুটে মরছে। কিন্তু কট্টলির বুকে এতটুকু কাঁপন নাই। তেমনি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, তার ঠোঁট দুটি হাসছে।

কট্টলির মুখে আর মন্ত্র নেই। ঠোঁট আর নড়ছে না। দিশাহারা হয়ে গেল পাখী। তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটি এদিকে ওদিকে দিক দিগন্তে খুঁজে বেড়াতে লাগল, কে কেমন করে তাকে টেনে নিয়ে এল! কে তার রক্তকে এমন করে পাগল করে তুলল।

কোথায় কোথায় আছে সে! খুঁজে না পেয়ে সে তীক্ষ্ণ কঠিন সুরে ডেকে উঠল-ক্কাহা-ক্কাহা-ক্কাহা! সে ডাক শুনে সৃষ্টিশুদ্ধ কেঁপে উঠল। কিন্তু কট্টলি ভয় পাবেন কেন? তিনিই তো ডেকে এনেছেন তাঁকে। নাচের ভংগীতে এগিয়ে এসে দুহাত নেড়ে সংকেত জানালেন।

যেই না দেখা, অমনি তাঁকে লক্ষ্য করে তীরের মত বেগে নেমে এল পাখী। বিরাট দুই ডানা দিয়ে জাপটে ধরবে কট্টলিকে। কিন্তু যাদুকরী কট্টলি এত সহজে ধরা দিলেন না। তিনি পক্ষিণীর রূপ ধরে তাকে পাশ কাটিয়ে শোঁ করে সোজা উপরে উঠে গেলেন। পাখী শূন্যে শূন্যে-মহাশূন্যে উড়ে চললেন। পাখী তার পিছন পিছন তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। কিন্তু কট্টলি ধরা দিয়েও ধরা দেন না, ছোঁয়া দিয়ে পালিয়ে যান। যে খেলার যেই নিয়ম। এই ভাবে সারা আকাশটাকে সাত সাতবার ঘুরে এলেন তারা। অবশেষে কট্টলি ধরা দিলেন।

সময় হলে কট্টলি দুটি ডিম পারলেন। সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে এল পাখীর বাচ্চা নয়, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তাদের নাম ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, হাম্‌মা আর হাম্‌মি। ভলকু খুশী হয়ে বলল, ঠিক ঠিক। হাম্‌মা আর হাম্‌মি—এরাই প্রথম কৈবর্ত। আমরা তাদেরই বংশধর। শাখায় শাখায় ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছি। আমরা কৈবর্তেরা যে যেখানে থাকি না কেন সবাই

সূর্য আর কট্টলির সন্তান। হ্যাঁ, সূর্যের সন্তান আমরা, সহজ কথা নয়। সংসারে আমাদের চেয়ে বড় কে আছে।

এক জন প্রশ্ন করল, তবে যে ব্রাহ্মণেরা বলে—

দূর দূর, রেখে দে ওদের কথা। ওদের মত মিথ্যাবাদী আর কেউ আছে নাকি? যে যাই বলুক, তাদের কথায় কান পাতবিনে। পৃথিবীর সেরা জাত এই কৈবর্ত, তার চেয়ে বড় কেউ নেই। তার চেয়ে বড় কেউ কান দিন ছিল না, হবেও না।

একটা জোয়ান ছেলে চটপট দাঁড়িয়ে বলল, তা তো নেই বুঝলাম, কিন্তু আমরা যদি এতই বড়, তবে আমাদের এত দুর্গতি কেন। আমরা তো উঠতে বসতে ওদের লাথি খেয়ে মরছি। তবু আমরা সবার সেরা?

আর এক জন বৃদ্ধ ভলকুর পক্ষ হয়ে বলল, হ্যাঁ, সেরা বই কি, নিশ্চয় সেরা। তবে সময় অসময় সবারই আছে। অসময় পড়েছে বলে মাথা নুয়ে আছি, আবার সুসময় এলে ভাগ্য ফিরে যেতে কতক্ষণ?

কবে সেই সুসময় ফিরে আসবে?

আসবে, আসবে একদিন, আসতেই হবে তাকে। এত অস্থির হলে চলে কখনও? ধৈর্য ধর্, ধৈর্য ধর্! ভলকু বুঝিয়ে তাকে শান্ত করতে চাইল।

কিন্তু সে ছেলে শান্ত হবার নয়। তার অশান্ত দৃষ্টিতে তারই ইংগিত ফুটে উঠেছে।

কবে, আর কবে আসবে সে দিন! এদিকে আমরা যে শেষ হয়ে গেলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছে, শেষ হয়ে গেলাম আমরা, অনেক-গুলো কণ্ঠের মিলিত শব্দ শোনা গেল। গল্পের মায়া যেন ছিঁড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

ভলকু এদিকে তাকাল, ওদিকে তাকাল, কেমন যেন থ' খেয়ে গেল।

তার মুখে আর কোন কথা ফুটল না। অসহায় আর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভলকু।

বুড়ো ভলকুকে কোন দিন এমন অবস্থায় পড়তে হয় নি। তার গল্পের নেশা বিষম নেশা, মানুষকে একেবারে বুঁদ করে ফেলে। কিন্তু আজ কাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কোন এক অতীত দিনের যাদুমাখানো এই রোমাঞ্চকর কাহিনী! একদিন তা শ্রোতাদের মনে সম্মোহের সৃষ্টি করে তুলত। এখন তা যেন তার স্বাদ গন্ধ হারিয়ে ফেলছে। এ যুগের মানুষের কাছে এ সব গল্প যেন আর বিকাতে চাইছে না।

হেমন্তের আতপ্ত রৌদ্রে গা এলিয়ে দিয়ে সুখশয্যায় শুয়ে আছে বরেন্দ্রী। শুয়ে শুয়ে মধুর আলস্য উপভোগ করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা দমকা হাওয়া আসে সেই হাওয়ার ঝাপটায় গেরুয়া রংয়ের ধুলো ওড়ে আকাশে, ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে—গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, সবুজ ঘাসের ডগায় ডগায়, ঘরে দুয়ারে, মানুষের পরণের কাপড়ে, মাথায়, চুলে—কেউ অব্যাহতি পায় না। বরেন্দ্রীর এই রংয়ের খেলায় সবাই অভ্যস্ত, কেউ কিছু মনে করে না। এই লাল মাটির অনেক গুণ সেকথা কে না জানে!

এই লাল মাটিতে যে ফসল ফলে তার তুলনা নেই। এই লাল মাটির দেশের মেয়েরা এখানকার জমির ফসলের মতই অপর্যাপ্ত পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে চলে। লোকে বলে, সেও নাকি এই মাটিরই জন্য। মাটি আর মেয়ে এই দুয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এই দুয়ে মিলে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বরেন্দ্রীর উপর দিয়ে একটা দীর্ঘ পথ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। এ পথ গৌড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। মানুষ অবাক হয়ে এই সুদৃশ্য বাঁধানো রাজপথের দিকে তাকায়, আর বলে, আশ্চর্য মানুষের ক্ষমতা। কত কাল ধরে কত মানুষ খেটে খেটে এই পথ তৈরী করেছে! গৌড়ের লোকেরা আর যা-ই করুক, এর জন্য তাদের প্রশংসা করতেই হবে। তাদের জন্যই আমরা এমন সুখে চলাচল করতে পারছি। কত সহজে মাল পত্রের আনা নেয়া চলছে। সবাই কিন্তু এ কথা বলে না। এমন লোকও আছে যারা বলে এই রাজপথ বরেন্দ্রীর অভিশাপ। এই পথ দিয়েই তাদের দেশের সোনার ফসল দেশের বাইরে চলে যায়, নিজেদের

ফসল পরকে দিয়ে তারা না খেয়ে মরে। এই পথ দিয়েই গৌড়ের সৈন্যেরা যখন তখন এসে তাদের উপর লুটে পুটে খায়, আর নানা ভাবে অত্যাচার করে।

নতুন ধানের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। পথ দিয়ে ধানে বোঝাই মোষের গাড়ীগুলি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চলেছে। মোষের গলার ঘুন্টি বাজছে ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং।

এই একটানা শব্দ শুনতে শুনতে কেমন যেন নেশা ধরে যায়, ঝিমুনি আসতে চায়। সারাদিন এমনি চলেছে—গাড়ীর পর গাড়ী কত যে গাড়ী তার যেন শেষ নেই।

কিছুক্ষণ বাদে বাদেই এক একটা বহর এগিয়ে আসে। তার মধ্যে কোন কোনটা এতই বড় যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই।

পথের ধারে ধানের ক্ষেতে ধান কাটছিল ক' জন চাষী। বাচ্চা, জোয়ান, বুড়ো সব বয়সের লোকই আছে। দশ বারো বছরের একটা ছেলে হাতের কাজ বন্ধ রেখে চলমান গাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে ঠোঁট নাড়ছিল। সর্বশেষ গাড়ীটা যখন চলে গেল, তখন সে বলে উঠল, বাপরে বাপ, এক কুড়ি তিনটা।

এক জন বয়স্ক চাষী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি রে, লাখু, নিজের মনে মনে কি বকছিস ?

এক কুড়ি তিনটা গাড়ী মামা। গুণে গুণে দেখলাম। ঠিক এক কুড়ি তিনটা, একটাও কম নয়!

লোকটি হেসে উঠল, বা রে বা, তুই হাতের কাজ ফেলে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কর্মই করছিস নাকি ? কেন, ধানের গাড়ী আর কোন দিন দেখিস্‌নি, এই প্রথম দেখলি ? ছেলেটা সেই কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, এত গাড়ী কোথায় যায় মামা ? কোথাও কোন উচ্ছব আছে নাকি ?

কিসের উচ্ছব ? উচ্ছব আর আমোদ আহ্লাদ বলতে কিছু

আছে নাকি এ দেশে ? সে যখন ছিল, তখন ছিল। পেটে ভাত না পড়লে আর মনে সুখ না থাকলে কিসের আবার উচ্ছব ? এ সব ধান চালান যাচ্ছে গৌড়ে।

ও বাবা, গৌড়ে! ছেলেটা কপালে চোখ তুলে বলল, এত ধান দিয়ে ওরা কি করবে মামা ?

এত ধান কি রে? এ তো মোটে এক কুড়ি তিনটা গাড়ী। সে আর ক'টা ধান! এ ভাবে শ'য়ে শ'য়ে ধান বোঝাই গাড়ী গৌড়ে চলে যায়।

শ'য়ে শ'য়ে গাড়ী! ও বাবা! এত ধান নিয়ে ওরা কি করে মামা ? ওদের দেশে ধান হয় না বুঝি ?

হয়, হয়, হবে না কেন ? কিন্তু তাতে ওদের পেট ভরে না।

এত বড় পেট, বল কি মামা ?

ওর কথা শুনে কাছাকাছি যারা ছিল, তারা সবাই হেসে উঠল। এক জন বলে উঠল, ঠিকই বলেছিস্ রে, হয় তো ওদের সর্বাংগই পেট, তা না হলে নিচ্ছে তো নিচ্ছেই, এত নিয়েও ওদের খিদে মিটছে না কেন ?

ওরা যদি এ ভাবে সব ধান নিয়ে যেতে থাকে, তবে আমরা খাব কি ?

ঠিক বলেছিস্। এ কথা তো সবাই বলছে। কিন্তু শোনে কে ? কয়েকজন একসংগে বলে উঠল।

আলোচনাটা এবার লাখুকে বাদ দিয়েই চলল। এক জন বলল, মাত্র তিন বছর আগে এত বড় একটা আকাল গেল, কত লোক না খেয়ে মরল। ধান্যঠাকুর দিতে আর আমাদের কম দেন না, কিন্তু আমরা যদি ধরে রাখতে না পারি, তিনি কি করবেন ? আমাদের ধান যদি আমাদের হাতে থাকত, তবে আমাদের ভাবনা ছিল কি।

মিথ্যে বলনি, লাখুর মামা সমর্থন করে বলল, যায় কি আর এক ভাবে, নানা ভাবেই যায়! কোনটা সামনা দরজা দিয়ে, কোনটা বা

পিছন দরজা দিয়ে। প্রথমেই দেখ না, ফসল উঠতে না উঠতেই হাত বাড়িয়ে দেবে রাজা। রাজার হাত বিশাল হাত, সে কি অল্পে স্বল্পে ভরে। ফসলের ছ-ভাগের এক ভাগ, তার এক মুঠো কম দিলে চলবে না।

রাজা এত ধন দিয়ে কি করে মামা? লাখু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

ধান দিয়ে কি করবে আবার, খায়। মামা হেসে উত্তর দিল।

ও বাবা, রাক্ষস নাকি! এত ধান খায়!

রাক্ষসই তো। এত খেয়ে খেয়েও তার সাধ মেটেনা। শুনছি আরও নাকি কর বাড়াবার মতলব আছে।

পাশাপাশি ধান কাটছিল যারা, এই আলোচনায় কেউ উদাসীন থাকতে পারল না। সবাই যে যার বক্তব্য বলে চলল।

তা তো করবেই, একজন মন্তব্য করল. রক্তের স্বাদ যখন পেয়েছে একবার, তখন কি আর সহজে ছাড়বে মনে করেছ। এত দিন ওরা সবাই মিলে চুষে চুষে খেয়েছে, এখন শুধু হাড়গোড়গুলি বাকি আছে, দুদিন বাদে তাও চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে!

এক বুড়ো চাষী বলল, জমির আবার কর কি? এ নিয়ম কোন কালে ছিল না। চাষী আর জমি কি আলাদা? এই মাটির স্বত্ব নিয়েই আমরা জন্মাই। আজ জমির উপর কর নিচ্ছে, দু দিন বাদে আমাদের ঘর বাড়ী, গরু ছাগল আর আমাদের বউ ছেলে মেয়ের উপরেও হয়তো কর বস'বে। এতো নিয়ম নয়, এ হচ্ছে জুলুম, সোজা জুলুম।

তোমরা মোড়লরা এ নিয়ে রাজার কাছে জানাও না কেন?

মোড়লরা? হাসালে তুমি, মোড়লদের কথা শুনছে কে! এ নিয়ে আগের দিনে কত মারামারি কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমরা কি আর সহজে মেনে নিয়েছিলাম। এ কালে মিথ্যা রাজত্ব রে ভাই, সত্য বিদায় নিয়েছে। এখন যার গায়ে জোর বেশী তার কথাই

কথা। রাজপুরুষরা বলে রাজা যখন আছে করও তখন থাকবেই। রাজা আছে, কর নেই, এ কখনো হয় না।

লাখু মন দিয়ে এসব কথা বার্তা শুনছিল। সে আর চুপ করে থাকতে পারলনা, ফস্ করে বলে উঠল, তবে না-ই বা থাকল রাজা। কি দরকার আমাদের রাজা দিয়ে?

লাখুর সমর্থকের অভাব ছিল না। তারা বলল, বাচ্চা মানুষ হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে লাখুর, সত্যি কথাই বলেছে—কি দরকার আমাদের রাজা দিয়ে?

লাখুর মামা হেসে বলল, আমাদের হয়তো দরকার নেই, কিন্তু রাজার দরকার আছে আমাদের দিয়ে। তাই রাজার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বড় কঠিন। কিন্তু রাজার করই তো একমাত্র কথা নয়। গৌড়ের বণিকদের জন্যই আমাদের দেশের এত ধান বাইরে চলে যায়, আর আমরা না খেয়ে মরি। ওদের হাতে অর্থের অভাব নেই। ফসল উঠবার আগেই ওরা চাষীদের কাছ থেকে ক্ষেতের ধান কিনে রাখে। তারপর ফসল ওঠার সংগে সংগেই সব ধান চালান দেয় গৌড়ে। ধানে বোঝাই যে মোষের গাড়ীগুলো গেল, সব তো ওরাই পাঠাচ্ছে। এ তুমি কেমন করে আটকাবে? এ নিয়ে যদি কিছু বল, ওরা সাফ উত্তর দিয়ে দেবে, আমরা তো আর জোর করে কারও কাছ থেকে ফসল কিনছি না। তোমাদের জিনিস, তোমরা ইচ্ছা হয় দেবে না হয় না দেবে।

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে, সবাই ভাবিত হয়ে পড়ল। এক জন বলল, কিন্তু আমরাই বা কেন ওদের কাছে বিক্রী করতে যাই? দেশের ধান দেশে থাকলে সবার পক্ষেই তো ভাল।

লাখুর মামা একটু ভেবে উত্তর দিল, মানলাম তোমার কথা। এ কথা তুমিও বুঝলে, আমিও বুঝলাম, সবাই তো বুঝবে না।

কেন বুঝবে না? নিজের ভাল মন্দ সবাই বোঝে।

সবাই বোঝে? উহুঁ, বোঝে আবার বোঝেও না। আমাদের এ

অঞ্চলে ওরা ধান কিনতে আসছে না এখনও, তাই সহজেই কথাটা বলে দিলে, কিন্তু আসলে কথাটা এত সহজ নয়। এখানে সে সময় ধানের যে দর, ওরা তখন তার চেয়ে কিছু বেশী দর দিয়ে কিনে নেয় গরীব চাষী ওদের কাছে ধান বিক্রী করবার দিকে ঝুঁকে পড়বে না? তাছাড়া আরও সুবিধা আছে এতে। ওরা চাষীদের সমস্ত ধান এক সংগে কিনে নেয়। তার ফলে ধান বিক্রী করবার জন্য তাদের হাটে হাটে ঘুরে মরতে হয় না, ঘরে বসেই যে যার পাওনা পেয়ে যায়।

প্রশ্নটা খুবই জটিল। প্রস্তাবকারী এর উত্তরে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল।

একজন প্রশ্ন করল, কিন্তু বেশী দর দিয়ে ধান কিনে ওদের লোকসান পোয়াতে হয় না?

লোকসান? হ্যাঁ, এত কাঁচা ছেলে কিনা ওরা? গৌড়ে ধানের দর সব সময়ই তার চেয়ে অনেক উপরে থাকে যে।

কিন্তু এখান থেকে এত দূরে ধান বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচা তো বড় কম নয়, সেটাও তো দেখতে হবে।

কিছু না, কিছু না। ওরা ও সব কথা আমাদের শোনায় বটে, কিন্তু ওদের লাভের অংক বিরাট। সে তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। আমাদের এই ধান নিয়ে ব্যবসা করে ওরা এক এক জন ফুলে হাতী হয়ে উঠেছে। দেখ না ওদের চেহারা?

এবার আর এক জন আর এক কথা তুলল। বলল, ঠিকই বলেছে মোড়ল, এই বণিকদের নিয়ে বহু ভোগান্তি আছে আমাদের। ওরা পংগপালের মত দল বেঁধে আমাদের ক্ষেতে এসে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের উচ্ছন্ন না করে ছাড়বে না। আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে দেখে এলাম এক আশ্চর্য ব্যাপার। একেবারে অভাব্য কাণ্ড!

কি অভাব্য কাণ্ড! সবাই কৌতূহলী হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

বণিকের নাম চন্দ্রধর। বিরাট ধনী। ও অঞ্চলে সবাই তাকে

চেনে। মোড়লদের ডাকিয়ে এনে সে এক দিন প্রশ্ন করল, তোমাদের এখানে ধানের দর কত গো? ওরা বলল, এত। চন্দ্রধর বলল, বেশ, তোমাদের এই গ্রামের সমস্ত চাষীর ধান আমি ঐ দরেই কিনে নেব। বল, তোমরা তোমাদের সব ধান দিতে রাজী আছ কি না।

তার কথা শুনে চাষীরা হেসে উঠল, এ সময় ধান কোথায় গো? আমরা তো এখনও মাটিতে লাংগলই ছোঁয়াইনি মোটে। আগে ফসল উঠুক, তবে তো। ধানু ঠাবুরের আশীর্বাদ ছাড়া ধান হয় না কখনও। তার উপরে পোক আছে, রোখ্ আছে, দেও-দেবতার দিষ্টি আছে, এত সব বাধাবিঘ্নি পেরিয়ে তবে তো। ধানটা গোলায় উঠতে দাও আগে, এ সব কথাবার্তা তার পরে হবে।

চন্দ্রধর বলল, আহা, আগেই হোক, আর পরেই হোক, ধান তো উঠবেই।

ওরা বলল, উঠুক, উঠুক, উঠুক। কিন্তু না ওঠা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। সেবার সেই ঝড়ের বছরের পরের বছর পোকা লেগে সারা গ্রামের ধান যেন পুড়ে ঝুরঝুরে হয়ে গেল। এক দানা ধানও কেউ ঘরে তুলতে পারে নি।

চন্দ্রধর দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, ভগবান না করুন, কিন্তু তেমন অজন্মাই যদি হয় তবে তোমরা কোত্থেকে ধান দেবে, আর আমিই বা কেমন করে চাইব? আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, ধান যা উঠবে, সবটাই আমাকে দিতে হবে। আমি এক জায়গায় বসে কাজ করতে ভালবাসি। 'ধান' 'ধান' করে এখানে ওখানে ঘুরে মরতে ভাল লাগে না আমার।

কিন্তু তাই বলে এত আগে কেন? ওরা আবার সেই প্রশ্ন করল।

চন্দ্রধর উত্তর দিল, তোমরা গরীব মানুষ, চাষের সময় অর্থের প্রয়োজন হয় না তোমাদের?

হয় বই কি, সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, কিন্তু সে কথা কেন?

তোমরা যদি আমার প্রস্তাবে রাজী থাক, আমি তোমাদের জমির পরিমাণ অনুসারে কিছু কিছু আগাম অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি।

এমন আশ্চর্য কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। জিনিস দেবার আগেই জিনিসের দাম! একজন মোড়লের মনে খটকা লাগল, সে জিজ্ঞাসা করল, কেন গো, ধান পাওয়ার আগেই তুমি দাম দিতে যাবে কেন? কোন দেশে কোন কালে এই নিয়ম নেই।

চন্দ্রধর হেসে বলল, না, এ নিয়ম অনেক জায়গাতেই আছে। তোমরা তো নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাওনা, তাই এ সমস্ত খবর রাখ না। আমি তোমাদের আগাম দিতে চাইছি কেন? শোন তবে বলছি। আমি কোন নতুন মানুষ নই, তোমাদের এখানে বহু দিন থেকেই আছি। তোমাদের কোন খবর জানতে বাকি নেই আমার। তোমরা চাষীরা খুবই গরীব। অনেকেরই নিয়ম মত দুবেলা খাওয়া জোটে না, কেমন ঠিক বলছি কিনা?

ওরা বলল, ঠিক বই কি। দুবেলা পেট পুরে খাওয়া, সে আর ক'জনের জোটে!

এই চাষবাসের সময় সকলেরই হাতে যদি কিছু কিছু সম্বল থাকে, তবে তাতে কি কাজের সুবিধা হয় না? না খেয়ে কেউ কি আর ভাল করে কাজ করতে পারে?

তা কি আর পারে! তা ছাড়া চাষের কাজে এভাবে ওভাবে অনেক খরচ আছে। কিন্তু এই সম্বল আমরা পাচ্ছি কোথায়? সারা বছর টেনে টুনে খাওয়া পরা চলে মাত্র, কিছু তো আর বাঁচে না।

সেই জন্যই তো আমি তোমাদের কিছু কিছু আগাম দিতে চাইছি।

কিন্তু কেন, তুমি দেবে কেন? মোড়ল আবারও সেই প্রশ্ন করল।

কেন দেব না? দাম তো আমাকে দিতেই হবে, না হয় কিছু দিন আগেই দিলাম। এ আমার গায়ে লাগবে না। তোমরা যদি ভাল ভাবে খাটতে পার, বেশী ফসল হবে। আর ফসল যদি বেশী হয় তাতে তোমাদেরও লাভ, আমারও লাভ। এবার বুঝতে পারছ তো?

মোড়ল ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, পারছি। কিন্তু কথাটা আমরা ভেবে দেখি আগে, তারপর তোমাদের বলব।

এই কথা বলে সেদিনকার মত বিদায় নিল তারা।

খবরটা শুনে গ্রামের চাষীরা মহাখুশী। অভাব কার সংসারে নেই? তা ছাড়া চাষের সময়টা, সারা বছরের মোক্ষম সময়, এ সময় কিছু হাতে থাকলে কত সুবিধা। এ সুযোগ কেউ কোন দিন তাদের দেয় নি। এমন সুযোগ কে ছাড়ে। তারা বলল, বেঁচে থাক চন্দ্রধর, তার ব্যবসার উন্নতি হোক।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছিল, এত ভাল, ভাল নয়। ওর কি যেন একটা মতলব আছে।

কিন্তু তাদের কথা আমল পেল না।

কথবার্তা পাকা হয়ে গেল। প্রথম খন্দটা ভালোয় ভালোয় কাটল। এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হয়নি কারও, বরঞ্চ লাভই হয়েছে। সবাই সে কথা স্বীকার করল। তার পরের বছর সময় মত বৃষ্টি না হওয়ার জন্য ফসল কিছু কম হল। ফলে ধানের দর গেল চড়ে। চন্দ্রধর মোড়লদের ডাকিয়ে এনে বলল, কই, তোমরা এখনও তোমাদের ধান দিয়ে যাচ্ছ না যে? শুনতে পেলাম তোমাদের কেউ কেউ কিছু দিন আগেই ধান কেটে ঘরে নিয়ে তুলেছ। এমন তো কথা ছিল না। কথা ছিল, তোমরা ধান কেটে আমার গোলায় এনে পেঁছে দিয়ে যাবে। আর আমিও তোমাদের সামনে সেই ধান মাপ করে গত বছরের দরে তোমাদের দাম দিয়ে দেব। কিন্তু এবার দেরী করছ কেন তোমরা?

কথা শুনে ওরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, সে কি গো, তোমার সংগে ব্যবস্থা হয়েছিল গত বছরের জন্য, এবার তার কি? এবার চাষের আগে তুমি ছিলেই না এখানে। দেখাও হয় নি তোমার সংগে, কথাবার্তা তো দূরের কথা। আর এবার ধানের দর গতবারের চেয়ে বেশী। সে দরে আমরা কেন ছাড়ব?

চন্দ্রধর চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলল, কি, আমার সংগে ফাঁকি! শুধু গত বছরের নয়, তোমাদের সংগে পাঁচ বছরের মত কথা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা মত ঐ দরে পাঁচ বছরের জন্য আমার কাছে ধান বিক্রি করতেই হবে তোমাদের।

মোড়লরাও ক্ষেপে উঠে বলল, তুমি বলছ কি এ সব? পাঁচ বছরের কথা কখনোই হয় নি। আমরা এবার আগাম নিয়েছি তোমার কাছে?

চন্দ্রধর উত্তর দিল, আগাম সম্পর্কে সে রকম কোন কথাই ছিল না। গত বছর তোমাদের দুরবস্থা দেখে দয়া করে কিছু কিছু আগাম দিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন কোন শর্ত তোমাদের সংগে ছিল না।

এই নিয়ে দু পক্ষে বিষম ঝগড়া বেঁধে গেল। শেষকালে রাজপুরুষেরা এল ব্যাপারটার বিচার করতে। চন্দ্রধরই তাদের খবর দিয়ে আনিয়েছিল।

কোন্ বছরের কথা বলছ? শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল।

কোন্ বছর আবার কি, এই তো সে দিনের কথা। আমি আমার বউকে আনতে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন সবই স্বচক্ষে দেখে এসেছি। বিচারের সময় আমি সামনে ছিলাম। ওরা এসে দু পক্ষের কথা শুনে বলল, তোমাদের কি মুখে মুখেই সব কথা, লেখাপড়া কিছু নেই?

চন্দ্রধর বলল, অবশ্যই আছে। অত কাঁচা কাজ আমি করি না।

দু পক্ষ যার যার পত্র নিয়ে এল। দুটো পত্র পড়েই দেখা গেল, চন্দ্রধর যা বলেছে সেইটাই ঠিক।

ব্যবস্থাটা পাঁচ বছরের জন্যই করা হয়েছিল, সেই কথাই লেখা আছে। তা ছাড়া আগাম দেয়া সম্পর্কে কোন কথাই তাতে ছিলনা।

ওরা সেই পত্র সবাইকে শুনিয়ে বলল, কি হে, তোমাদের দুটো পত্রেই তো পাঁচ বছরের কথা লেখা আছে, তবে তোমরা এখন তা মানতে চাইছনা কেন ? এ সব দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়। যে নিয়মে আবদ্ধ হয়েছ, সেই নিয়ম মত কাজ কর, তা নইলে তোমাদের কপালে দুঃখ আছে বলে দিচ্ছি। একা বিদেশী মানুষকে পেয়ে সবাই জোট পাকিয়ে তার পিছনে লেগেছ, এতই সাহস তোমাদের ! সেই জন্যই বলছি, বণিকের যা ন্যায্য প্রাপ্য, সেটা তাকে ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও। নইলে এ কথা যদি উপরে যায়, তবে তার ফল খারাপ হবে—খুব খারাপ হবে।

চাষীরা অবস্থাটা বেগতিক দেখে মোড়লদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, কি গো, এরা এ সব বলছে কি ? মোড়লেরা, প্রথম-টায় একেবারে থ' খেয়ে গিয়েছিল। শেষে তিন মোড়ল একই সংগে চেঁচিয়ে উঠল, সব মিছে কথা, মিছে কথা বলছে বণিক।

চন্দ্রধর বলল, কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা, সে তো পত্র থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, এ সব চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাটি আমি পছন্দ করি না।

রাজপুরুষদের মধ্যে বড় কর্তা যে, সে পত্রটা মোড়লদের নাকের ডগায় ধরে বলল, এই যে পত্রের নীচে তোমাদের তিন মোড়লের নাম লেখা আছে। এ নাম কি তোমরা নিজের হাতে লেখনি ?

ওরা বলল, হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই লিখেছি। যা সত্য কথা তা বলব না কেন ?

তবে ?

কিন্তু বণিক যে এ সব কথা এমন করে লিখবে তা আমরা কেমন করে বুঝব।

কেন, নামটা লিখবার আগে পত্রটা পড়েও দেখনি একবার ?

ওরা বলল, না, পড়ে দেখিনি আমরা। মুখে যেটা স্থির হয়, সেটাই পত্রে লিখতে হয়, এটাই নিয়ম বলে আমরা জানি। কিন্তু মুখের কথাকে যে লেখার সময় কেউ এমন ভাবে উলটে দিতে পারে, এ কথা কেমন করে ভাবব আমরা ?

রাজপুরুষদের বড় কর্তা গরম হয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন, তোমরা কি বোকা বোঝাতে চাইছ আমাদের। তোমরা কাঁচা ছেলে, কিছু বোঝ না। ও সব শয়তানী আমাদের কাছে খাটবে না। ভাল চাও তো বণিকের সংগে যেমন করে পার একটা মীমাংসা করে নাও। তা না হলে বাধ্য হয়ে আমাদের এ ব্যাপারে হাত দিতে হবে।

তখন শুধু ধান দিয়েই পার পাবে না, জমি নিয়েও টান পড়তে পারে। পরম ভট্টারক মহীপালদেবের রাজত্বে এ সমস্ত ধৃষ্টতা চলবে না।

ঘটনাটা বিবৃত করে বক্তা এবার একটু থামল। কৌতূহলী শ্রোতারা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল---তারপর ? তারপর ?

তারপর আর কি ? রাজপুরুষদের আদেশ অমান্য করবে কে ?

শেষকালে বণিকের কথাই টিকে গেল। মোড়লেরা অবশ্য সেই পত্র নিয়ে সামন্ত দিব্যোকের কাছে গিয়েছিল। তিনি সমস্ত কথা শুনে আর সেই পত্র দেখে বললেন, এখন আমি এর কি করতে পারি ? আজকালকার দিনে এমন কাঁচা কাজ করতে আছে।

মোড়লেরা বলল, দশের সভায় বসে যে কথাটা নিজের মুখে বলল, সে কথাটা যে কেমন করে উলটে দিতে পারে, এ আমরা কোন দিন দেখিনি, শুনিও নি। সেই জন্যই তো আমরা পত্রটা পড়ে দেখবার দরকার আছে বলে মনে করিনি। আর দশের কথার চেয়ে ওই পত্রটাই বড় হোল, এই বা কেমন কথা ?

এ কথার উপর সামন্ত দিব্যোক নাকি বলেছিল, ঠিকই বলেছ তোমরা। আমরা অসভ্য কৈবর্ত্য, গৌড়ের সভ্য লোকদের রীতিনীতি আমরা বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু বাঁচতে হলে আমাদেরও ওদের সংগে ওদের মতই ব্যবহার করতে হবে। এবারকার এ শিক্ষাটা ভুলে যেও না তোমরা।

লাখু অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি, এবার একটু ফাঁক পেয়ে বলে উঠল, কিন্তু ধান? ধানের কি হোল? সেই বণিক ব্যাটার হাতেই গিয়ে পড়ল নাকি?

কেমন করে বলব, আমি ত চলে এলাম। তবে বুঝলাম না দিয়ে উপায় নেই, দিতেই হবে। কিন্তু এসব নিয়ে মানুষ বড় গরম হয়ে আছে। যে কোন সময় একটা গোলমাল বেঁধে যেতে পারে।

পিছন থেকে একজন মন্তব্য করল, কিন্তু সামন্ত দিব্যোক কি এ ব্যাপারে হাত দিতে পারত না? দুটো ভাল কথা শুনিয়েই তার দায় সারল! তার তো রাজধানীতে যাওয়া আসা আছে। আবার শুনি রাজা নাকি তাকে খুব খাতিরও করেন।

আরে রাখো খাতির! খাতির তো নয়, এ হচ্ছে ওদের কার্য সিদ্ধির ফন্দি। ওরা এক দিকে আমাদের শুষে খাচ্ছে, আর এক দিকে নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমাদের সমাজের মাথা-গুলিকে কিনে নিচ্ছে। তা নইলে দিব্যোকের মত লোক কিনা—

ছি, ছি ছি দিব্যোক সম্পর্কে এ সব কি বলছ তোমরা? যা বলবার একটু বুঝে শুনে বোলো। দিব্যোকের বাবা মহোকের কথা মনে আছে তোমাদের?

পিছনের লোকটি বড় ঠ্যাটা স্বভাবের, যে কথাটা একবার ধরে বসে, তা ছাড়ানো কঠিন। সে উত্তর দিল, আমরা যে কথা বলি, বুঝে শুনেই বলি। দিব্যোকের বাবা মহোক, তাঁর কথা মনে থাকবে না? আমাদের জন্য সে যা করে গেছে, এমন কেউ করে না। তার ছেলে বলেই তো দিব্যোকের এত নাম।

কেন, দিব্যোক আমাদের সমাজের জন্য কোন কিছুই করেনি? মানুষ বড় বেশী তাড়াতাড়ি সব কথা ভুলে যায়।

লাখুর মামার এই কথার উত্তরে পিছনের সেই লোকটি সংগে সংগেই বলে উঠল, না কোন কথাই ভুলে যাইনি আমরা। যত দিন সমাজের জন্য ভাল কাজ করেছে, কে না প্রশংসা করেছে তার? কিন্তু রাজার প্রিয়পাত্র হবার পর থেকে সে কি এমন কাজটা করেছে, দেখাও আমাকে।

লাখুর মামা দিব্যোকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। সে বলল, এই এক কথা পেয়েছ তোমরা! কিন্তু এ সবই উড়ো কথা। উড়ো কথায় কান দিও না। বরেন্দ্রী আজ শত্রুর চরে ছেয়ে গেছে। আমার তো মনে হয়, এসব তাদের প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের যারা প্রধান, তাদের সম্পর্কে ওরা ওদের যা খুশী তাই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর আমরাও এমনি বোকা যে, যেখানে যা শুনি, সেটাই বিশ্বাস করে বসি।

কিন্তু এ সব কথা বলে আজকাল আর লোকের মুখ চাপা দিয়ে রাখা যায় না। লাখুর মামার পাশেই দাঁড়িয়ে যে লোকটি ধান কাটছিল সে খুবই ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, মুখ বুজে কাজ করে চলেছিল। সেও কিনা ফস্ করে বলে উঠল, বলি কি আর বড় সুখে মোড়ল, অনেক দুঃখেই এ সব কথা বলতে হয়। মহোকের ব্যাটা দিব্যোক তাকে আমরা আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি। রাজার কাছ থেকে মানমর্যাদা পেয়ে এখন আমাদের কথা, কি আর মনে আছে তার? বিপদে আপদে পড়ে অনেকেই তার কাছে গিয়েছে, কিন্তু কোন কাজ পেয়েছে কেউ? তার এক কথা; আমি কি করব, আমার কি কোন ক্ষমতা আছে? এ কেমন কথা! তুমি আমাদের সমাজের মাথা, তোমার কথায় সারা সমাজ ওঠে বসে, এ কি তোমার উপযুক্ত কথা! আসল কথা, সে আর এখন আমাদের লোক নয়, সে ওদের দলেই ভিড়েগেছে।

তার কথা সমর্থন করার লোকের অভাব ছিল না। একজন বলল, শুধু কি দিব্যোক, সমাজের মাথা বলতে যারা একে একে তাদের সবার রূপই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সবাই যে যার নিজের নিজের পোঁটলা ভরতে ব্যস্ত। সমাজের মানুষ বাঁচুক আর মরুক, তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

লাখুর মামা দিব্যোকের নিন্দা সহ্য করতে পারে না। তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে সে যেমন করে পারে একটু প্রতিবাদ করবেই। কিন্তু প্রতিবাদ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ওরা যে সব কথা বলে তা একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কিন্তু তা হলেও—তার মনের এই কিন্তুটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার মূল অনেক গভীরে প্রবেশ করে গেছে। দিব্যোকের কথাটা যখন একবার উঠে পড়েছে, তখন সহজে থামবে বলে মনে হয় না।

তাই বোধ হয় কথাটাকে চাপা দেবার জন্যই সে বলে উঠল, থাক থাক, এখন ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে কাজে হাত লাগাও ভাইরা। কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল।

পাঁচ

প্রথমে শোনা গিয়েছিল ডাকাতের দল। রাজপুরুষেরা সেই কথা বলত, দেশের লোকেও তাই জানত। আগেকার দিনে চুরি বা ডাকাতি কাকে বলে কৈবর্তেরা তা জানত না। এ তাদের জাতের ধর্ম নয়। চোর আর ডাকাত এ দুটো শব্দ তারা সর্ব প্রথমে গৌড়ের লোকদের মুখেই শুনেছে। প্রথম প্রথম তারা মনে করত বোধ হয় কোন বুনো জন্তু জানোয়ার হবে। মানুষ যে কখনও এ সব কাজ করতে পারে, এ কথা বুঝে উঠতে ওদের অনেক দিন সময় লেগেছিল। ওদের ছেলেপিলেরা এখনও তাই মনে করে—লম্বা লম্বা শিং, লম্বা লেজ, বাঘ সিংহের মত নরম নরম পায়ের থাবা, তাই নিঃসাড়ে চলফেরা করতে পারে, কোন সময় কোন দিক থেকে এসে পড়বে, এক মুহূর্ত আগেও তা বুঝবার উপায় নেই, চোর ডাকাত নিয়ে ছোটরা এই ধরনের নানা রকমের জল্পনা করে। আবার এক রকম চোর নাকি আছে, যারা জন্তু হলেও মন্ত্র পড়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে, শুধু বাচ্চাদেরই নয়, বড়দের পর্যন্ত।

কিন্তু কৈবর্তদের সে দিন আর নেই। গৌড়ের লোকদের সংস্পর্শে আসবার ফলে তাদের মধ্যেও সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়েছে। আগেকার চেয়ে অনেকেই বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে তারা, গৌড়ের লোকেরা এখন সে কথা স্বীকার করে। তেমন প্রয়োজন পড়লে দু চারটে মিথ্যে কথা বলার অভ্যাসটা ক্রমে ক্রমে রপ্ত হয়ে আসছে। অভাব বাড়বার সাথে সাথে ছোটখাটো চুরি-চামারীর কথাও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ডাকাত? না, এদেশে ডাকাত কখনোই ছিল না। বছর দুই হোল, এই উৎপাত দেখা দিয়েছে।

এ নিয়ে কৈবর্তদের মধ্যে চাঞ্চল্য, উত্তেজনা আর জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। বাচ্চারা ভয়ে সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোতে চায় না।

পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক বসে—প্রতিকারের উপায় কি? প্রথম থেকেই যদি একে ঠেকানো না যায়, তবে সমাজ বলতে কিছু আর থাকবে না। কিন্তু কে ঠেকাবে? কেমন করে ঠেকাবে? সমাজের কি আর সেই শক্তি আছে! কৈবর্তদের মধ্যে কিছু কিছু আধুনিক ছোকরা মাথা জাগিয়ে উঠেছে, যারা গৌড়ের সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। ওদের এই আছে, ওই আছে, বলে বলে ওরা আর শেষ করতে পারে না। প্রাচীনপন্থী বুড়োরা তাদের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বলে, নাও, তোমাদের মনের দুঃখ এবার মিটল। আমাদের সভ্য হতে আর বেশী বাকী নেই।

কিন্তু কিছু দিন বাদে দেখা গেল, ব্যাপারটার পিছনে যেন একটা রহস্য আছে। ডাকাতি শুরু হবার পর থেকে একটা জিনিস অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েছে। এ ডাকাতরা যেন ঠিক আর সব ডাকাতদের মত নয়। ওদের একটা বিশেষ দিকে চোখ। এ পর্যন্ত ছোট বড় যে কটা ডাকাতি হয়েছে, তার কোনটাই কৈবর্তদের বাড়ীতে নয়। গৌড় থেকে যে সব লোকেরা এখানে এসে জমি জমা ঘর বাড়ী করে থিতু হয়ে বসেছে, ওদের নজরটা তাদের দিকেই।

কেউ কেউ বলল, আমাদের কৈবর্তদের ঘরে আছেই বা কি, আর নেবেই বা কি! যাদের ঘরে গেলে ভাল মত কিছু পাওয়ার আশা আছে, সেই সমস্ত শাঁসালো লোকেদের ঘরেই তো ওরা যাবে।

কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে সন্দেহ নেই, তবে লোকের মনের খটকাটা কিন্তু কাটল না। বাইরে থেকে যারা এখানে গাঁট হয়ে বসেছিল, তারা আতংকিত হয়ে ধন প্রাণ বাঁচাবার জন্য রাজ-পুরুষদের কাছে এসে ভিড় করতে লাগল। রাজপুরুষেরাও নিজেদের কর্মঠতা প্রমাণ করবার জন্য হন্ত দন্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। সন্দেহ করে একে ধরে, ওকে ধরে, জোয়ান জোয়ান ছেলেদের ধরে এনে মারপিট করে।—কিন্তু ডাকাতি যেমন চলছিল,

তেমনি চলতে লাগল, ডাকাতদের টিকিটারও নাগাল পাওয়া গেল না। শুধু অকারণে নির্দোষ মানুষগুলির উপর দিনের পর দিন এমনি ভাবে নিগ্রহ চলল। মানুষ এমনিতেই ক্ষেপে ছিল, আরও ক্ষেপে উঠল।

লোকের মনের সন্দেহটা যে অমূলক নয়, ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, এ পক্ষ ও পক্ষ দুপক্ষের কাছেই। ডাকাতেরা রাত্রি-বেলা ডাকাতি করতে আসে, এটাই তাদের নিয়ম। কিন্তু ওদের নিয়ম আলাদা। দিন রাতের বিচার নেই ওদের, যখন যেখানে সুযোগ পায়, অমনি সেখানে গিয়ে ছোঁ দিয়ে পড়ে। ঝড়ের মত আসে আর যা কিছু পায় লুটে পুটে নিয়ে ঝড়ের মতই কোথায় মিলিয়ে যায়! প্রকাশ্য দিবালোকে বণিকদের ধানের গাড়ী লুট হতে লাগল। আজ এখানে, কাল ওখানে। শুধু তাই নয়, একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এ ধরনের হামলা হচ্ছে, এখন খবরও শোনা যায়। রাজপুরুষেরা ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে পড়ল। দিনে দুপুরে নিত্যি তিরিশ দিন যদি এই সমস্ত ঘটনা ঘটনা ঘটে, তবে তারাই বা আর কেমন করে পারে। কৈবর্তেরা ওদের সংগে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে হাসে। মনে মনে বলে এবার মজাটা বোঝ বাছাধনরা।

ডাকাতরা যে তাদের শত্রু নয়, কিছু দিন বাদে কৈবর্তেরা সে কথা বুঝতে পারল। এ পর্যন্ত এত ঘটনা ঘটল, কিন্তু কোন কৈবর্তের উপর হামলা হয় নি। তাদের ধানের গাড়ী অবাধে চলাচল করে। আবার এ কথাও শোনা গেছে, এই ডাকাতরা যা কিছু লুটপাট করে তার মধ্যে অধিকাংশই অভাবী কৈবর্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। সত্য না মিথ্যা কে জানে, কথাটা কিন্তু বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট-বড় মেয়ে-পুরুষ সবার কানেই একথা এসেছে। তারা বলাবলি করে, কিসের এরা ডাকাত, এরাই আমাদের সত্যিকার আপন মানুষ। জোয়ান ছেলেরা কানাকানি করে, দেখি আরও কয়েকটা দিন, শেষে আমরাও ওদের পথ ধরব।

অবস্থা বেগতিক দেখে বণিকরা তাদের ব্যবসাপত্র গুটাতে লাগল তারা বলে, গ্রামে গ্রামে ওদের লোক আছে, তারাই ওদের খবর যোগায়। তা না হলে দিনে দুপুরে এমন হতে পারে কখনো। এ অবস্থায় ধনের মায়া করতে গেলে ধনও যাবে, প্রাণও যাবে। কিন্তু বণিকরা যাই বলুক, বরেন্দ্রী থেকে গৌড়ে ধানের চালান বন্ধ হয়ে যাবে, এ কখনোই হতে পারে না। বরেন্দ্রীর ধান না হলে গৌড়ের কেমন করে চলবে? তাছাড়া ওদের ভয়ে বণিকরা যদি তাদের কাজ কর্ম বন্ধ করে দেয়, তবে তার ফলে সম্রাটের মর্যাদার হানি ঘটবে, ওদেরও সাহস বেড়ে যাবে। অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য গৌড় থেকে সৈন্য পাঠানো হতে লাগলো।

রাজধানী থেকে খবর এসেছে, ধানের চালান যেন কিছুতেই বন্ধ না থাকে। সশস্ত্র সৈন্যেরা গাড়ীগুলিকে রক্ষা করবার ব্যাপারে বণিকদের সংগে থেকে সাহায্য করবে। তারপর আরও একদল সৈন্য এল ডাকাতদের আর তাদের পক্ষের লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। এমন শিক্ষা যে শিক্ষা তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না। এ কথা ঘোষণা করতে তারা দ্বিধা করল না। নিতান্ত সাধারণ মানুষ যারা, তারাও বুঝল ব্যাপারটা বড় কঠিন অবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজার সৈন্যেরা আর রাজপুরুষেরা যতই গর্জাক, ডাকাতরা কিন্তু একটুও ভয় পায় নি। প্রথম সুযোগেই তারা তার প্রমাণ দিল। চার জন সশস্ত্র সৈন্য এক বণিকের এক বহর গাড়ীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা গাড়ীগুলির জন্য বনের আড়ালে ওৎ পেতে বসেছিল। ধানের গাড়ীগুলি এসে পৌছতেই ওরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ষী সৈন্যেরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেইখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ডাকাতরা সংখ্যায় অনেক বেশী। চারজন সৈন্য আর বণিক মারা পড়ল। খবরটা রাজপুরুষদের কাছে বয়ে নিয়ে যাবার মত একটা লোক অবশিষ্ট রইল না। সৈন্যদের অস্ত্রগুলি হাতে

করে নিয়ে ওরা এগিয়ে চলল, আর মোষের গাড়ীর চালকরা যেন বিশেষ কিছুই হয় নি এমনি ভাবে তাদের পিছন পিছন অনুসরণ করল।

মারামারি কাটাকাটি দেখে শান্ত প্রকৃতির মোষগুলি ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। এখন নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পরম আরামে রোমন্থন করতে করতে এগিয়ে চলল।

রাজার সৈন্যদের সংগে এমন মারামারি কাটাকাটি কতই তো হয়েছে। কিন্তু সে আগেকার দিনের কথা, তখনও কৈবর্তরা এমন ভাবে মরে যায় নি। তারপর থেকে রাজপুরুষদের হাতে, সৈন্যদের হাতে কৈবর্তদের বহু লোককেই নানা উপলক্ষে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু এত দিনে এবার ভাব পালটা। গর্বে গৌরবে ওদের বুক ভরে উঠল। রাজপুরুষেরা এত সহজে এ ব্যাপারটা হজম করে নেবে না, এ কথা সবাই বোঝে। কিন্তু আপাতত ভয় করবার কথা কারও মনে রইল না।

ইতিমধ্যে ভিতরকার রহস্যটা প্রকাশ হয়ে গেছে। ডাকাত দলের সর্দার আর কেউ নয়, তাদের শিয়ালমারির পরভু। পরভুর নাম এখানকার অনেকেরই জানা আছে। এখনও লোকে তার কথা নিয়ে বলাবলি করে। বছর কয়েক আগেকার কথা।

শিয়ালমারির চাপাই মোড়লের ছেলে পরভু। কি চেহারা একখানা, কি হাত পায়ের গোছা, কি মুখ চোখ, আর কি রং—কালো পাথরও এমন কালো হয় না। সে রংয়ের মধ্যে এক ফোঁটা ভেজাল নেই। মাথায় বাবড়ী চুল, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, যেমন সিংহের কেশর। আর কি তার চলার ভংগি, পথ চলতি মানুষ চলতে চলতে একবার একটু দাঁড়িয়ে তাকে দেখে নিত।

চাষ বাসের কাজে পরভুর মন ছিল না। ছোট বেলা থেকেই তার ধনুক আর বর্শা নিয়ে বনে জংগলে শিকারের পিছন পিছন ছুটত। জোয়ান হয়ে উঠল, কিন্তু স্বভাব বদলাল না। কোদাল

আর লাংগল ওর দু চোখের বিষ। ও বলত চাষের কাজ মেয়ে মানষের কাজ, ও সব আমাকে দিয়ে হবে না। লোকে ওর কথা শুনে অবাক। বাপ ভাইয়েরা বলে বলে হার মানল। পরভুর যেমন কথা তেমন কাজ। চিরদিনের জেদী ছেলে, তার নিজের পথ ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে এক পা-ও যেতে রাজী নয়। লোকে বলল, বিয়েটা হোক আগে, তার পর কাজে মন বসবে।

কথাটা মিথ্যা নয়, যত দিন ঘরে বউ না আসে তত দিন মানুষ আধা মানুষ। বাড়ীর আংগিনায় বউর পা পড়তে না পড়তে সেই আধা মানুষটা পুরো মানুষ হয়ে ওঠে। তখন আর তাকে কাজের কথা নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে হয় না। এ কথা চাষীদের অজানা নয়। যার যার পুরানো দিনের কথা তারা তো একেবারে ভুলে যায় নি।

কিন্তু সেই ব্যাপারেও মুস্কিল। বিয়ে দিতে হলে একটা মেয়ে তো চাই। মেয়ের অভাব কি, এ গ্রামে ও গ্রামে মেয়ে তো কতই আছে। চাপাই মোড়লের ছেলের জন্য মেয়ে যোগাড় করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আসল কথা, পরভুর মনের কথাটা তো জানা দরকার। উঠতি বয়সের ছেলে, কারও না কারও দিকে অবশ্যই ঝোঁক আছে। কিন্তু রোখটা যে কার দিকে সে কথা কেউ বলতে পারে না। মেলার সময়, পূজাপার্বণ-উৎসবের দিনে বহু মেয়ে পরভুর পিছনে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। পরভু মুচকি মুচকি হাসে, রংগরস করে, হাসিঠাট্টা ছিটায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। এমন এক ছেলে, কোন মেয়েই তার মন জয় করতে পারল না।

অবশেষে পরভুর এক সাংগাত ভাদুকে অনেক জেরা করবার পর আসল ব্যাপারটা জানা গেল। এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে শালবনী গ্রাম। সেই গ্রামের এক মেয়ের সংগে ওর রং লেগেছে। মেয়ের নাকি রূপের সীমা নেই। পরভু মাঝে মাঝে শিকারের নাম করে সেখানে চলে যায়, দু দিন তিন দিন কাটিয়ে তার পর ঘরে ফিরে আসে।

সবাই বলল, তাই তো, ভিতরে ভিতরে যে এত সব চলছে, আমরা কেমন করে জানব! আমরা মনে করেছি শিকারের যা ঝোঁক সত্যিই বুঝি শিকার করতে যায়।

ভাদু হেসে বলল, শিকার টিকার এখন চংগে উঠেছে। শিকার করতে গিয়ে শিকারী নিজেই জখম।

লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেয়া হোল। ভাদু একটুও বাড়িয়ে বলেনি। হ্যাঁ, চোখ আছে বটে পরভুর, এমন মেয়ে কমই দেখা যায়। যেমনি ছেলে তেমনি মেয়ে, মিলবে ভাল। ছেলে মেয়ে তুজনেই যখন মত করেছে বাপদের আর আপত্তির কি আছে। প্রস্তাব পাকাপাকি হয়ে যেতে সময় লাগল না।

তবে সকলেরই তখন টানাটানির সময়। ঠিক হোল, মাস তিনেক বাদে নবান্ন আসছে, বিয়েটা সেই সময় হবে।

কিন্তু নবান্ন আসবাব আগেই তুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎ এক দিন চাপাই মোড়লের বাড়ীতে খবর এসে পৌঁছল, মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটির নাম বল্লুকী। বল্লুকী বন-গাড়ুলি পূজার জন্য বনে শালের মঞ্জরী আনতে গিয়েছিল। সেই যে গিয়েছে, মেয়ে আর ফিরে আসেনি। তুদিন ধরে সমস্ত অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজে তার কোন চিহ্ন না পেয়ে ওরা চাপাই মোড়লের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটা কি বুঝতে কারও বাকী রইল না। এ রকম ঘটনা এই তো প্রথম নয়। এমন আরও অনেক মেয়ে চুরি গেছে। আর যে মেয়ে গেছে, তাকে আর কোন দিন ফিরে পাওয়া যায় নি। কৈবর্ত-দের মধ্যে হিন্দুও আছে, বৌদ্ধও আছে। কিন্তু সে শুধু নামেই। জাতে স্থান পেলেও তারা পাতে স্থান পায় নি। গৌড়ের লোকেরা তাদের অস্পৃশ্য বলেই মনে করে। কিন্তু মেয়ের ব্যাপারে কোন স্পর্শ-দোষ নেই। ফলে মেয়েদের রূপ-যৌবন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুরুষদের বা বণিকদের দৃষ্টি যাদের উপর পড়ে,

তার আর রক্ষা নেই, এমনি ভাবেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যায়, কি হয় তাদের পরিণতি, সে কথা কোন দিন কেউ জানতে পারে না। আগেকার দিনে এ নিয়ে কত রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেছে। কিন্তু কোন দিন কোন প্রতিকার হয়নি তার। আরও উলটে শাসনদণ্ড তাদেরই মাথার উপর নেমে এসেছে। অক্ষম কৈবর্তেরা ঘা খেয়ে খেয়ে নির্জীব হয়ে এসেছে, এখন তারা নিঃশব্দে এ সব সহ্য করে নিতে শিখেছে। সহ্য করে নেয় বটে, কিন্তু হজম করে নিতে পারে না, ঘৃণা আর বিক্ষোভের আগুন মনের ভিতরে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে।

পুরানো দিনের বহু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে ওরা পরভূকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। পরভূ নিঃশব্দে ওদের কথা শুনল, কিন্তু উত্তরে ভাল মন্দ কোন কথাই বলল না। মেয়ের কি আর অভাব আছে, এক মেয়ে গেছে, কত মেয়ে পাওয়া যাবে—সবাই বলল, মেয়ের খোঁজ কর। বলল বটে, কিন্তু পরভূর মুখের ভাব দেখে কেউ তার কাছে কথাটা তুলতে সাহস করল না। অমন যে অন্তরংগ বন্ধু ভাদু সেও বলল, না, আমি পারব না।

পরভূ এখন আর শিকারে যায় না। তার এত সাধের ধনুক আর বর্শা যেখানে ছিল, সেখানে পড়ে ঘুমায়, সে এখন আর তাদের ছুঁয়েও দেখে না। কৈবর্ত তরুণীদের মন হরণ করা পরভূর অমন সুন্দর বাবড়ী চুল, যাদের গুছিয়ে গুছিয়ে-পাট করতে তার অনেক সময় ব্যয় করতে হোত, সেই চুল অনাদরে, অবহেলায় রুক্ষ, জটিল আর ধূলিধূসর হয়ে উঠল। ঘরে মন বসে না পরভূর, অধিকাংশ সময় বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সবাই বলাবলি করে, আহা, কি ছেলেটা কি হয়ে গেল গো! পাগল হয়ে যাবে না তো শেষ কালে? বুড়ো চাপাই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে।

এক দিন ভাদু এসে খবর দিল, পরভূ সমাজের মাথা দিব্যোকের সংগে আলাপ করতে গিয়েছিল। সবাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল,

তাই নাকি? কি আলাপ হোল তার সংগে? মহৎ কি কোন আশা ভরসা দিয়েছে?

ভাতু বলল, সে কথা বলতে পারব না। পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দূর থেকে দেখলাম। হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল, ধরতে পারলাম না। পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কোন কথার উত্তর দেয় না।

এর কিছু দিন বাদেই পরভু নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কত খুঁজাখুজি, কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই যে গেছে, আর ফেরোন। কেউ বলে সাধু হয়ে গেছে, কেউ বলে পাগল হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে মরছে, কেউ বা বলে বেঁচে আছে কি না, তাই বা কে বলবে! যার যেমন খুশী তাই বলে। তার কথা নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে আলোচনা উঠে।

শিয়ালমারির পচন কবির মুখে মুখে গান বাঁধবার অভ্যাস আছে। পরভু আর বল্লুকীর কাহিনী নিয়ে এক পালা গান বেঁধেছে। রাখাল ছেলেরা মোষ চরাতে চরাতে সেই গান গায়।

এত দিন বাদে জানা গেল পরভু সাধুও হয় নি, পাগলও হয় নি. মরেও যায় নি। যে ডাকাতের দল সারা রাজ্য তোলপাড় করে তুলেছে, সে নাকি এখন তাদের সর্দার। শিয়ালমারির পরভু বড় সহজ লোক নয়। এখন কিন্তু লোকে আর ডাকাতের কথা বলে না, 'বলে আমাদের লোকেরা', শিয়ালমারির লোকেরা গর্বে ফেটে পড়তে চায়। পরভুর কথাটা প্রথমে কানাকানির মত শোনা গিয়েছিল! পরে ভাতু যখন এক দিন এসে বলল, আমার স্বচক্ষে দেখা হয়েছে তার সংগে, আর সারা রাত জেগে তার সংগে কথা হয়েছে, তখন আর কারও মনেই কোন রকম সন্দেহ রইল না।

সবাই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, কি বলল? কি বলল?

ভাতু হুঁশিয়ারী দিয়ে বলল, চুপ চুপ, এ সব কথা যেখানে-সেখানে নয়। যা বলবার সবই বলব, কিন্তু যাকে-তাকে নয়। আমাদের

কৈবর্তদের অশেষ দোষ, আমরা পেটের কথা চেপে রাখতে পারি না।

ভাহু অত্যন্ত সতর্কতার সংগে উপযুক্ত লোকদের কাছে তার যা বলবার সবই খুলে বলল। আর বলার পর তাদের সতর্ক করে দিল, খুব সাবধান, এ সব কথা যেন আর কারও কানে না যায়। তারা বলল, ক্ষেপেছ তুমি, এ সব কথা কি যাকে-তাকে বলা যায়। কিন্তু দু দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, ভাহুর কোন কথাই কারও অজানা নেই।

এর ক'দিন বাদে ভাহুও নিরুদ্দেশ। কোথায় গেছে, বুঝতে কারও বাকী রইল না। ভাহুর কাঁচা বয়সের বউটা কান্নাকাটি করতে লাগল। আর সব মেয়েরা তাকে ধমকে দিল, থাম ছুঁড়ি, আর কাঁদতে হবে না তোকে। তোর ভাগ্য ভাল যে এমন সোয়ামী পেয়েছিস! সে তো আমাদের জন্যই ওদের সংগে যুদ্ধ করতে গেছে। আমরা সবাই বন গাড়ুলির কাছে পূজো দেব—রণে বনে সহায় থেকো মা, ওরা যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসুক। আর দরকার যদি হয়, আমরাই কি পিছিয়ে থাকব নাকি? বঁটি দিয়ে শয়তান-গুলোর নাক কান কেটে দেশ থেকে তাড়াব। রাখ এখন তোর কান্না। এখন কি কান্নাকাটি করবার সময় নাকি?

কথাটা রাজপুরুষদের কানে গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগল না। এ ডাকাত যে সাধারণ ডাকাত নয়, এ সন্দেহ ওদের মনে আগেই জেগেছে। কিন্তু এখন আর সন্দেহ নয়, দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। কিন্তু ঢেউ-খেলানো বাবড়ীওয়ালা সেই শৌখীন ছোঁড়াটা, এ সব তারই কীর্তি! না কি, এর পিছনে আরও কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে?

পিছনে যে বা যারাই থাক, খবরটা পাবার পর ওরা আর দেরী করল না। এক দিন সকাল বেলা শিয়ালমারি গ্রামের লোক অবাক হয়ে দেখল এক জন রাজপুরুষ জনা দশেক সৈন্য নিয়ে পরভুদের

বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। গ্রামের পঞ্চজন সামনে যেতেই সৈন্যরা এমন তাড়া দিল যে ওদের পিছিয়ে আসতে হোল। মেয়ে পুরুষ দূরে দাঁড়িয়ে বাসা-ভাংগা পাখার মত উত্তেজনা ও আতংক মিশ্রিত কলরব করে চলল।

এদিকে পরভুদের বাড়ীতে সৈন্যেরা চাপাই মোড়ল আর তার দুই ছেলের উপর বিষম হুমকি ধামকি শুরু করে দিয়েছে—বল কোথায় আছে পরভু, আর তার ডাকাত দলের আস্তানাই বা কোথায় ?

বুড়ো চাপাই মোড়ল কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমরা কিচ্ছু জানি না কর্তা। পরভু সেই যে কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, আর তো ফিরে আসেনি।

কিছু জানিস্ না, বটে ! সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না ! জায়গা মত চল্ আগে, জানিস কি জানিস্ না পরে বোঝা যাবে।

রাজপুরুষের আদেশে সৈন্যেরা চাপাই মোড়ল আর তার দুই ছেলেকে পিঠমোড়া বাঁধ বেঁধে নিয়ে ওদের বাড়ী থেকে পথে নামল। গ্রামশুদ্ধ লোক হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কি করবে তারা, কি করা উচিত, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। এমন অবস্থায় তো কোনদিন পড়তে হয়নি তাদের। তাদেরই চোখের সামনা দিয়ে সৈন্যেরা ওদের তিনজনকে ধাক্কা মারতে মারতে ঠেলে নিয়ে চলল।

ওরা যখন গ্রাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে, তখন গ্রামের লোকদের সম্বিত ফিরে এল। সংগে সংগে তারা শত কণ্ঠে কথা বলতে লাগল। কয়েকটা মেয়ে বলে উঠল, কেমন পুরুষ গো তোমরা ? গ্রামের বুড়ো মোড়ল, তাকে কুকুরের মত বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে গেল, আর তোমরা কোন কথাই কইলে না ! পরভু আমাদের জন্ম যুদ্ধ করছে। আর তার বাপ ভাইদের ধরে নিয়ে গেল, গ্রামশুদ্ধ লোক তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ! কথাটা অনেকের

ভিতরেই খোঁচা মারছিল, এখন সবাই নিজের দোষটা ঢাকা দেবার জন্য এক এক জন এক এক রকম যুক্তি তুলল। বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, পঞ্চজন মিশে পরামর্শ না করে কোন কাজ করা যায়! আমরা কি তার সময় পেলাম? এ অবস্থায় একা কে সাহস করে কথা বলবে? এ তো আর কারও একার কাজ নয়।

আক্রমণটা প্রধানত তরুণদের উপরেই। মেয়েদের ধিক্কারটা তাদের গায়েই সব চেয়ে বেশী করে বাজল। তাদেরই এক জন আত্মসমর্থনের সুরে বলল, পঞ্চজন কোন কথাই বলল না, এ অবস্থায় আমরা কি করব? একটা গোলমাল যদি হয়েই যেত, শেষকালে আমাদের দুষত সবাই। চিরদিনই দেখে এলাম, আমরা যা-ই করি তাতেই দোষ।

একটা অল্পবয়সী মুখরা মেয়ে বক্তার মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে শ্লেষের সুরে বলে উঠল, থাম গো থাম, তোমাদের মুরোদ ঢের দেখা গেছে। আজ যদি ভাতু থাকত, তাহলে এমনটা ঘটতে পারত না।

এর উত্তরে কেউ কোন কথা বলল না। বলার মত মুখ নেই কারও, অনুশোচনার আগুনে সবাই ভিতরে ভিতরে দগ্ধে মরছিল।

এমনি সময় কয়েকটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ওরা এক বিচিত্র সংবাদ নিয়ে এসেছে। বড়রা যখন কি করা উচিত ছিল, কি করা হয়নি, আর সেজন্য কার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী, এ সব নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিল, ওরা তখন ঘটনার গতি কোন দিকে যায় তাই দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সৈন্যদলের সংগে কিছুটা ব্যবধান রেখে ওদের পিছন পিছন অনুসরণ করে চলছিল। এখন ওরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছে। কাহিনীটা কে আগে বলবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। ওরা বলল, ওরা যখন মলুই দেবতার উঁচু ঢিবিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন ঢিবির পিছন থেকে আমাদের লোকেরা ছুটে এল।

আমাদের লোকেরা? কেমন করে বুঝলি আমাদের লোক?

বা রে, বুঝব না! ওরা যে হৈ হৈ করে ওদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কি চীৎকার! আমরা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সৈন্যগুলিও প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেই ওরা আমাদের বুড়ো মোড়ল আর তার তুই ব্যাটাকে সামনে নিয়ে এগোতে লাগল। আমাদের লোকেরা তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে ছুটে আসছিল। কিন্তু সবার আগে ওদের তিন জনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই যুদ্ধ বাঁধল।

আমাদের আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছে। আমরা ক'জন ছুটে এলাম তোমাদের খবর দিতে।

এবার আর কর্তব্য নির্ধারণ করবার জন্য পঞ্চজনের বৈঠক বসিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার প্রয়োজন হোল না। কেউ কারও অনুমতি চাইল না, কেউ কারও সংগে পরামর্শ করল না—এক মুহূর্তে একই সংগে সমস্ত মানুষগুলির মধ্যে বিদ্যুতের মত কি একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়ে গেল।

এক কথা ছাড়া আর কোন কথা ভাববার অবকাশ ছিল না। নিমেষের মধ্যে যে যার হাতিয়ার নিয়ে মলুই দেবতার ঢিবির দিকে ছুটল। ছোট, বড়, জোয়ান, বুড়ো, কেউ বাকী রইল না। জোয়ান মেয়েরাও সেই সংগে ছুটল। তাদের উৎসাহ কারও চেয়ে কম নয়।

আর সমস্তগুলি মানুষ একই সংগে আকাশ ফাটানো চীৎকার করে উঠল। সেই বিকট চীৎকার শুনে ভয়ার্ত মোষগুলি বাঁধন ছিঁড়ে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। শিয়ালমারির পোষ মানা কৈবর্ত চাষীদের হঠাৎ একি পরিবর্তন, আর এমন ত্রাসসৃষ্টিকারী এই উচ্চ রণহুংকার ওরা কেমন করে আয়ত্ত করল, কোথায় পেল? তবে কি বংশ পরম্পরাক্রমে রক্তের ধারার মধ্যেই মিশে ছিল? দূর অতীতে এক দিন যারা এমনি ভীম গর্জনে বনভূমি কাঁপিয়ে শিকারের পিছন পিছন ধাওয়া করত, প্রতিদ্বন্দ্বী কৌমের উপর রণ-উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এরা তো তাদেরই বংশধর। সেই সুরের স্মৃতি কিছু ওদের

মধ্যে এত দিন সুপ্ত হয়েছিল, আজ হঠাৎ প্রবল নাড়া পেয়ে জেগে উঠেছে?

ছুটতে ছুটতে মলুই দেবতার ঢিবির কাছে যখন ওরা এসে পৌছল তখন অনেক লোক সেখানে এসে জমেছে। খবরটা কেমন করে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ। সৈন্যেরা আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তিনটি মৃতদেহ রেখে পালিয়ে গিয়েছে। আর আমাদের লোকদের মধ্যেও এক জন প্রাণ হারিয়েছে।

কিন্তু চাপাই মোড়ল, আর তার দুই ব্যাটা—তারা কোথায়? সৈন্যেরা কি তাদের সংগে করে ধরে নিয়ে গেছে?

না না ওরা কেমন করে নেবে? উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, ওরা নিজেরাই তখন পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। আমাদের লোকেরাই তাদের সংগে করে নিয়ে গেছে। তোমাদের ভাতু ওদের দলের মধ্যে ছিল যে।

শিয়ালমারির লোকেরা আনন্দে কলরব করে উঠল।

ওরা যাবার সময় আমাদের কাছে বলে গেছে, ভয় নেই, কোন ভয় নেই, আমাদের সুদিন আসতে দেরী নেই আর। তোমরা সব তৈরী থাকো, ঘরে ঘরে হাতিয়ার বানাও। যেদিন ডাক আসবে, সে-দিন সবাইকে যুদ্ধে নামতে হবে। বাচ্চারা, বুড়োরা আর মেয়েরা ছাড়া আর কেউ সে দিন ঘরে থাকতে পারবে না। কেউ না।

শিয়ালমারির লোকেরা গর্জন করে উঠল—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কথাটা মেয়েদের মনঃপুত হোল না। তারা ঝংকার দিয়ে উঠল, এঃ আমরা বুঝি ঘরে বসে থাকব? তা হবে না।

আর তারা বলে গেছে, আমাদের যে বন্ধুকে আমরা এখানে হারালাম, শিয়ালমারির লোকেরা তার মৃতদেহ নিয়ে আপনজনের মতই যেন তার শেষ কাজ করে।

তাই তো, তাই তো, শিয়ালমারীর লোকেরা ব্যস্ত হয়ে তাকে

দেখতে গেল। এত লোক সবাই তাকে এক সংগে দেখতে চায়, ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল।

গোল হয়ে দাঁড়াও, গোল হয়ে দাঁড়াও কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। আর বেশী বলতে হোল না, সংগে সংগে এতগুলি লোক অদ্ভুত শৃংখলার সংগে মৃতদেহকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করে দাঁড়াল। এবার সবাই দেখল রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে একটি কাঁচা বয়সের ছেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। কৈশোর ছাড়িয়ে সবে মাত্র যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েছিল। আহা রে—একটা বিলাপ-গুঞ্জরণ সেই বৃত্তপথ বয়ে ঘুরে ফিরতে লাগল। হঠাৎ কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। সংগে সংগে আরও কয়েকজন তার অনুসরণ করল।

চুপ চুপ চুপ কাঁদতে নেই, ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল। বিচিত্র তার কণ্ঠস্বর। যারা কাঁদছিল, তারা তাড়াতাড়ি আপনাদের সামলে নিল।

ওরা বলে গেছে, আমাদের লোকেরা প্রাণ নিচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে। সেজন্য দুঃখ নেই। আরও অনেক অনেক প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হবেই।

শিয়ালমারির লোকেরা বলাবলি করছিল একে এখানকার কেউ চেনে না, সবাই বলছে, এ অঞ্চলের লোক নয়। তবু দেখ আমাদের জন্য প্রাণ দিল।

একজন বলল, হ্যাঁ, আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি, কাছে, দূরে—সারা দেশ জুড়ে আমাদের লোকেরা ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে। তা না হলে শিয়ালমারিতে এই ঘটনা ঘটবার সাথে সাথেই এরা কেমন করে তা জানতে পারল! এরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর দেখ, শিকারে বাজের মতই এরা যেমন চটপটে, আর তেমনি ওদের ছোঁ মারবার কায়দা। আমরা সারা গ্রামের লোক দিশাহারা হয়ে হা-হুতাশ করে মরছিলাম, আর এরা সংগে সংগেই কাজে নেমে পড়ল।

শিয়ালমারির লোকেরা সেই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলল। আর যত লোক ছিল তারাও তাদের সংগে নিল। এরই মধ্যে খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিককার গ্রামগুলি ভেংগে লোক আসছে। আসছে তো আসছেই। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য। সেই বিপুল জনতা মৃতদেহ সামনে নিয়ে শিয়ালমারিতে এসে পৌছল। জনতার মনে বেদনার ছায়া, কিন্তু তার চেয়েও বেশী গর্ব আর গৌরব। বিলাপ নেই, জয়ধ্বনিও নেই। এক অননুভূত আবেগ আর কঠিন সংকল্পে কেমন ধীর আর নিঃশব্দ সেই জনতা। এ এক অভিনব দৃশ্য।

ওরা বলেছিল আরও অনেক—অনেক প্রাণ দিতে হবে। এর সত্যতা কয়েক দিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল। এক দিন গভীর রাত্রিতে ঘুম ভেংগে গেল সবার। জেগে উঠেই আগুনের শিখা চোখে পড়ল। অন্ধকার শিয়ালমারি গ্রাম আলোয় আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। রাজার সৈন্যেরা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে ফিরছে, আর যাকে পাচ্ছে তাকেই তরোয়ালের মুখে সমর্পন করছে। সদ্য জেগে ওঠা মানুষগুলি প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। যারা পারল, পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। হুহু করে বাতাস বইছিল, অগ্নিশিখা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের পর ঘর গ্রাস করে চলল।

পর দিন থেকে রাজার সৈন্যেরা শিকারী কুকুরের মত চারদিককার গ্রামগুলিতে শিকার খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল। লুটতরাজ, মারপিট আর হত্যাকাণ্ড চলল অবাধে। পাথরের মত অসাড় হয়ে পরে রইল মানুষগুলি, মুখ ফুটে কথা বলবার মত শক্তিটুকুও কারও রইল না। রাজধানীতে সংবাদ পৌছল, অবস্থা আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আর এক জরুরী সংবাদ—বরেন্দ্রীর পূর্ব প্রান্তে নতুন গোল-মাল দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে আরও সৈন্য পাঠাতে হবে। পদাতিক নয়, অশ্বারোহী সৈন্য। এই ভাবে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার চক্র গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

পাঁচ

দুর্দিন, মহা দুর্দিন!

সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই দুর্দিন তো আর আজই শুরু হয় নি। তবে হ্যাঁ, দুর্দিন আজ চরমে এসে পৌঁছেছে, এ কথা সত্য।

কিন্তু তবু কি একটু চেতনা আছে! মরার আগে মানুষের যেমন জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, এও তেমনি। তা নইলে পনেরোটা বিহারের অধ্যক্ষদের এই অধিবেশনের উদ্দেশ্যটা জানিয়ে আমন্ত্রণ লিপি পাঠালাম, তার উত্তরে আপনারা পাঁচজন মাত্র এলেন। বাকী দশ-জন অনুপস্থিত। এমন কি আমন্ত্রণ লিপির উত্তরে কোন কথা জানাবার মত সাধারণ সৌজন্য বোধটুকু পর্যন্ত নেই। অথচ সবাই আমরা একই সংকটের মুখে। আর এ তো সাধারণ সংকট নয়, আমরা যে ক্রমবিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছি।

ন্যগ্রোধ বিহারের অধ্যক্ষ উপগুপ্ত বললেন, রাজধানী নিকটবর্তী যারা সংকটের আঁচটা তাদের গায়েই বেশী করে লাগছে। দূরের মানুষ যে যার মনে আছে, একে অপরের খোঁজ খবর রাখে না। এদিকে কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে চলেছে, সেই চেতনা ক'জনারই বা আছে! কিন্তু এটাই সব কথা নয়, আরও কথা আছে। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান—আমাদের এই সমস্ত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রেশারেশি এমন পর্যায়ে আর কখনো ওঠেনি। সবাই যে যার নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্যস্ত, এই কঠিন বিপদের দিনেও সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা পারস্পরিক ভেদবুদ্ধিটাকে ভুলে যেতে পারছে না। আপনি সোমপুর বিহারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু পাছে এর মধ্য দিয়ে মহাযানপন্থীদের

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায়, কে জানে, হয়তো বা সেই কারণেই কেউ কেউ এগোতে চাইছেন না।

সোমপুর বিহারের অধ্যক্ষ প্রিয়রক্ষিত বললেন, উদ্যোগ কে নিল সেটা বড় কথা নয়, বৌদ্ধ সমাজের এই গুরুতর সমস্যাটা নিয়ে পর্যালোচনা করবার জন্য আজ আমাদের সকলের সম্মিলিত হওয়াটা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চরম প্রয়োজনের সময়ও আমাদের ভেদবুদ্ধিটাই যদি প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সে তো ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ।

নিশ্চয়। আমাদের সমাজ সেই পথেই তো চলেছে, আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি জৈনদের অবস্থাটা, তবু আমাদের চেতনা হয় না। এই পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনরাই সর্বপ্রথম এসেছিল। আমরা তার পরে, হিন্দুরা আরও পরে। একদিন এই জৈনরা সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধন ও রাঢ়ে তাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, এ কথা না জানে কে! শুধু তাই নয়, লোকে বলে তারা ভাগীরথী পার হয়ে আরও পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর প্রাধান্যের প্রশ্ন নিয়ে তাদের শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অন্তর্কলহ দেখা দিল। আর তার পরিণতি? অবশ্য জৈনরা এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু একে কি বলে বেঁচে থাকা? মরা নদীর সোঁতার মত তারা আজ তাদের অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করে চলেছে মাত্র।

কোথায় গেল তারা? একজন প্রশ্ন করল।

কোথায় গেল? বর্তমানের ধারা দেখে অনুমান করতে পারি, কিছু এসেছে আমাদের সংগে, আর অধিকাংশ হিন্দুদের মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে।

ওদের সংগে আমাদের অনেক মিল, কাজেই আমাদের মধ্যে ওরা আসবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়! কিন্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী হিন্দুদের কবলে ওরা কেমন করে গিয়ে পড়ল?

প্রিয়রক্ষিত বললেন, কেমন করে গিয়ে পড়ল? সেই প্রশ্নই তো আজ আমাদের সামনে।

একদিন জৈনদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, অনুরূপ সমস্যা কি আমাদের সমাজেও এসে ঘা মারছে না? চোখ মেলে চেয়ে দেখুন. তার কোন লক্ষণ কি আপনাদের চোখে পড়ছে না?

মধুবন বিহারের অধ্যক্ষ সুভদ্র বয়সে সব চেয়ে তরুণ। তিনি বললেন, আমাদের সমাজের অবস্থা সন্তোষজনক নয়, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনারা বিপদটাকে অতিরিক্ত রকম বাড়িয়ে দেখছেন। জৈনদের সংগে কোন দিক দিয়েই আমাদের তুলনা হতে পারে না। তারা বহু দিন আগে থেকেই প্রাণশক্তি হারিয়ে আসছিল। তা ছাড়া তাদের সব চেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, এ দেশে তাদের সাহায্য করবার মত তাদের ধর্মাবলম্বী কোন রাজশক্তি ছিল না। সে দিক দিয়ে আমরা ভাগ্যবান। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর দেশে দেশে আমাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ছে। আর আমরা ভয় পাব হিন্দু সমাজকে? বর্ণাশ্রমের মূঢ় বিধান ওদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তা ছাড়া শৈব, শাক্ত আর ভাগবতদের পারস্পরিক কলহ ও হানাহানি দিন দিনই উগ্র রূপ ধারণ করছে। ওরা নিজেরাই যে মরতে বসেছে।

সুভদ্র বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যে তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেছে। নিজস্ব মতামত প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর একটি বিশেষ ভংগি আছে, যেটা অনেকের কাছেই একটু রূঢ় বলে মনে হয়। প্রবীণ আচার্যেরাও একটু সম্ভ্রম নিয়েই তাঁর সংগে কথা বলেন। কিন্তু ন্যগ্রোধ বিহারের অধ্যক্ষ উপগুপ্তের কথা স্বতন্ত্র। সুভদ্র তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ সর্বপ্রথম তাঁর কাছে থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই একটি মাত্র স্থান যেখানে সুভদ্র কিছুটা দুর্বল, ছাত্রের সেই আড়ষ্ট ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

উপগুপ্ত সুভদ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তুমি

সম্প্রতি অনেক দিন বাদে সিংহল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এসেছ, এখনও সমস্ত অবস্থাটা তলিয়ে দেখবার মত সময় পাও নি। তুমি যা বলছ তা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে হলে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। বর্ণাশ্রম ওদের দুর্বলতা মানি, কিন্তু এর মধ্যে ওদের টিকে থাকবার শক্তিও নিহিত রয়েছে, সে কথাটাও মনে রাখা দরকার। কথাটা একটু পরস্পরবিরোধীর মত শোনাচ্ছে? কিন্তু কি করা যাবে, বিচিত্র এই সংসার, এখানে বিশুদ্ধ সরল রেখা ধরে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সত্য আর মিথ্যা, সবলতা আর দুর্বলতা এখানে এমন অংগাংগীভাবে জড়িয়ে থাকে, যে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বড়ই কঠিন। আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের কথা বলছ? হ্যাঁ, বিরোধ ওদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তা কি ওদের চেয়ে কম? এটা সিংহল নয় পুণ্ড্রবর্ধন, সে কথাটা ভুলে যেও না। যাক আর কিছুদিন, নিজেই সব টের পাবে।

সত্য আর মিথ্যা অংগাংগীভাবে মিলিয়ে আছে, বিচ্ছিন্ন করা যায় না—এ কেমন কথা! তীব্র প্রতিবাদ ঠেলে উঠতে চাইল, জোর করে চাপা দিয়ে রাখলেন সুভদ্র, কিন্তু মুখের ভাবে তা চাপা রইল না। প্রাক্তন ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে উপগুপ্ত মনে-মনে হাসলেন।

প্রিয়রক্ষিত বললেন, এ কথা সবাই বলে রাজবংশ আমাদের স্বধর্মা, রাজশক্তি আমাদের পিছনে রয়েছে, অতএব আমাদের সমাজের উন্নতি অবধারিত। কিন্তু কার্যত কি হচ্ছে? এ কথা সত্য পরম ভট্টারক মহারাজ ধর্মপালদেব আর দেবপালদেবের সময় আমরা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলাম। সমগ্র সাম্রাজ্য মধুচক্রের মত বিহারে বিহারে পরিকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে আমরা ছিলাম আদর্শস্থানীয়। দেশ বিদেশ থেকে ভিক্ষুরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। আর আজ? সেই অসংখ্য বিহারের

মধ্যে ক'টি টিকে আছে এখন? যতই দিন যাচ্ছে জীর্ণ পত্রের মত ঝরে ঝরে পড়ছে। শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে? কেমন করেই বা আমাদের ধর্মের প্রসার লাভ ঘটবে? প্রসার লাভ দূরে থাক, দিন দিন অধোগতি ঘটছে।

কেন, কেমন হচ্ছে কেন? কে তার জন্য দায়ী? সুভদ্র প্রশ্ন করলেন।

কেন এমন হচ্ছে? প্রিয়রক্ষিত চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, কারণ তো একটা নয়, অনেক কারণ আছে। তবে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আজ-কালকার রাজাদের সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সেই উদ্যোগ কই, উৎসাহ কই! এই বিহারগুলি আমাদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। এখান থেকে সুশিক্ষা লাভ করলে তবে ভিক্ষুরা প্রচারকার্যে সাফল্য লাভ করতে

এইজন্যই আগেকার দিনের রাজারা বিহারগুলির পিছনে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করতেন। প্রধানত তাঁদের সাহায্যেই বিহারগুলি চলত, এ কথা বললে ভুল বলা হয় না। আর এখন রাজকীয় সাহায্যের মাত্রা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। কমতে কমতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তার ফলে জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্তিকাগুলি একটির পর একটি নিভে যাচ্ছে। যেগুলি এখনও টিকে আছে, সেগুলি কিভাবে চলছে সে শুধু আমরাই জানি।

বীথিকাবিহারের অধ্যক্ষ বিনয়পালিত বললেন, কিন্তু শুধু রাজাকে দায়ী করলেই চলবে কেন, দোষ সবারই আছে। আগেকার দিনে শ্রেষ্ঠীরা বিহারের জন্য যথেষ্ট অর্থদান করতেন। কেউ কেউ একাই এক একটা বিহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু এখন তাঁরা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন!

উপগুপ্ত তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, আপনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। আমরা আজকাল শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে খুব কম সাহায্যই পেয়ে থাকি। কিন্তু তাঁদের অবস্থাও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তাঁদের সেই বাণিজ্য কি আর এখন আছে? পাল সাম্রাজ্য এখন নামেই সামাজ্য। এক দিন আমাদের এই সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। শ্রেষ্ঠীদের বাণিজ্যতরী সেদিন অনুকুল পবনে ছুটে চলেছিল। কিন্তু আজ সাম্রাজ্যের চরম দুর্দশা। পশ্চিমাঞ্চল হস্তচ্যুত হয়েছে, পূর্বাঞ্চলের অবস্থাও তাই। পঞ্চগৌড়েশ্বরের বিপুল সাম্রাজ্য আজ গৌড়ে এসে সীমাবদ্ধ। তাও ঘরে বাইরে সংকট, সামন্তরাজেরা সুযোগ পেলেই বিগড়ে বসতে চাইছে। সব কিছুই যেন ধ্বসে পড়ছে, কোন কিছুর স্থিরতা নেই। এ অবস্থায় শ্রেষ্ঠীদের বাণিজ্যতরী যেন শুকনো ডাংগায় আটকে পড়ে অচল হয়ে আছে। শ্রেষ্ঠীরা করবে কি? আর বাণিজ্যে যদি মন্দা লাগে, রাজ্যের সমৃদ্ধি হতে পারে কখনও! আমাদের রাজারা যে বিহারগুলির প্রতি সাহায্যের মাত্রা কমিয়ে দিয়েছেন, সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থাও সেজন্য কিছুটা দায়ী।

বেত্রবতী বিহারের অধ্যক্ষ তেমন বাক্‌পটু নন, এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি, চুপ করে সবার কথা শুনছিলেন। বেত্রবতী বিহার অনেক দিন থেকেই টলমল করছে, যে কোন সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে। তাই অধ্যক্ষের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। কতক্ষণ ধরেই তাঁর বক্তব্যটা বলি বলি করছিলেন, কিন্তু বলে উঠতে পারছিলেন না। উপগুপ্তের শেষ কথার পর হঠাৎ মুখের ঢাকনাটা খসে পড়ল তাঁর, তিনি ফোঁস করে গর্জে উঠলেন, হিন্দু মন্দির আর চতুষ্পাঠীর সাহায্যের ব্যাপারে তো কখনও অর্থাভাবের কথা শোনা যায় না। যত অভাব কি সব আমাদের বেলায়? আমরা হিন্দু নই, এটাই কি আমাদের অপরাধ?

এক জন তাঁর কথার সমর্থন করে বললেন, ঠিক কথাই তো বলেছেন ইনি। হিন্দুদের মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ব্যাপারে তো বিন্দুমাত্র কার্পণ্য দেখা যায় না। আসল কথা মহারাজ তো উপলক্ষ মাত্র, হিন্দু মন্ত্রী বরাহস্বামী তাঁর ঘাড়ের

উপর ব্রহ্মদৈত্যের মত চেপে বসে আছে, আর যা করবার সেই তো সব করাচ্ছে। কাজেই এ সমস্ত যে ঘটবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যতদিন বরাহস্বামী আছে, ততদিন এই রকমই চলবে।

সুভদ্র বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, সে কি, হিন্দুদের ধর্মকার্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয় করা হয়?

হয় বই কি। একাধিক কণ্ঠ এক সংগে বলে উঠল।

সুভদ্র অর্ধস্বগতোক্তি করলেন, অদ্ভুত! আশ্চর্য! পরে সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, শুনেছি হিন্দুরাজা শশাংক সদ্ধর্মীদের উপর কম নির্যাতন করেন নি। অবশ্য তাই বলে হিন্দুদের উপর তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক, এমন কথাও বলছি না আমি। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় কাজে এমন অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা, তারই বা মানে কি? এর ফলে এক দিকে আমাদের বিহারগুলি একের পর এক লোপ পেতে থাকবে, আর এক দিকে হিন্দুদের ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

প্রিয়রক্ষিত মৃদু কণ্ঠে বললেন, ঘটবে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই ঘটে আসছে। আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে, কিন্তু আমরা অসহায় ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছি।

কিন্তু আপনারা মহারাজের সংগে এ নিয়ে একটা বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করেন নি? সুভদ্র প্রশ্ন করলেন।

উপগুপ্ত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এ নিয়ে তাঁর সংগে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর এক কথা, আমি যখন রাজ্যের পালক তখন আমি বৌদ্ধও নই, হিন্দুও নই, আমি সকলের রাজা। আমার রাজকোষে যে অর্থ আসে, তা বৌদ্ধের কাছ থেকেও আসে, হিন্দুর কাছ থেকেও আসে। আর এ অর্থ যখন ব্যয় হয়, সকলের জন্যই ব্যয় হয়ে থাকে।

উত্তরে আপনারা কি বললেন?

আমরা প্রিয়দর্শী অশোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের এই ধর্মই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে মুক্তির প্রকৃত

পথে পরিচালিত করতে পারে। এই সত্যকে সামনে রেখেই প্রিয়দর্শী অশোকের মত ন্যায়নিষ্ঠ মহাপুরুষ সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর রাজ কোষের অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আপনি প্রশ্নটাকে এই দিক দিয়ে ভেবে দেখুন।

কি বললেন তিনি ?

আমাদের এই কথাটাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গিয়ে তিনি তাঁর সেই এক কথাই আঁকড়ে ধরে রইলেন। আমরা জানি, এ কথা তাঁর নিজের কথা নয়, বরাহস্বামী এই কথাটা তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বরাহস্বামীর কাছে তিনি তাঁর নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে আছেন। তাঁর কোন কথা অমান্য করবার মত শক্তি তাঁর নেই, ইচ্ছাও হয়তো নেই। এখন সব কিছু নির্ভর করছে বরাহস্বামীর উপরে। আর তার ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে চলেছে।

প্রিয়রক্ষিত উপগুপ্তের কথার সংগে আর একটু যোগ করে দিয়ে বললেন, মহারাজের সংগে এই আলোচনার কয়েকদিন পরেই বরাহস্বামী আমাদের দুজনকে ডাকিয়ে পাঠালেন।

তারপর ?

তিনি বললেন আমাদের এই রাজ্যে বৌদ্ধ আর হিন্দু পরম শান্তি-তে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে, এর মধ্যে আপনারা বিভেদ-সৃষ্টিকারী এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতিকে এমন করে ঘুলিয়ে তুলবেন না। ভাংগতে পারে সবাই. কিন্তু গড়তে পারে কজন ?

আমরা বললাম, আমাদের এতদিনের এই সমস্ত বিহার রাজকীয় সাহায্যের অভাবে একটির পর একটি নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে। আপনা-রাই বা এটা দেখছেন না কেন ? তা নইলে তো আমাদের এ সমস্ত অপ্রিয় প্রশ্ন তুলতে হোত না।

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, আহা, দেখছি কি আর না, আমাদের চোখ সর্বত্র। কিন্তু কি করব বলুন। সাম্রাজ্যের কি আর সে দিন আছে ? আমাদের সম্পদ যে একেবারেই সীমাবদ্ধ। তবু যেটুকু

আমাদের সম্বল তাই আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি করে খাই। তাতে কারওই হয়তো পেট ভরে না, কিন্তু মনের শান্তি আছে তো, কি বলেন ?

এই রকম অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাদের বিদায় করল।

উপগুপ্ত বললেন, ভণ্ড, বিষম ভণ্ড। মুখে মধু, অন্তরে বিষ। এই কুটিল চক্রী মহারাজকে সামনে রেখে সমস্ত শক্তি নিজের মুষ্টিগত করে রেখেছে। তার ইচ্ছাতেই সব কিছু চলছে।

সুভদ্র তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আর এইটাই আমাদের সহ্য করে চলতে হবে ? আমরা সব কিছুর অধীশ্বর হয়েও এর কাছে উপযাচক হয়ে দিন কাটাব ! কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝি না আমি। আমাদের এই রাজবংশ ধর্মে বৌদ্ধ, কিন্তু নিজের ধর্মের লোকদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিয়োগ করবার দিকে তাঁদের এমন ঝোঁক কেন ?

এ তো শুধু আজকের কথাই নয়, প্রিয়রক্ষিত বললেন, স্বয়ং মহারাজ ধর্মপালদেবের সময় থেকে এই রীতিই তো চলে আসছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি আমি। কিন্তু কেন ? মন্ত্রীত্ব করবার মত উপযুক্ত লোক কি তাঁরা সদ্ধর্মীদের মধ্যে খুঁজে পান নি ? বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা কি ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ? নিজেদের সম্পর্কে এমন হীনমন্যতা কেন ?

হীনমন্যতা ? উপগুপ্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিন্তু জিনিসটাকে ঠিক ও ভাবে দেখি না। পরমভট্টারক মহারাজ ধর্মপালদেব আর দেবপালদেব এই প্রথার প্রবর্তন করে গেছেন। তাঁদের সম্পর্কে ও রকম ধারণা করা চলে কি ? আমার মনে হয়, এর পিছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো দুই সমাজের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন এবং শাসনসৌকর্যের জন্য এই ব্যবস্থাটাই তাঁদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। যতদূর মনে হয়, তাঁদের এই নীতি তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়কই হয়েছিল। সেই থেকে কি

হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই এটাকে একটা মিলিত শাসনব্যবস্থা বলেই মনে করে নিয়েছিল। আর তার ফলে দুটো সমাজ পরস্পর ঘনসম্বন্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ রূপ নিয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রকুট, চালুক্য বা গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীরা এসেছে. তারা সবাই হিন্দু। কিন্তু এখানকার হিন্দুরা বৌদ্ধদের মতই তাদের প্রতিরোধ করে এসেছে। আক্রমণকারীরা হিন্দু বলে স্বধর্মীপ্রীতির কারণে তাদের সংগে তারা হাত মিলিয়েছে, এমন কথা আমরা কোন দিন শুনি নি। আজও যদি বাইরে থেকে কোন আক্রমণ হয়, আজও সেই রকমই ঘটবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একজন একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, তার মানে যেই ব্যবস্থা চলছে তাকেই আপনি সমর্থন করেন?

উপগুপ্ত চমকে উঠে বললেন, সেই কথাই কি বলেছি আমি? পরক্ষণেই আবার যেন নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললেন, রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষার দিক দিয়ে এই নীতির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করতে পারি না আমি। আর হিন্দু মন্ত্রী হলেই যে রাজ্য রসাতলে যাবে, এমন কথাও আমি মনে করি না।

সুভদ্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন, তাহলে এই আদর্শ ব্যবস্থাই চলতে থাক। তাঁর কণ্ঠে শ্লেষের সুর প্রচ্ছন্ন রইল না।

উপগুপ্ত প্রাক্তন ছাত্রের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল কে জানে, সুভদ্রের চোখের পাতা আপনা থেকে নেমে এল।

আমি কি তাই বলছি? উপগুপ্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন, সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগেও গর্গদেব দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রধান অমাত্য ছিলেন। তবে তখনকার দিনের সম্রাটরা প্রধান অমাত্যদের মন্ত্রণা শুনতেন। কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন নিজেরাই। সেই জন্যই তাদের সময় সদ্ধর্মের এমন

প্রসার লাভ ঘটেছিল। কিন্তু এই অধঃপতনের যুগের সম্রাটরা নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ অমাত্যদের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। আর ব্রাহ্মণ অমাত্যরা এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তাদের নিজ সমাজের পুষ্টিসাধনে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। আমাদের দুর্গতির কারণ তো এইখানেই।

অধ্যক্ষ বিনয়পালিত বললেন, আমি এ বিষয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের এ যুগের সম্রাটদের সত্যিকার পরিচয়টা কি—তাঁরা কি সদ্ধর্মী না হিন্দু ?

প্রশ্ন শুনে সবাই চমকে উঠলেন। অধ্যক্ষ প্রিয়রক্ষিত একটু অসন্তোষের সুরে বললেন, এ আপনার কি প্রশ্ন ? এমন একটা কথা আপনার মনে জাগল কেন ?

অধ্যক্ষ বিনয়পালিত উত্তর দিলেন, এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, অনেকেই এ কথা নিয়ে বলাবলি করে থাকে। তারা বলে, আমাদের রাজবংশে পুরুষের পর পুরুষ ধরে বিদেশী হিন্দুরাজগণের কন্যারা পট্টমহাদেবী পদে বৃতা হয়ে আসছেন। তারা প্রশ্ন তুলছে, এই রীতির তাৎপর্য কি আর এর পরিণতিই বা কি ?

কতক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। অধ্যক্ষ বিনয়পালিত তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। অধ্যক্ষ উপগুপ্তের চোখে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। রাজাদের বহু রাণী থাকতে পারে, তবে পট্টমহাদেবীদের কোন এক রাজবংশ থেকে বরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে এই প্রথা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সাধারণ লোকদের বিবাহ আর রাজাদের বিবাহকে এক দৃষ্টি নিয়ে দেখা চলে না। রাজাদের বিবাহের মধ্যে রাজনীতির প্রশ্নও জড়িত থাকে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের উদ্দেশ্যেই হোক বা আত্মরক্ষার জন্যই হোক বা ভারসাম্য রক্ষা করে চলবার জন্যই হোক বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তারা অন্যান্য রাজবংশের সংগে মৈত্রী

স্থাপন করে থাকেন। আমাদের এই রাজবংশে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা এতই বেশী যে তার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অধ্যক্ষ বিনয়পালিত বললেন, আর্য উপগুপ্তের এই কথা মেনে ছিলাম আমি। কিন্তু এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি বিশেষ ভাবে সেই কথাটাই বলতে চাই। আমরা জানি, রাজ অন্তঃপুরে পট্টমহাদেবীদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব! তাঁদের এই অধিকার চির দিন স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্তঃপুরের অনেক ব্যাপারে রাজাদেরও তাঁদের শাসন মেনে চলতে হয়। তার ফলে, এই সমস্ত পট্টমহাদেবীরা রাজ-অন্তঃপুরকে হিন্দুদের আচার-নিয়মে দূষিত করে তুলেছেন। নিয়মিত ভাবে হিন্দুদের পূর্জাচনা, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান চলেছে সেখানে। রাজপ্রাসাদ দেব-দেবী পূজার শংখ ঘণ্টাধ্বনিতে মুখর। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সেখানে ভাল ভাবেই তাদের আসন জাঁকিয়ে বসেছেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে দূর ভাগীরথী নদী থেকে ঘড়ায় ঘড়ায় জল আসছে। যারা রাজ-অন্তঃপুরের খবরাখবর রাখেন, তাঁদের কাছে আরও অনেক কথাই শোনা যায়। আর আমাদের কুমারেরা জন্ম থেকে এই পরিবেশই বর্ধিত হয়ে উঠেছেন। এর ফলাফল কি কখনও ভাল হতে পারে?

কেউ কোন উত্তর দিলেন না। অধ্যক্ষ বিনয়পালিত নিজেই নিজের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, না, কখনও ভাল হতে পারে না। আমাদের রাজাদের আচার-আচরণ থেকেই তা সুস্পষ্ট।

অধ্যক্ষ সুভদ্র বললেন, কথাটা একটু খুলেই বলুন। এখানকার অনেক খবরই আমার জানা নেই। রাজাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগটা কি আপনার?

অভিযোগ কি একটা? এঁরা সবাই তা জানেন।

কিন্তু আমি তো জানি না, আমার জন্যই না হয় বলুন।

বিশেষ বিশেষ পর্বে রাজপ্রাসাদ থেকে প্রকাশ্যে দেবমন্দিরে ভারে ভারে পূজা পাঠানো হয়ে থাকে। কত তার উপকরণ, আর কি

সমারোহ। দেখবার জন্য রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক জমে যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা পূজা পাঠাচ্ছেন হিন্দুদের দেবমন্দিরে। আমরা দেখি না দেখি না করে এড়িয়ে যাই, কিন্তু পথের মানুষ তো আর চোখ বন্ধ করে থাকবে না।

বলেন কি! অধ্যক্ষ সুভদ্র বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন। তার পর অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, এ কি সত্য?

হ্যাঁ সত্য, একজন অধ্যক্ষ উত্তর দিলেন, পট্টমহাদেবী হিন্দু, তিনি পাঠান পূজো, মহারাজ তার কি করবেন?

তিনি কি করবেন? অধ্যক্ষ বিনয়পালিত ফোঁস করে উঠলেন? আমি দেবমন্দিরের পুরোহিতদের কাছে শুনেছি, শুধু পট্টমহাদেবীর নামেই যে সংকল্প হয় তা নয়, স্বয়ং মহারাজের নামেও সংকল্প করা হয়ে থাকে।

যিনি রাজাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বললেন, এই সমস্ত পুরোহিতরা মিথ্যার সাগর। ওদের দেবতাদের গৌরব বাড়াবার জন্য ওরা যে কোন রকম মিথ্যা প্রচার করতে পারে।

বেশ, ওরা মিথ্যার সাগর, ওদের কথা বাদই দিলাম। আর এক কথা বলি, মহারাজার পিতা স্বর্গত মহারাজ যখন রাষ্ট্রকূটনন্দিনী শংখ দেবীকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন, তিনি সস্ত্রীক দেবমন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলেন, হিন্দুদের দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলেন। এ তো আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মিথ্যা প্রচার নয়, বহু লোক তা স্বচক্ষে দেখেছে। ফলে সে কথা আর কারু কাছেই অজানা নয়।

এর ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটল? সুভদ্র প্রশ্ন করলেন।

হিন্দুরা মহাখুশী। সবাই রাজাকে ধন্য-ধন্য করল। আর তারা হাটে মাঠে ঘাটে এই নিয়ে প্রচার করে বেড়াতে লাগল। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ভগবান ওদের মধ্যে শুভ

বুদ্ধি জাগ্রত করেছেন। দু দিন আগে বা পরে হোক একে একে সবাই আমাদের মধ্যে চলে আসবে। আমি স্বকর্ণে এ কথা বলতে শুনেছি।

আর আমাদের সদ্ধর্মীরা? তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল না?

উত্তেজিত? মোটেই না। যদি উত্তেজিত হোত তবে সেটা আনন্দের কথাই হোত। কিন্তু কোথায় উত্তেজনা? দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুদের পাশাপাশি থেকে তাদের মধ্যে অনেকেই ভিতরে ভিতরে হিন্দুমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। এ কথা আগে বুঝতে পারি নি, সেবার ভাল করেই বুঝলাম। ওরা আগে লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দুদের দেবদেবীদের মন্দিরে গিয়ে যে যার কামনা পূর্ণ করবার জন্য মানত করত। পরে রাজার এই সমস্ত কার্যকলাপের কথা শুনে ওদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তারা আগে যেটা গোপনে করত, তখন প্রকাশ্যেই তা করতে লাগল। এ নিয়ে আমাদের ভিক্ষুরা কোন উপদেশ দিতে গেলে তারা সোজা মুখের উপর বলে দিত— দেখুন, আমরা গ্রামাঞ্চলের শান্তিপ্রিয় লোক। আমরা হিন্দু আর বৌদ্ধ পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে আসছি। আপনারা এ সমস্ত কথা বলে আমাদের মধ্যে অনর্থক কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করে তুলবেন না।

অধ্যক্ষ উপগুপ্ত বললেন, ঠিকই বলেছেন আপনি। বৌদ্ধ আর হিন্দুদের মধ্যে যেটুকু বিরোধ তা নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে গেলে দেখবেন সেখানে বিরোধের লেশমাত্র নাই, তারা পরস্পর মিলে মিশে বড় শান্তিতে আছে।

যে শান্তিকে ধর্মের মূল্যে কিনতে হয়, তেমন শান্তি চাই না আমরা। অধ্যক্ষ সুভদ্রের কণ্ঠস্বরে তীব্র উত্তেজনা।

এ কথাটার প্রতিবাদ করবার মত শক্তি কারু ছিল না। শান্তির কথাটা অধ্যক্ষ উপগুপ্তই তুলেছিলেন, তিনি একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

অধ্যক্ষ বিনয়পালিতের বক্তব্য কিন্তু তখনও শেষ হয় নি। তিনি বলছিলেন, লোকের মুখে শুনি মহারাজ নাকি ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়ে পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করান। এ উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। এ সব ব্যাপারে ভিক্ষুরা সব সময়ই অবহেলিত হয়ে আসছে।

অধ্যক্ষ সুভদ্র অধৈর্যের সুরে বলে উঠলেন, থাক, থাক, আর শুনতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে। বিনয়পালিত আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা পেয়ে থেমে গেলেন। সুভদ্র বলে চললেন, একটা কথা জানতে চাই আপনাদের কাছে। আপনারা বলছেন, সদ্ধর্মীদের উপর হিন্দুদের দূষিত প্রভাব এসে পড়ছে। কিন্তু এর বিপরীতটা লক্ষ্য করেছেন? হিন্দুদের মধ্যে সদ্ধর্মের প্রভাব পড়ছে না? হিন্দুদের মধ্যে সদ্ধর্মে আশ্রয় নেবার প্রবণতাই বা কেমন?

সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। অধ্যক্ষ প্রিয়রক্ষিত ধীর স্বরে বললেন, আপনি সংগত প্রশ্ন তুলেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যতটা অনুভব করতে পারছি, তাতে মনে হয়, এখানকার এই দুই সমাজের মধ্যে যেন ধারাবাহিক ভাবে একটা অদৃশ্য ও অহিংস প্রতিযোগিতা চলে আসছে। সেই প্রতিযোগিতায় আমরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছি, আর পর-ধর্মের রীতিনীতি, আচার-আচরণ একটু একটু করে আমাদের সমাজে স্থান করে নিচ্ছে। আপাত-দৃষ্টিতে তা অতি সামান্য বলে মনে হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে এটা খুবই দুর্লক্ষণ। আমাদের এই মহাধর্মের প্রভাব সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এখানে রাজধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তার গতি পশ্চাৎমুখী, এটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি শোচনীয়। এই সমস্যা আমার মনকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে তুলেছে, সেই জন্যই আপনাদের সবাইকে আহ্বান করেছিলাম।

অধ্যক্ষ সুভদ্র বললেন, অধ্যক্ষ বিনয়পালিত সত্য কথাই বলেছেন। আমিও মনে করি রাজপ্রাসাদই এ জন্য মূলত দায়ী। আর রাজাকে

সামনে রেখে ব্রাহ্মণ অমাত্যেরা আর তাদের দলবল নানা অপকৌশলে সদ্ধর্মের মূলোচ্ছেদ করবার জন্য দীর্ঘকাল ষড়যন্ত্র করে আসছে।

যথার্থ বলেছেন, বেত্রবতী বিহারের অধ্যক্ষ ভদ্রশীল তাঁর এই কথার সজোর সমর্থন জানালেন। সুভদ্র তাঁর কথার জের টেনে চললেন, আমার সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের রাজারা পিছন থেকে এই ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা চার দিক দিয়ে পরধর্মীদের দ্বারা পরিবৃত। ওরা চাইছে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। শুনেছি বরাহস্বামী এখানকার প্রাচীন অধিবাসী নন। তাঁর পূর্ব নিবাস কোথায়?

একজন উত্তর দিলেন, চেদীরাজ্যে।

হুঁ। স্বর্গীয়া রাজমাতা?

তিনিও চেদীরাজবংশের মেয়ে।

রামপালদেবের জননী?

শংখদেবী? তিনি রাষ্ট্রকুটনন্দিনী।

তবেই দেখুন, ওরা কি ভাবে ওদের ক্ষমতার জাল প্রসারিত করে দিয়েছে। আর আমরা নির্বোধের দল সেই জালে দিন দিনই বেশী করে জড়িয়ে পড়ছি। আপনারা বলেন, আমাদের রাজারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যবর্গের সংগে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য বিদেশিনী হিন্দু রাজকন্যাদের পট্টমহাদেবীর আসন দিয়ে আসছেন। কিন্তু আমরা তাতে কোন্ দিক দিয়ে লাভবান হয়েছি, বলতে পারেন? আপনারাই বলছেন, সমস্ত সুযোগ আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও সদ্ধর্মের নির্মল জ্যোতি আজ কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অন্য দিকে আমাদের বিরাট সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আজ পিছোতে পিছোতে আমাদের গৃহদ্বারের কাছেই এসে পৌঁছেচে। এ তো প্রত্যক্ষ, কারু বলাবলির অপেক্ষা করে না।

উপগুপ্ত অনেকক্ষণ কোন কথা বলেন নি। সুভদ্রের কথার উত্তরে

এবার তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, আমি তাকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। তেমন কোন প্রমাণ হাতে না থাকলেও এ রকম একটা সন্দেহ স্বভাবতই আমাদের মনে জাগতে পারে। একটা সত্যকে কিছুতেই ভুললে চলবে না, এই হিন্দুরা এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মূঢ় ও কুসংস্কারচ্ছন্ন, অপরপক্ষে এদের ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত কৌশলী। যে কোন সুযোগকে অবলম্বন করে ওরা আপনাদের শক্তিবৃদ্ধি করে নেয়। এ ব্যাপারে ওদের নীতিজ্ঞান অদ্ভুত রকম নমনীয়।

সুভদ্র প্রশ্ন করলেন, এরা মূঢ় এবং কৌশলী, এই দুটো কথা কি একই সংগে সত্য হতে পারে?

উপগুপ্ত উত্তর দিলেন, চূড়ান্ত সত্য না হলেও আংশিক ভাবে এবং সাময়িক ভাবে সত্য। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বরেন্দ্রীভূমিতে কৈবর্ত ও কোচদের মধ্যে আমরাই প্রথম ধর্মপ্রচার শুরু করি। আমরা প্রথমে ওদের মিথ্যা দেবতা ও ভ্রান্ত সংস্কারগুলোকে অপসারিত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম, চাইলাম ওদের মনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে। আমি মনে করি এটাই একটা শুদ্ধ পথ। এর এল হিন্দু প্রচারকেরা। তারা কিন্তু আমাদের এই পথ দিয়ে গেল না, ওরা ওদের নিজস্ব পথ ধরল। ওদের যে সমস্ত আদিম দেবদেবী ও ধর্মস্থান ছিল, হিন্দু প্রচারকেরা স্বচ্ছন্দে তাদের স্বীকার করে নিয়ে সেইখানেই তাদের বসবার জায়গা করে নিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের উপর হিন্দুয়ানীর রং লাগিয়ে নিঃশব্দে আত্মসাৎ করে নিল তাদের। দেবদেবীর সংগে সংগে তাদের পূজকরাও দলে দলে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে লাগল।

সুভদ্র বললেন, আপনার এই কথা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। সিংহল থেকে ফিরবার সময় পদব্রজে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে এসেছি। সেখানকার কোন কোন জায়গায় হিন্দুদের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। তাদেরই এক সম্প্রদায়

ভগবান বুদ্ধকে তাদের আরাধ্য বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচার করছে। ভগবান বুদ্ধের জীবন নিয়ে নানারকম অলৌকিক কাহিনী রচনা করে চলেছে তারা। বহু অনুসন্ধান করেও এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলাম না। শেষে ভাবলাম, অমিতাভের উজ্জ্বল জ্যোতি —সেই অন্ধকার ভেদ করে তাদের অন্তর্লোকেও গিয়ে পৌঁছেচে, এ বুঝি তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটাকে আবার নতুন ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

উপগুপ্ত ম্লান হাসি হেসে বললেন, শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, এই প্রচার এখানেও এসে পৌঁছেচে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম একটা কথা আমাদের কানেও এসেছে, দু তিনজন সমর্থন করে বললেন।

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ কৈবর্ত আর কোচদের মতই বৌদ্ধদেরও ফাঁদে ফেলবার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এক নতুন জাল পাতা হয়েছে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই মহর্ষি বেদ-ব্যাসরচিত বুদ্ধপুরাণ আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। বৌদ্ধদের মধ্যে সরলমনা যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে এই ফাঁদে পা দেবে না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

একজন পরিচারক এসে সংবাদ দিল, ভিক্ষু ত্রিশরণ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। কি একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চান তিনি। ভিক্ষু ত্রিশরণ অধ্যক্ষ প্রিয়রক্ষিতের অত্যন্ত অনুরক্ত ও প্রিয় শিষ্য। প্রিয়রক্ষিত বললেন, যাও, এখানেই নিয়ে এসো তাকে।

ত্রিশরণ এখানকারই প্রাক্তন শিক্ষার্থী। পরিচারকের মুখে আহ্বান পেয়ে তিনি কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

বোসো, বোসো। অনেকক্ষণ ধরে নাকি বসে আছ। আগে খবর দাও নি কেন? আর খবর দেবার দরকারটাই বা কি, সোজা চলে এলেই তো পারতে। তুমি তো আমাদের এখানকারই একজন।

তোমার আবার সংকোচ কিসের ?

না, না, সংকোচ নয়, ত্রিশরণ সবিনয়ে বললেন. আপনারা ব্যস্ত ছিলেন তাই— আমি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এসেছি, সেই জন্যই বাধ্য হয়ে খবর পাঠালাম।

কি বলতে এসেছ বল।

ত্রিশরণ একটু অস্বস্তির সংগে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তার মনোভাবটা বুঝতে পেরে প্রিয়রক্ষিত প্রশ্ন করলেন, কি একান্তে বলতে চাও কিছু ? বেশ তো, বাইরে চল।

দুজনে কক্ষের বাইরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। ভিতরে এসে প্রিয়রক্ষিত বললেন, তোমার যা কিছু বলবার আছে এঁদের সামনেই বল। এরা আমাদের নিজেদের লোক, এঁদের কাছে সব কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

রাজসভার বিশিষ্ট সভাসদ অধিরথ ত্রিশরণ মারফৎ প্রিয়রক্ষিতকে গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন। অধিরথ জানিয়েছেন, রাজার বিরুদ্ধবাদী যেই দলটা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে শূরপালদেব বা রামপালদেবকে সিংহাসনে বসাতে চায়, তারা অধিরথের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে যে বৌদ্ধেরা যেন তাদের পক্ষে থাকে। অধিরথ এখনও তাদের কাছে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। তবে তিনি এবং বৌদ্ধ সমাজের অন্যান্য নাগিকরা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে আগ্রহশীল। তার কারণ রাজা মহীপালদেবের শাসনের অর্থ বরাহস্বামীর শাসন। আর বরাহস্বামী যত দিন এই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন সর্ব ব্যাপারেই তিনি সদ্ধর্মীদের কোণঠাসা করে রাখতে চাইবে। রাজা মহীপালদেব যে কোনদিন এই দুষ্টগ্রহের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবেন, তার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। যে কোন ভাবেই হোক বরাহস্বামীর পতন ঘটাতেই হবে। কিন্তু রাজা মহীপালদেব সিংহাসনে থাকতে সে আশা বৃথা। সেই জন্যই এই রাজবিদ্রোহীদের সংগে যোগ দেওয়াটাকে তাঁরা

সর্বোত্তম পন্থা বলে মনে করেন। এমন সুযোগ তো সব সময় আসে না। এ বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত। কিন্তু তা হলেও তাঁদের সিদ্ধান্ত ধর্মীয় নেতাদের অনুমোদন সাপেক্ষ। তাঁদের অনুমতি ছাড়া তাঁরা এ কাজে কখনোই হাত দিতে পারেন না। বৌদ্ধদের ভিতরকার সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতারা যদি মিলিত ভাবে এই নির্দেশ দেন, তাহলে সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরাই তা মেনে চলবে। ভিক্ষু ত্রিশরণের মুখে অধিরথ-প্রেরিত এই প্রস্তাবটা শুনবার পর অধ্যক্ষদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে ছুটো একটা কথা শোনা গেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্তই উড়ো কথা, কেউ তাকে তেমন আমল দেয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে শুনে সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এক জন বললেন, ঠিক বলেছেন অধিরথ, এমন সুযোগ আমাদের কখনোই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

প্রিয়রক্ষিত কিন্তু একটু বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, সিংহাসন নিয়ে এই কাড়াকাড়ির ব্যাপারে আমাদের কোন্ পক্ষে যাওয়াটা সংগত হবে কি? তা ছাড়া শূরপালদেব বা রামপালদেব যে মহীপালদেবের নীতি অনুসরণ করে চলবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

সুভদ্র বললেন, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। কিন্তু তবু মানুষ পরিবর্তন চায়। আর এ কথাও ঠিক রাজা মহীপালদেবের পতন ঘটাতে পারলে বরাহস্বামী প্রাণে যদি বাঁচেও, তাকে এ দেশ ছেড়ে তার স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। সেটাই হবে আমাদের প্রধান সাফল্য।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, তিনটি কণ্ঠ একই সংগে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

উপগুপ্ত হেসে বললেন, আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে দিচ্ছে কে? শেষ পর্যন্ত একটা পক্ষকে মেনে নিতে হবেই। তার চেয়ে সময় থাকতে, সুযোগ থাকতে সব দিক চিন্তা করে একটা পক্ষ বেছে নেওয়াই ভাল। কিন্তু আমরা বাছবই বা কেমন করে? আমরা

শূরপালদেবকে যেমন চিনি, রামপালদেবকেও তেমনি চিনি। কে কেমন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের কাজের মধ্য দিয়ে।

সুভদ্র একটা প্রস্তাব দিলেনঃ শূরপালদেব ও রামপালদেব দুইজনের কাছ থেকেই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হোক যে তাদের ব্রাহ্মণ অমাত্যের পরিবর্তে বৌদ্ধ অমাত্য নিয়োগ করতে হবে। অনেক দিন ধরেই তো আমরা ব্রাহ্মণ অমাত্যদের কার্যকলাপ দেখে এলাম, এবার একটু পরিবর্তন চাই। দুইজনের কাছ থেকেই আমরা এই নিশ্চয়তা দাবী করব।

একমাত্র সুভদ্র ছাড়া আর সবাই হেসে উঠল। উপগুপ্তও হেসে বললেন, তা আর কেমন করে হবে? ওরা দুইজনেই যে কারাগারে। তাদের কাছ থেকে কেমন করে প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করা যাবে?

তা বটে, একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন সুভদ্র, কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, তবে একটা কাজ করা যেতে পারে, যারা এই প্রস্তাবটা পাঠিয়েছে তাদের কাছ থেকেই এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেওয়া হোক। আপনারা বলে পাঠান, আমাদের এই সামান্য শর্তটুকু প্রতিপালিত না হলে আমরা তাদের সংগে কোন মতেই যোগ দিতে পারব না।

এই নিয়ে কিছুক্ষণ মতামত বিনিময়ের পর অবশেষে সবাই একমতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তার পরেও একটা জায়গায় প্রশ্ন থেকেই গেল। প্রিয়রক্ষিত বললেন, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু যাদের এত চেষ্টা করেও এক জায়গায় জড় করতে পারা গেল না আমরা কেমন করে তাদের এক মতে নিয়ে আসব? এর জন্য হয় তো প্রত্যেক অধ্যক্ষের সংগে বিস্তারিত আলাপের প্রয়োজন হবে।

সুভদ্র বললেন, এ কাজ যত কঠিনই হোক না কেন করতেই হবে আমাদের। আপনারা যদি বলেন, আমি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সংগে আলাপের দায়িত্ব নিতে রাজী আছি।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হোল। ভিক্ষু ত্রিশরণ এই সংবাদ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য চলে গেলেন।

ছয়

বহু বাক্য-বিনিময়ের পর পদ্মনাভকে শেষ পর্যন্ত বরাহস্বামীর অনুরোধের কাছে হার মানতে হয়। অনুরোধও বটে, কিছুটা আদেশও বটে।

পদ্মনাভ বরাহস্বামীর শিষ্য। গুরুর অনুরোধ আর আদেশ এই দুইয়ের মধ্যে বেশী দূর পর্যন্ত পার্থক্য টেনে চলা যায় না। তা হলেও পদ্মনাভ তাঁর যথাসাধ্য আপত্তি জানিয়েছেন। বলেছেন, আমাকে দয়া করে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন। আমার এ সব ভাল লাগে না, আর পারিও না আমি। আমি আমার পুরানো সেই অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার কাজে ফিরে যেতে চাই।

কিন্তু বরাহস্বামী তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে রাজী নন। মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে যে কোন লোককে বসিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পদ্মনাভ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, কর্মঠ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসী।

কোন কোন বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের দিকে টেনে রাখতে পারবেন, বরাহস্বামীর এ বিশ্বাস আছে। একধারে এতগুলো গুণ সুলভ নয়। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড় নরম, আর তাঁর নীতিজ্ঞানটা প্রখর। মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কাজের পক্ষে এর কোনটাই উপযুক্ত নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ত্রুটিটা সামলে নেবার জন্য তো তিনি নিজেই আছেন। পদ্মনাভ তাঁর সংগে পরামর্শ না করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন না।

পদ্মনাভ বলেছিলেন, এ আমার ধাতে সয় না। তা ছাড়া এ সব কাজে আমার চেয়েও অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁদের কাউকে এই পদে নিয়োগ করুন।

বরাহস্বামী এই আপত্তিটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন—ধাত? 'ধাত' বলে অপরিবর্তনীয় কোন কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। দু বছর আগে প্রথম যখন তোমাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়, তখন এই 'ধাত'-এর প্রশ্ন তুলে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই আপত্তিতে আমি কান পাতি নি। এখন তাঁরাই স্বীকার করছেন যে, সেদিন লোক-নির্বাচনে আমিই নির্ভুল ছিলাম। আর অভিজ্ঞতার কথা বলছ? অভিজ্ঞতা একটা বড় গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র অভিজ্ঞতার জোরে সব কিছু হয় না। আবার কখনও কখনও এও দেখা যায় যে, এই অভিজ্ঞতাই সঠিক পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর দৃষ্টান্ত আমাদের এখানেই অনেক দেখেছি। কোন কোন অভিজ্ঞ লোক বহু দিন ধরে অভ্যস্ত পথে পথে চলতে চলতে একটা নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে এমন ভাবে আটকা পড়ে যায় যে, পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রুততার সংগে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অবস্থাবিশেষে যে অভিজ্ঞতা এক দিন গুণ ছিল, শেষকালে তাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সাম্রাজ্যের নানা দিক দিয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার সংগে মানিয়ে চলবার জন্য নূতন দৃষ্টি আর নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন। সে বিষয়ে তুমি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ।

পদ্মনাভ যুক্তিতর্কের পাশ কাটিয়ে অন্য পন্থা ধরলেন, সভার প্রাচীন সদস্য অধিরথ এ ব্যাপারে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে যোগ্যতর! এই পদে তাঁকেই নিয়োগ করুন না কেন?

বরাহস্বামী তাঁর এই প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবলেন, শেষে বললেন, না না, সে হয় না।

কেন, হয় না কেন?

কেন হয় না? সরল শিশুর মত এমন একটা প্রশ্ন তিনি পদ্মনাভের কাছ থেকে আশা করেন নি।

একটু ঝাঁঝালো সুরে উত্তর দিলেন তিনি, না হয় না, তিনি যে বৌদ্ধ।

পদ্মনাভ এই উত্তর শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বাকী রইল না বরাহস্বামীর। তাঁর নির্বিকার কঠিন চিত্ত, কিন্তু এবার তার মধ্যেও একটু বিকারের লক্ষণ দেখা গেল। সহজ সত্যটা সোজা করে বলতে পারলেন না, একটু ঘুরিয়ে বলতে হোল—আদর্শ আর চিন্তার দিক দিয়ে ওদের সংগে আমাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রধান অমাত্য আর মহাসান্ধিবিগ্রহিকের চিন্তার মধ্যে যদি মূলগত অনৈক্য থাকে, তবে পদে পদে বিরোধ ঘটতে থাকবে, কাজ এগোবে না।

যে ভাবেই বলুন না কেন, তাঁর কথার প্রকৃত মর্ম জলের মতই প্রাঞ্জল। পদ্মনাভের মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে পড়ল—কিন্তু আমাদের মহারাজ নিজেই তো বৌদ্ধ সেজন্য কই, কাজের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো।

বরাহস্বামী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

কেন স্বতন্ত্র, কোন্ দিক দিয়ে স্বতন্ত্র, সে কথাটা কিন্তু অনুক্তই থেকে গেল। বরাহস্বামী সেদিনকার মত ওইখানেই আলাপের ছেদ টেনে দিলেন।

কিন্তু গুরুর কবল থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠল না। নিজের এই দুর্বলতা সম্পর্কে পদ্মনাভ অচেতন নন, কিন্তু তবু তাঁকে বার বার এই দুর্বলতার হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। এক দিন বরাহস্বামী বলেছিলেন, যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন তুমি তোল ওগুলো কোন কাজের কথা নয়। আসল কথা, এ সব কাজে তোমার তেমন রুচি নেই। কিন্তু জাতির কল্যাণের প্রশ্নে ব্যক্তিগত রুচি অরুচির কোন কথাই উঠতে পারে না।

জাতির কল্যাণ? এ জাতি কোন্ জাতি—চেদী, হিন্দু না সাম্রাজ্যের সকল মানুষ? এই প্রশ্নটা নিতান্ত অস্পষ্ট আকারে হলেও তাঁর মনের মধ্যে একবার মাথা তুলে উঠেছিল, কিন্তু বরাহ-স্বামীর কথার স্রোতে তা ভেসে গেল।

কিছু দিন ধরে বরেন্দ্রী থেকে নানা রকম দুঃসংবাদ আসছে। কোনটা সেখান থেকে প্রেরিত দূতের মুখে, কোন কোনটা আবার লোকের মুখে মুখে নানা ভাবে শাখাপত্রপল্লবিত হয়ে। সব কথা বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ব্যাপারটা যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

আমি নিজে এক বার গিয়ে দেখে আসি, পদ্মনাভ প্রস্তাব করলেন।

না না, তোমার গিয়ে কাজ নেই, বরাহস্বামী দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানালেন। পরক্ষণেই পদ্মনাভের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু নরম সুরে বললেন, সেটা নিরাপদ নয়। এই গোলমেলে অবস্থায় তোমাকে সেখানে যেতে দিতে আমার সাহস হয় না।

নিরাপত্তার কথাটা আসল কথা নয়। এ অবস্থায় পদ্মনাভের উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। স্বাভাবিক অবস্থায় পদ্মনাভ অনেক ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু যে অবস্থায় কঠিন হস্তে দমনই হচ্ছে একমাত্র পথ, সেখানে পদ্মনাভ নরম নীতি অনুসরণ করে চলবে, এ ভয়টা তাঁর পুরো মাত্রায় আছে। ইতিপূর্বে পদ্মনাভ তাঁকে সেই রকম পরামর্শ ই দিয়েছিলেন।

পদ্মনাভ কিছু বলবার আগেই তিনি আবার বললেন, তা ছাড়া এ সব ক্ষেত্রে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে যে সব রাজপুরুষেরা ও সৈন্যেরা নিয়োজিত আছে, এ অবস্থায় তারাই হচ্ছে সব চেয়ে উপযুক্ত লোক।

কিন্তু দেখেছেন তো, ওরা অবিলম্বে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাবার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছে।

হ্যাঁ দেখেছি। একটুতেই ভয় পেয়ে যায় ওরা। ওদের হাতে সৈন্য তো বড় কম নেই। তবু আমি পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। কিছু অশ্বারোহী সৈন্যও ওদের কাছে আছে। এই তো যথেষ্ট। এখান থেকে আর অশ্বারোহী সৈন্য পাঠানো চলবে না। সেনাপতি এই অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিকই বলেছেন তিনি। আমি এ বিষয়ে তাঁর সংগে সম্পূর্ণ একমত। বরেন্দ্রীতে এ রকম গোলযোগ মাঝে মাঝেই দেখা দেয়। একটু ভাল হাতে মার খেলে দু-দিন বাদে আপনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আসল ভয় রাজধানীতে।

পদ্মনাভ মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, আপনি ওখানকার ব্যাপারটাকে একটু ছোট করে দেখছেন। যে সমস্ত খবর আসছে—

হ্যাঁ, তাও শুনেছি, কিন্তু খবরগুলো বড় বেশী অতিরঞ্জিত হয়ে আসছে। সামন্তরাজ দিব্বোকের সংগে আমার সব সময় সরাসরি যোগাযোগ চলছে। আসল কথা কি জান, অজন্মা এবং আরও নানা কারণে ওখানকার কয়েকটা অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। তারই ফলে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ চলছে। আর এই সুযোগে যত সব বজ্জাত, বদমাস আর স্বভাব দুর্বৃত্তের দল ওদের সংগে ভিড়ে গেছে। আগামী ফসলটা উঠলে অবস্থা এমনিতেই শান্ত হয়ে আসবে।

পদ্মনাভ কিন্তু কথাটা এত সহজে মেনে নিতে পারলেন না, বললেন, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, বেছে বেছে বহিরাগতদের উপরেই হামলা হচ্ছে। এর তাৎপর্যটাই বা কি?

ওখানে বহিরাগতরাই যে সবচেয়ে সম্পন্ন লোক। তা ছাড়া গৌড়ীয় বণিকদের বিরাট বিরাট ধানের গোলাগুলো ওদের লুব্ধ দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। হামলা তাদের উপর হবে না তো কার উপর হবে।

কিন্তু ওরা যে আমাদের সৈন্যদের দুটো স্কন্ধাবার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, এ কথাটা তো অতিরঞ্জিত নয়।

বরাহস্বামী বললেন, সৈন্যদের সংগে ওদের সংঘর্ষ তো কিছুটা বাধবেই। ইতিপূর্বে উপদ্রুত অঞ্চলের কয়েকটা গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। ওরাও সুযোগ পেয়েছে, আর তার প্রতিশোধ নিয়েছে। আমার তো মনে হয় আমাদের অপদার্থগুলো নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছিল। তা না হলে এমন কখনও হতে পারে! এই শিক্ষাটুকু পেয়ে ভালই হয়েছে। এর পর থেকে সাবধান হয়ে চলবে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করে পদ্মলাভ শিউরে উঠে বললেন, এ ভাবে গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া— এ কি আপনি সমর্থন করেন?

বরাহস্বামী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, নিশ্চয় করি। এখান থেকে সেই রকম নির্দেশই তো ওরা পেয়েছিল।

কিন্তু এর পরিণতি কোন্ দিকে চলেছে?

নিঃসন্দেহে শান্তির দিকে, বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, শান্তি ভংগ করলে কঠোর হস্তে দমননীতি চালাতেই হবে। তা না হলে রাজা, রাজপুরুষ আর সৈন্যদল থাকার সার্থকতাটা কি? তাদের দণ্ড সক্রিয় আছে বলেই শান্তি বজায় আছে।

পদ্মনাভ নিঃশব্দ হয়ে রইলেন। বোধহয় গুরুর এই গুরুপাক কথাগুলো হজম করবার চেষ্টা করছিলেন। বরাহস্বামী হেসে বললেন, তুমি একটু বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। তার কারণ তুমি শুধু এক ধরনের খবরই পেয়ে আসছ।

আমার তো খুবই মনে হয় সেখানকার অযোগ্য রাজপুরুষেরা নিজেদের অকর্মণ্যতাকে ঢাকা দেবার জন্য খবরগুলোকে অতিরঞ্জিত

করে পাঠাচ্ছে। দিব্বোকের কাছ থেকে আমি নিয়মিত ভাবে যে সমস্ত সংবাদ পাচ্ছি, তাতে এমন আতংকিত হবার কোনই কারণ নেই। এই অশান্তি সমস্ত বরেন্দ্রী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নি। যেখানে যেখানে খাদ্যাভাব বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, এ সমস্ত হাংগামা সেই সমস্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কৈবর্তদের মধ্যে যে ক'জন ভূম্যধিকারী বা সামন্ত আছে, তারা সবাই রাজার প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন এবং তারা নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার কাজে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছে।

বরাহস্বামী সমস্ত ব্যাপারটাকে জলের মত সহজ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু পদ্মনাভের মন এত সহজে তা মেনে নিতে চাইছিল না। তিনি বললেন, সামন্ত দিব্বোক যে সমস্ত সংবাদ পাঠাচ্ছেন, আপনি কি তার সবটাই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন?

কেন করব না?

সামন্ত দিব্বোক যে দুদিকে দু-রকম খেলা খেলছেন না, এমন কথা কি নিশ্চিত ভাবে বলা চলে? কে জানে আমাদের দিয়েও তিনি হয়তো খেলাচ্ছেন।

এ কথাটা তুমি আরও একদিন আমায় বলেছ। কিন্তু বর্বর কৈবর্তের কাজ এতটা কূট বুদ্ধি আশা করা যায় না। ওটা তোমার অতিরিক্ত কল্পনা।

আপনি কি তাই মনে করেন? পদ্মনাভ বলে চললেন, দিব্বোক সম্পর্কে আমার ধারণা কিন্তু আপনার সংগে মিলছে না। আমি তার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, তা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

হ্যাঁ, বুদ্ধিমান তিনি ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিমান হলেও সরল প্রকৃতির লোক। এটা ওদের জাতের ধর্ম। ওদের বুদ্ধির একটা স্বভাবজাত সীমাবদ্ধতা আছে।

শুধু তাই নয়, আরও জানি গৌড়ের সম্রাটদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে বহু অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে আছে।

সে কথা তুমি কেমন করে জানলে? বরাহস্বামী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

প্রথম বার যখন বরেন্দ্রীতে যাই, তাঁর ওখানেই ছিলাম। তখন তিনি আমাকে মন খুলে অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। সে কথা-গুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। তখন দেখেছিলাম, ওখানকার লোকদের কাছে কি আশ্চর্য রকম জনপ্রিয় তিনি।

সে কথা সত্য, বরাহস্বামী স্বীকার করলেন। সেই জন্যই তো নিশ্চিন্ত আছি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের পক্ষে আছেন, বরেন্দ্রী সম্পর্কে আমাদের ভয় করবার মত কিছু নেই।

আর যদি পক্ষে না থাকেন? তা হলে?

না, সে রকম সন্দেহ করবার মত কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। ওদের সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে আমার।

পদ্মনাভ মৃদু হেসে বললেন, একটু আগেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে কথা আপনি বলছিলেন আমি সেই কথাটাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—কোন কোন অভিজ্ঞ লোক অভ্যস্ত পথে চলতে চলতে একটা নির্দিষ্ট খাতে এমন ভাবে আটকা পড়ে যায় যে, পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রুততার সংগে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এক যুগ আগে কৈবর্তরা যেমন ছিল, আজও কি তাই আছে? পরিবর্তন সবারই আছে, শুধু কি কৈবর্তদেরই নেই?

বরাহস্বামী উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন, আমার অস্ত্রে আমাকেই ঘায়েল করতে চাও? তোমার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করি। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মনে করে রেখেছ। তোমার এই সন্দেহ তোমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। কিন্তু এই সন্দেহ প্রবৃত্তিটাকে বল্গাহীন ভাবে ছেড়ে দিতে পার না, একটা জায়গায় গিয়ে

তোমাকে থামতেই হবে। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, যদিও আমি বিশ্বাস করি দিব্বোক সম্পর্কে আমার ধারণাটা সঠিক, তবু সতর্কতা হিসাবে একটা ব্যবস্থা রেখেছি আমি।

ব্যবস্থা? কি ব্যবস্থা?

তার নিজস্ব এলাকাতেই একটি সৈন্যের ঘাঁটি স্থাপিত আছে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষের উপর দিব্বোকের গতিবিধি ও কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে। তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি দিব্বোক সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করবার কোনই কারণ নেই, তিনি আমাদেরই লোক। এবার বুঝতে পারছ তো, বরেন্দ্রী সম্পর্কে আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, তার সংগত কারণ আছে। কিন্তু আমার আশংকা এখানকার অবস্থা নিয়ে।

অবস্থাটা কি এতই আশংকাজনক বলে মনে করেন? পদ্মনাভ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মথনদেব বড় বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত চাপা, সন্দেহ করবার সুযোগটুকু দিতে চান না। কিন্তু এবার তিনিও যেন আপনাকে চেপে রাখতে পারছেন না। আর ঠিক এমনি সময়ে সভার বিশিষ্ট সদস্য অধিরথ রাজধানীতে অনুপস্থিত।

কোথায় তিনি?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে গিয়েছেন। এ সময়টা ফসল ওঠার সময় কি না, তাই। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে সময়টা অস্বাভাবিক কিনা, তাই সামান্য জিনিসকেও অসামান্য বলে মনে হয়।

মথনদেবের সংগে অধিরথের সম্বন্ধটা কি? পদ্মনাভ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, সম্বন্ধ ছিল না জানি। কিন্তু হয়ে যেতে কতক্ষণ? বিশেষ করে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত

আছে। পক্ষকাল পূর্বে সোমপুর বিহারে অন্যান্য বিহারের অধ্যক্ষেরা একত্রে মিলিত হয়েছিলেন, এ খবরটাও শোনা গেছে। তারই বা তাৎপর্য কি?

তাৎপর্য? এর আবার তাৎপর্য কি। এ তো নতুন কথা নয়। বিহারের পরিচালনা সম্পর্কে পরস্পর মতামত আদান প্রদানের জন্য অধ্যক্ষেরা মাঝে মাঝে মিলিত হন। এই রীতি বহু কাল থেকেই চলে আসছে।

বরাহস্বামী চিন্তিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তুমি। এটা নতুন কিছু নয়, সেটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু বহু দিন বাদে ওরা সেদিন মিলিত হয়েছিলেন, সেই কথাটাই ভাবছি।

বহু দিন ধরে মিলিত হন নি, সেই জন্যই হয় তো মেলাটা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাও বলতে পার, বরাহস্বামী হেসে বললেন। কিন্তু মনে যদি একবার সন্দেহ জাগে, তখন সব কিছুই যেন বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এমনিতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে গেলে ঘটনাগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই, কিন্তু একটা দুর্যোগের মুখে এই ধরনের কতগুলো ঘটনার সমাবেশ ঘটলে সন্দেহের সৃষ্টি করে তোলে। আচ্ছা, সে কথা থাক। এখন বল আমাদের পশ্চিমাঞ্চলের সামন্ত-রাজদের মনোভাবটা কি? মথনদেবের দলবল যদি সত্যসত্যই শক্তি পরীক্ষায় নামে, তা হলে এরা কোন্ পক্ষে যোগ দেবে?

পদ্মনাভ উত্তর দিলেন, সেটা সুনিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। এরা মুখে বলছে, রাজ্যের মধ্যে কোন রকম আভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিলে বা বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে রাজার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা তাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়। কোন কোন সুযোগসন্ধানী সামন্তরাজ এই সুযোগে স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখছে, এ কথাও শোনা যায়। তবে আমার ধারণা এদের

মধ্যে অধিকাংশ প্রথম অবস্থায় নিরপেক্ষ হয়ে অবস্থার গতি পর্যবেক্ষণ করবে। তার পর যে পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা দেখবে, সেই দিকে যোগ দেবে।

বরাহস্বামী বললেন, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আবার এও হতে পারে, এই শক্তি পরীক্ষায় চূড়ান্ত পরিণতি এদের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। শুনেছি, বেশ কিছু দিন থেকে মথনদেবের চরেরা এই সব সামন্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তারা তাদের কাজে কতটা সাফল্য লাভ করেছে, এখনও তা বলা সম্ভব নয়।

পদ্মনাভের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললেন, একটা কথা বলা হয় নি আপনাকে। কয়েক দিন আগে একটা খবর পেলাম। এ খবরের কোন গুরুত্ব আছে কিনা আপনি ভেবে দেখুন।

বরাহস্বামী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

আমার পরিচিত এক বণিক তার মৃত পিতার পিণ্ডদান করতে গয়ায় গিয়েছিল। ফেরার সময় পীঠিনগরের মহেশের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিল। পীঠির রাজপথ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল দিব্বোকের ভাই রুদোকের সংগে।

রুদোককে কেমন করে চিনল? বরাহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

বণিক মধুদত্ত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কিছু কাল বরেন্দ্রীতে ছিল, রুদোককে সে ভাল করেই চেনে।

বেশ তো, রুদোককে যদি সে দেখেই থাকে, হয়েছে কি তাতে? পীঠিতে কিছু কিছু কৈবর্তের বসতি আছে। যেতেও পারে সেখানে।

পদ্মনাভ বললেন, তা পারে, মানলাম। কিন্তু কথা সেটা নয়। রুদোক একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সংগে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মধুদত্তের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে কোন কথা না বলে রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোধহয় সে মনে করেছিল যে মধুদত্ত তাকে দেখতে পায় নি। মধুদত্ত দ্রুত পদে সেই সুবেশ সম্ভ্রান্ত লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্র, আপনি আপনার

যে সংগীটির সংগে কথা বলছিলেন, তিনি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন ?

লোকটির স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, তোমার চোখে কোন দোষ আছে নাকি হে ?

মধুদত্ত হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, কই না তো, আমার চোখে কোন দোষ নেই।

চোখে দোষ নেই, তবে বলছ কি এ সব ? আমার সংগী আবার কে, আমি তো একাই যাচ্ছিলাম। কোন্ দেশের মানুষ তুমি ?

মধুদত্ত উত্তর দিল, আমি গৌড়ের অধিবাসী।

হুঁ, যা ভেবেছি তাই। গৌড়ের প্রথম অক্ষরেই তোমার পরিচয়। বলেই সে হন হন করে চলে গেল। আর মধুদত্ত কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

বরাহস্বামী হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, রুদোকের কাছে বণিক মধুদত্তের হয়তো কিছু পাওনা ছিল, তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তা ছাড়া সে লোক রুদোক কিনা তাই বা কে জানে। দেখামাত্রই মিলিয়ে গেল তো। আর আমাদের চোখে সব কৈবর্তকেই একই রকম মনে হয়। কিন্তু সে কথা থাক। এ নিয়ে মধুদত্ত চিন্তা করে মরুক, কিন্তু তুমি ভাবতে বসলে কেন, আর আমাকেই বা এ নিয়ে ভাবতে বলছ কেন ?

পদ্মনাভ বরাহস্বামীর ভাব দেখে মনের কথাটা খুলে বলতে একটু দ্বিধা করছিলেন। একটু সময় ইতস্তত করে শেষে বললেন, আমি ভাবছিলাম, পীঠিরাজ দেবরক্ষিতের সংগে দিব্বোকের কোন গোপন যোগাযোগ চলছে না তো ? দেবরক্ষিত সম্পর্কে কিছু দিন থেকে যে সব খবর আসছে, সেগুলো খুব ভাল নয়। তিনি নাকি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করবার চেষ্টায় আছেন। দেবরক্ষিতের নামাংকিত মুদ্রা সম্প্রতি পীঠিরাজ্যে প্রচলিত হয়েছে। মধুদত্ত স্বচক্ষে তা দেখেছে। রুদোকের ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু

অনুসন্ধান করেছিলাম। পীঠি থেকে মধুদত্তের পরিচিত এক বণিক পণ্য ক্রয় করবার জন্য সম্প্রতি এখানে এসেছে। মধুদত্তকে দিয়ে তাকে ডাকিয়ে এনেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম রুদোকের সেই রুক্ষভাষা সংগীটির সংগে পীঠিরাজ্যের সেনাপতি ভীমযশের আকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এর পরেও কি আপনি বলতে চাইবেন যে রুদোকের এই ঘটনাটা সম্পর্কে আমাদের চিন্তনীয় কিছুই নেই ?

বরাহস্বামী অধৈর্যের সুরে বলে উঠলেন, বরেন্দ্রীর ভূত তোমার কাঁধের উপর এমন শক্ত করে চেপে বসেছে যে তাকে নামানো বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখানে এক বিরাট সংকটের মুখে, যে কোন সময় অন্তর্বিপ্লব ফেটে পড়তে পারে, আর তুমি কিনা একটা অবাস্তব কল্পনার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ। গৌড়ের বিরুদ্ধে দেবরক্ষিত আর বরেন্দ্রীর কৈবর্তেরা সম্মিলিত হতে পারে, এ চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। বরেন্দ্রীর ভাবনা যারা ভাবছে তারাই ভাবুক, তোমার তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও।

কথাগুলো শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু পদ্মনাভ তবু ধৈর্য না হারিয়ে শান্ত কণ্ঠেই বললেন, অন্তর্বিপ্লব যদি সত্যসত্যই দেখা দেয়, ওরা কি সেই সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ করতে পারে না ?

করে করুক, সে জন্য ভাবি না, বরাহস্বামী অগ্রাহ্যের সুরে বললেন। অন্তর্বিপ্লবকে যদি দমন করতে পারি, তবে ওদের বিদ্রোহকে দমন করতে সময় লাগবে না।

পদ্মনাভ কঠিন বাক্যাঘাত খেয়েও পিছনে হটলেন না, বললেন, আমরা দুপক্ষ যখন পরস্পর হানাহানি করে ক্ষত-বিক্ষত, অবসন্ন হয়ে পড়ব সেই সময় সুযোগ বুঝে ওরা যদি সদলবলে রাজধানীর বুকের উপর এসে চড়াও হয় ?

বরাহস্বামী উত্তর দিলেন, সে দুঃসাহস ওদের হবে না। ওরা

বেশী ক্ষেপে ওঠে যদি, নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, হয়তো দলে দলে প্রাণও দেবে। কিন্তু গৌড়ে এসে হানা দেওয়া—সে অসম্ভব। কিন্তু তোমার আজ হয়েছে কি? এ সব অসম্ভব কল্পনা তোমাকে পেয়ে বসেছে কেন?

এ কি একেবারেই অসম্ভব? পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন, আপনার মুখেই তো শুনেছি, এক সময় বরেন্দ্রীর এই কৈবর্তেরাই গৌড় পর্যন্ত এসে ধাওয়া করেছিল। তাদেরই তো বংশধর এরা। অভাবে অনটনে এরা উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠেছে। আবার কি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না?

না, অবস্থার অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে। সে সময় বরেন্দ্রী আর গৌড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল বিশাল অরণ্য। সেই অরণ্য ছিল ওদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সুরক্ষিত দুর্গ। সেই অদৃশ্য দুর্গ থেকে নিশাচরের মত ওরা অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ওদের চলাচল সম্পর্কে কোনই আভাস পেতাম না। কিন্তু ওদের সেই সুযোগ আজ আর নেই। দলের পর দল কোচেরা এসে বন কেটে কেটে বসতি স্থাপন করেছে। গৌড়ের সম্রাটরাও নানা ভাবে তাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। এদের সংখ্যা বড় কম নয়। কৈবর্তদের সংগে এদের সম্পর্ক বিশেষ ভাল নয়। আর সেই সম্পর্ক যাতে ভাল না থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখছি আমরা। তা ছাড়া সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংগঠিত পদাতিক দল কি করতে পারে! কাজেই বৃথাই তুমি এ সব কথা ভাবছ।

পদ্মনাভ এ কথার উত্তর দেবার সময় পেলেন না। শান্তিরক্ষা বিভাগের একজন কর্মচারী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে ঢুকল। তার চোখ মুখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, কোথাও একটা বিষম অনর্থ ঘটেছে। সময়টা ভাল নয়, মুহূর্তের মধ্যে কত কিছু ঘটে যেতে পারে। সে কথা মনে করে বরাহস্বামী আর পদ্মনাভ

সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কি, হয়েছে কি? প্রশ্ন করলেন বরাহস্বামী।

গুরুতর ব্যাপার! মহাপ্রতীহার আপনাকে এখনই যেতে বলেছেন।

আমাকে যেতে বলেছেন! কোথায় আছেন মহাপ্রতীহার? কি হয়েছে?

কর্মচারীটি প্রথমে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল—মহাপ্রতীহার রাজপ্রাসাদে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় না দিয়েই বরাহস্বামী গর্জে উঠলেন, আঃ, হয়েছে কি তাই বল না।

বেচারা বিনা দোষে ধমক খেয়ে দ্রুত গড় গড় করে বলে গেল, রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত একটা গোপন লিপি শুদ্ধ ধরা পড়েছেন।

কোথায় ধরা পড়েছেন—শংখদেবীর কক্ষে, তাই না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানেই। কর্মচারীটি আশ্চর্য হয়ে বরাহস্বামীর মুখের দিকে তাকাল। যে কথা বাইরের কেউ এখন পর্যন্ত জানে না, প্রধান অমাত্য কেমন করে তা জানলেন!

কারা ধরল?

প্রাসাদের নপুংসকেরা। চিঠিটা হাতে দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমনি সময় একেবারে হাতে হাতে। আমরাও পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী গুপ্তভাবে নীচে অপেক্ষা করছিলাম।

মথনদেব কোথায়? তার গৃহ অবরোধ করবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে?

জানি না।

রাজসভার সদস্য অধিরথ রাজধানীতে ফিরেছেন?

জানি না তো।

তবে জান কি? মহারাজ কোথায় আছেন, সেই খবরটা জান তো?

কর্মচারী উত্তর দিল, তিনি চোখ বুজে চুপ করে বসে আছেন, একটা কথাও বলছেন না।

কথাটা বলেই আবার সে মিনতির সুরে বলল, আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি।

পদ্মনাভ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

দু কথায় বলছি, বিস্তারিত ভাবে পরে শুনবে। হরিগুপ্ত দীর্ঘ দিন ধরে মথনদেবের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। কিন্তু কেউ সন্দেহ করতে পারে নি, আমিও না। তবে কিছু দিন থেকে শংখদেবী একটু ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন বলে আমার মনে একটু খটকা লেগেছিল। সেই জন্য রাজবৈদ্য যখন তাঁর চিকিৎসার জন্য আসেন, তখন তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার ফলে চোর একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। এই লিপির সাহায্যে ভেতরকার অনেক রহস্যই হয়তো উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে।

রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত—তিনি ওদের পক্ষে কাজ করছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আর কথা বাড়িও না। পরে সবই বলব, এখন আমি যাচ্ছি ওখানে।

আমি কি আপনার সংগে যাব? পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন।

না না, তোমার কাজ রয়েছে অন্যত্র। আমার ধারণা নির্বোধেরা শিকার হাতে পেয়ে মথনদেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। তুমি সোজা তার গৃহের দিকে যাও। আমি এখনই এক দল শান্তিরক্ষক পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। তারা ছদ্মবেশে গৃহের বাইরে থেকে সতর্ক ভাবে পাহারা দেবে, যাতে তিনি কোন মতে পালাতে না পারেন। এই লিপি পড়বার পর আর এক জন লোককে তোমার কাছে পাঠাব। তার সংগে আমার লিখিত নির্দেশ থাকবে। যদি তাকে বন্দী

করবার জন্য নির্দেশ পাঠাই, তবে সোজা তার গৃহে প্রবেশ করে তাকে আটক করবে। আর যদি ইতিমধ্যে টের পেয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার স্ত্রী বা ছেলে মেয়ে যাকে যাকে পাও, সবাইকে আটক করবে। সবাই যেন তৈরী হয়েই যায়। ধরতে গেলে বাধা পেতে হতে পারে। খুব হুঁশিয়ার, সমস্ত ব্যাপারটার পরিচালনার ভার কিন্তু তোমার উপর রইল।

ওরা দুজন চলে যেতেই পদ্মনাভ মথনদেবের গৃহের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। পথে বেরিয়ে দেখলেন, রোজকার মতই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদে কি যে সব ঘটনা ঘটছে, তার খবর এখনও কেউ রাখে না।

আশ্চর্য মানুষ রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত—কি করে এত দিন ধরে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে এসেছেন। বরাহস্বামীর কৃতিত্বও বড় কম নয়। যাকে কোন দিন কেউ সন্দেহের চোখে দেখে নি, তাকেও শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে হলো তাঁর কাছে। এই সমস্ত নানা কথা ভাবতে ভাবতে পদ্মনাভ যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। একটু বাদেই ছদ্মবেশী শান্তিরক্ষকেরা যে যার জায়গামত ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

তারও কিছুটা পরে একজন লোক নির্দেশপত্র নিয়ে এসে পৌঁছল। নির্দেশ পেয়ে পদ্মনাভ আর কালবিলম্ব না করে সদলবলে ঢুকে পড়লেন মথনদেবের বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, পাখী তার বাসা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। শুধু মথনদেব নয়, তার স্ত্রী পুত্র কন্যা কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

সাত

দিব্বোকের স্ত্রী উনছলি ঘরের মধ্যে ঢুকেই চাপা কান্নায় ভেংগে পড়লেন। দিব্বোক অন্য দিকে মুখ করে বসে বসে কি ভাবছিলেন। কান্নার শব্দ শুনেই মুখ ফিরিয়ে পেছন দিক তাকালেন, শেষে স্ত্রীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ?

আমি আর সইতে পারছি না, কান্না ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন উনছলি। দিনের পর দিন এ রকম অপমান আর লাঞ্ছনা আর কত সহ্য করা যায়। একদিন যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারত না, আজ কিনা তারা আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেলে। আমার মরণই ভাল, আমার বেঁচে থাকার আর সাধ নেই।

সে তো জানি, কিন্তু সম্প্রতি কি হয়েছে ?

দিব্বোকের নির্বিকার কণ্ঠস্বরে উনছলির দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, চাপা কান্নাটা এবার বাঁধভাংগা জলস্রোতের মত হু হু করে বেরিয়ে এল। দিব্বোক কোন কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অটল ধৈর্যের সংগে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন॥

স্বামীর এই মূর্তি উনছলির কাছে অপরিচিত নয়। এতদিন ধরে এই মানুষটার সংগে ঘর করে আসছেন, কিন্তু আজও তার তল খুঁজে পেলেন না। এমনিতে মানুষটার মন বড় নরম, আর সবার জন্য কি মায়া মমতা। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন কঠিন হয়ে ওঠে, বিষম কঠিন, ঘা মেরে কেউ তাকে ভাংগতে পারে না, চোখের জল ঢেলে গলাতে পারে না। দিব্বোকের ভাবলেশহীন চোখের দিকে

তাকিয়ে বুঝলেন, কেঁদে কোন ফল হবে না, কান্না থামালেন উনছলি। ভিজে গলায় বললেন, উলান ঠাকুরের মেলায় গিয়েছিলাম। কত মানুষ, কিন্তু কি মেয়ে কি পুরুষ কেউ আমার সংগে একটা কথা কইল না। ডেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেরা নিজেরা কত কি যে বলে।

কি বলে ওরা ?

মুখপোড়ারা কত কিছুই তো বলে, তা শুনে তুমি করবে কি ? আর যে মানুষ তুমি, কোন কিছুই কি তোমার গায়ে বেঁধে ?

দিব্বো'কের স্থির কঠিন মুখ এবার নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই হাসির আলোয় দেখা গেল সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ। হাসতে হাসতে বললেন, এতক্ষণে সার কথাটা বুঝেছ তুমি, সত্যি, এ সব কোন কথাই গায়ে বেঁধে না আমার। এ চামড়া যে গণ্ডারের চামড়া।

হাসবে না, হাসবে না তুমি এমন করে, হাসবে না বলছি, দস্তুরমত ক্ষেপে উঠলেন উনছলি। দিব্বোক তাকে কাছে টেনে এনে আদর করে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আহা বল না, কি বলছিল ওরা।

উনছলি মুখে যাই বলুন, মানুষটার কাছে শেষ পর্যন্ত কোন কথাই চেপে রাখতে পারেন না। আশ্চর্য এই মানুষ, কি যে মন্ত্র জানে, কেমন করে একটু একটু করে সব কথাই আদায় করে নেয়।

আজও তাই ঘটল। উনছলিকে বলতেই হলো সমস্ত কথা। ওরা বলছিল, গৌড়ের পাত-চাটা কুকুর, কৈবর্ত জাতের কলংক।

একদিন সারা রাজ্যের মানুষ ওকে মাথায় করে রেখেছিল। ওর আদেশে সমস্ত মানুষ ওঠা বসা করত, ওর এক কথায় আমরা প্রাণ দিতে পারতাম। এক দিন কি চোখ নিয়ে আমরা ওকে

দেখেছি। কিন্তু এত দিনে ওর আসল রূপটা বেরিয়ে পড়েছে। আগে কি এমন কথা ভাবতে পেরেছে কেউ? দেখ না, গৌড়ের সৈন্যদের এনে বসিয়েছে এখানে—আমাদেরই বুকের উপর। ওরা আমাদেরটা লুটে পুটে খাচ্ছে, আর আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সারাটা রাজ্য একেবারে ছারখার করে দিল। কত গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করল, কত সংসার উচ্ছন্ন করল, কত মানুষ মারল, সে হিসাব কে রাখে। আর ওদেরই সংগে দিব্বোকের যত দহরম মহরম, ওরাই তার সব চেয়ে আপনার লোক।

একটা ছোকরা পেছন থেকে ফস্ করে বলে উঠেছিল, এমন দিন থাকবে না। আসবে, আমাদের দিনও আসবে। আর সেদিন সব-চেয়ে প্রথমে ওই ব্যাটাকে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে এসে ওলান ঠাকুরের কছে বলি দেব।

কাকে রে? প্রশ্ন করল একজন।

আবার কাকে? ওই কুত্তার বাচ্চা দিব্বোককে।

ছি ছি, এমন কথা বলিস নারে। এই দিব্বোক আজ যাই করুক না কেন, একদিন আমাদের এবং কৈবর্ত-সমাজের জন্য যা করেছে সে, তোরা সেদিনের ছেলে, তোরা কেমন করে তা জানবি। সে আমরা জানি।

কিন্তু সেই ছোকরার সমর্থকের অভাব ছিল না। একজন বলল, সে কোন্ আমলের কথা, জানি না আমরা, জানতেও চাই না। চোখের উপর যা দেখছি, তাই যথেষ্ট। জয়দ্দথ ঠিক কথাই বলেছে। আমাদেরও সেই কথা। লোকে ক্ষেপে গিয়ে যদি কুকুরের মত ওকে ঠেংগিয়ে না মেরে ফেলে, তবে নির্ঘাত ওকে বলি দেব, ওলানঠাকুর সাক্ষী থেকো। আর এর উপর যদি কেউ ভাল মানুষী কোন কথা বলতে আসে, তা হলে তাকে শুদ্ধু।

উনছলি বলছিলেন, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুনছিলাম। একটা মেয়ে আমাকে দেখে চিনল। এক ছোঁড়াকে

ডেকে আমার দিকে ইসারা করে বলল, ওই দেখ্ দেখ্, হারামজাদী মাগী কেমন করে চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢোক নিচ্ছে।

কে রে, কে ওটা?

আর কে, রাজা দিব্বোকের রাণী গো।

এখানে কেন, পাঠিয়ে দিক গৌড়ে রাজা মহীপালের কাছে, পাটরানী করে নেবে।

যার যা খুশী তাই বলতে লাগল, আমি চলে এলাম। আসতে আসতে শুনলাম, বলছে, আবাগী বাঁজী, এই পাপেই তো ওর পেট ভরতি পাথর, সেখানে কিছুই গজাতে পারে না। তা নইলে বছরবিয়ানী—কৈবর্তের মেয়ে—

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন উনছলি। দিব্বোক সহানুভূতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কি দরকার ছিল মেলায় যাবার? না গেলেই পারতে। আমি তো মানা করেছিলাম, শুনলে না তুমি।

বা রে, ওলান ঠাকুরের মেলায় যাব না? সারা বছরে এই একটা দিন, এই দিনে কেউ না গিয়ে পারে!

কেন, আমি তো যাই নি, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।

তুমি? তুমি তো রাজ্যিছাড়া মানুষ, তোমার সংগে কার কথা!

তবে শুনতেই হবে এ সমস্ত কথা। ওরা তো বলবেই।

বলবেই? কেন বলবে? উনছলি ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

সারা রাজ্যের মানুষ বলছে, আমরা এমন করে পড়ে পড়ে মার খেতে পারব না। আমাদের পূর্বপুরুষরা চিরদিন ওদের সংগে লড়াই চালিয়ে এসেছে। যেমন মরেছে, মেরেছেও তেমনি। আজও পরভুদের দল আমাদের জন্যই এখানে ওখানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি, এ কেমন কথা! আর আমরা, তাদের দলপতিরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতে চাইছি। আরও সবাই দেখছে, আমরা রাজপুরুষদের কাছে যাই, আসি, তাদের সংগে ভাব

রেখে চলি, এ ভাবে ও ভাবে তাদের সাহায্য করি,—মানুষ তো ক্ষেপে উঠবেই।

উনছলি অস্বীকার করতে পারলেন না কথাটা। সত্যি তো, ওরা ক্ষেপে উঠবে না কেন? মাঝে মাঝে তার নিজের মনই যে ক্ষেপে উঠতে চায়। বললেন, তাই যদি বোঝ, তবে এমন করছ কেন তোমরা? সবাই চাইছে যুদ্ধ করতে, তোমরাই বা বাধা দাও কেন?

দিব্বোক নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ, শেষে বললেন, তোমাকে তো বলেছি এক দিন।

ভুল, ভুল, ভুল করছ তোমরা। সব জিনিসেরই একটা সময় অসময় আছে। আজ যখন সমস্ত মানুষ যুদ্ধ চাইছে, তোমরা চাইছ তাদের ঠাণ্ডা করে রাখতে। এর পর সময় হারিয়ে তোমরা যখন ডাক দেবে, তখন সে ডাকে কেউ হয়তো সাড়াই দেবে না।

দিব্বোক এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এ তো শুধু উনছলির কথাই নয়, তাঁর নিতান্ত অন্তরংগ দলপতিরাও বার বার এই প্রশ্ন তুলছে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের লোকদের সামলে রাখতে পারছেন না। নিজেরাও অধৈর্য হয়ে উঠছেন। কেউ কেউ এই বলে শাসিয়েছে, এ ভাবে আর বেশী দিন অপেক্ষা করে থাকতে পারবে না তারা। দিব্বোক যদি সম্মতি না দেন, তা হলে তারা নিজেরা যা ভাল মনে করে তাই করবে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হোয়ে গেছে। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, আর তারই পটভূমিকায় লক্ষ নক্ষত্রের আলোকসজ্জায় সারা আকাশ ঝলমল করছে। অপূর্ব দৃশ্য! কিন্তু যতই সুন্দর হোক না কেন, সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকাবার মত মনের অবস্থা নয় এখন। মাথার উপর বিরাট দায়িত্বের ভার। উনছলি বলছে, আরও অনেকেই বলেছে, সময় হারালে সময় আর ফিরে আসে না। তবু তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত আঁকড়ে ধরে বসে আছেন।

যদি তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায়, তখন ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য দায়ী হয়ে থাকতে হবে তাঁকে। আর নিজের মনকেই বা কি বলে বুঝ দেবেন? এর চেয়ে অনেক সহজ দশের মতে মত দিয়ে চলা। কিন্তু সহজ বলেই কি তা করণীয়? যতই দিন যাচ্ছে, সুযোগ আর সম্ভাবনার মাত্রা বেড়ে চলেছে। গৌড় থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, ওদের নিজেদের ভিতরকার দলাদলিটা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু অবস্থাটা আরও একটু পেকে উঠুক—তারপর। কিন্তু সেইটাই তো যথেষ্ট নয়। কৈবর্তেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সন্দেহ নাই। কিন্তু ওদের অশ্বারোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে পায়ে হাঁটা সৈন্য কি কখনও যুঝতে পারে? এ প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধে নামতে গেলে জয়ের আশা কমই আছে। কিন্তু অভাবে, অনাহারে, আর দিনের পর দিন রাজপুরুষদের অত্যাচারে ওদের ধৈর্য আর বাঁধ মানছে না। আর ক'দিন ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে!

দুদিকেই সমস্যা। কোন্ পথে পা বাড়াবেন? সময় হারিয়ে ডাক দিলে সে ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না, কথাটা তো মিথ্যা নয়। দিব্বোক এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে গেলেন।

উনছলি বুঝলেন, এখন আর কথা বলে সাড়া পাওয়া যাবে না। কথা বলে লাভ নাই। মানুষটাকে চিনতে তো আর তাঁর বাকী নাই।

দূর থেকে মেলার কোলাহল মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। রাত দুপুর পর্যন্ত এই মেলা চলবে। এই উপলক্ষে বহু দূর দূর থেকে লোক আসে। এ অঞ্চলে এত বড় মেলা আর কোথাও হয় না। রাত্রিবেলা এই মেলা আরও জমে ওঠে। ছেলেরা মেয়েরা মেলায় দল বেঁধে নাচে, গান করে। সারা বছরের মধ্যে এই দিনটা একটা দিনের মত দিন।

রাত বেড়ে চলল। দিব্বোক বললেন, যাও, রাত হয়েছে, তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। আর বাইরের দরজাটা খুলে রেখো।

কেন, বাইরের দরজা খুলে রাখব কেন ?

দরকার আছে, দিব্বোক সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। এক এক সময় দিব্বোকের কণ্ঠস্বর এই রকম অতিরিক্ত ভারী ভারী বলে মনে হয়। তখন তার সংগে বেশী কথা বলতে ভরসা পাওয়া যায় না।

আমাকে অন্য ঘরে যেতে বলছ কেন ?

হ্যাঁ, তাই যাও। গিয়ে শুয়ে পড়।

আর তুমি কি করবে?

আমার কাজ আছে।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আর কাটখোট্টা উত্তর। যেন এড়িয়ে যেতে চায়। শুনলে পরে গা জ্বালা করে। উনছলি রাগ দেখিয়ে ফড় ফড় করে ঘর থেকে বাইরে চলে যান। মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা লাগে তাঁর, এমন তো কোন দিন হয় না। এর পর শুয়ে পড়লেও ঘুম আসে না চোখে। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবেন। ভাবনার কি শেষ আছে! কিছুক্ষণ বাদে শুনতে পেলেন তাঁর ঘরের সামনা দিয়ে পায়ের শব্দ সামনের দিকে মিলিয়ে গেল। এই পায়ের শব্দ কার, সে বিষয়ে ভুল করবার যো নাই। নিঃসন্দেহে দিব্বোকের পায়ের শব্দ। কিন্তু এমন সময় কোথায় চলেছে দিব্বোক ? কোন বিপদের মুখে গিয়ে পড়বে না তো ? সময়টা খুবই খারাপ। আপন লোকের মধ্যেই শত্রুর অভাব নাই। মেলার সেই ছোকরাটার কথা মনে পড়ে গেল। এখনও সময় আছে, ছুটে গিয়ে নিষেধ করবেন যেতে ? কিন্তু কিছু ফল হবে না। বড় শক্ত মানুষ, যা করবে বলে স্থির করে তা থেকে কিছুতেই সরিয়ে আনবার উপায় নাই। কেউ পারে না, —উনছলি অনেক দেখেছেন।

না, সেই পায়ের শব্দ আবার ফিরে আসছে, উনছলি একটু আশ্বস্ত হলেন। পায়ের শব্দ দিব্বোকের ঘরের দিকে এসে মিলিয়ে গেল। উনছলি মনে মনে অনুমান করলেন, দেখতে গিয়েছিল বাইরের দরজাটা সত্যসত্যই খোলা আছে কি না। কিন্তু কেন ?

এর তো একটি মাত্র মানে হয়—বাইরে থেকে কেউ আসবে। কিন্তু কে আসবে? কে আসতে পারে এমন সময় চোরের মত? এমন কোন্ লোক যার জন্য উনছলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়? কোন মেয়েমানুষ নয় তো? ছিঃ, এমন কথা ভাবা উচিত নয় তাঁর। দিব্বোকের চরিত্রে কোন দিন কোন দাগ পড়ে নি। তা ছাড়া সে বয়স কি আর আছে এখন? নিজের মনের এই গোপন সন্দেহটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন উনছলি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? কোন বিপদ আপদ ঘটবে না তো? রহস্যটা প্রকাশ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘুম আসবে না চোখে। না, ঘুমোলে চলবে না। শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন।

দিব্বোক তাঁর চিরদিনের যা অভ্যাস, দু'হাত পিছন দিকে জড় করে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর অন্তরংগ যারা তারা জানে, কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে এই ভাবেই তাঁকে পায়চারী করে বেড়াতে হয়। কতক্ষণ বাদে পায়চারী বন্ধ করে দিব্বোক মুক্ত গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের বুকে নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেখতে লাগলেন। এখানকার লোকেরা রাত্রিবেলা এই ভাবেই সময় নির্ণয় করে থাকে।

হ্যাঁ, এইবার সময় হয়ে এসেছে। তাঁর মুখ থেকে এই অর্ধস্ফুট স্বগতোক্তি বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই যেন তাঁর এই কথাকে সমর্থন করবার জন্যই এক দল শিয়াল হুয়া হুয়া করে ডেকে উঠল। তার অর্থ রাত এক প্রহর হয়ে গেছে। পায়চারী বন্ধ করে দিব্বোক তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা কথা—কুকুরটা বাইরে আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে কুকুরটাকে আটকে রেখে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। একটু বাদেই পায়ের শব্দ শোনা গেল—দু জোড়া পায়ের শব্দ। কারা যেন সাবধানে পা টিপে টিপে আসছে।

খোলা দরজা দিয়ে দুজন এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। একজন এ বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য হারুক। তার পিছনে কালো পাথরের মতই কুচ কুচে কালো এক জওয়ান। তার মাথায় বাবড়ী চুল। গলায় দুলছে লাল নীল সবুজ পাথরের মালা। বাতির আলো পড়ে সেগুলি চিক মিক করে উঠল। এ সব মালা মেলায় কিনতে পাওয়া যায়। মনে হয় মেলার জায়গা থেকেই এসেছে। দিব্বোকের হাতের ইংগিতে হারুক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। জওয়ান লোকটি উপুড় হয়ে দিব্বোকের পায়ের উপর মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করল।

দিব্বোক সামনের কাষ্ঠাসনটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোসো।

কিন্তু তাঁর সামনে উচ্চাসনে বসতে ইতস্তত করছিল সে। দিব্বোক তাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন।

বল, এবার শুনি অবস্থাটা কি ?

খুব ভাল, আবার খারাপও।

খুব ভাল, আবার খারাপও—তার মানে কি পরভু ?

পরভু বলল, সমস্ত মানুষ আমাদের পক্ষে। শুধু মুখের কথায় নয়, তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কবে আমরা তাদের ডাক দেব, সেই আশায় তারা বসে আছে। তারা বলছে, এ ভাবে চোর ডাকাতের মত লুকোচুরি করে আর কত দিন চলবে, এবার সামনাসামনি একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক।

হুঁ, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন দিব্বোক।

গ্রামের জওয়ান ছেলেরা ঘর বাড়ী ছেড়ে বনে এসে আমাদের সংগে যোগ দিচ্ছে। এত লোককে জায়গা দিতে পারছি না আমরা। খাবে কি ? তা ছাড়া বেশী লোক একত্র হলে দ্রুত চলাফেরায় অসুবিধা হয়, খবরটা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, আর আমাদের ঘেরাও হয়ে পড়বার ভয়টা বেড়ে যায়। কিন্তু যাকে ফিরিয়ে দিতে যাই, সেই মুখ কালো করে। কি আশ্চর্য, আগে সবাই যাদের ভীতু বলে জানত, তারাও এখন দুর্জয় সাহসী হয়ে উঠেছে। মাত্র একটা বছরের

মধ্যে কি মানুষ কি হয়ে গেছে! তাদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

যা বলছ, সবই তো ভাল খবর পরভু, তবে খারাপটা কি?

খারাপ? হ্যাঁ খারাপ খবরও আছে। মোড়লদের উপর, বিশেষ করে—বিশেষ করে আমার উপর, তাই না?

পরভু উত্তর দিল, হ্যাঁ, তাই, মানুষ ভীষণ ক্ষেপে উঠেছে। অনেকে এমন কথাও বলছে, আগে ওদের শেষ কর, ঘরের শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে বাইরের শত্রুর সংগে লড়াই করা চলে না। আবার এ কথাও তো সত্যি, মোড়লদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রু পক্ষের সংগে হাত মিলিয়েছে। তারা যা বলছে তা তো অন্যায় কিছু বলছে না। মোড়লদের মধ্যে কে আমাদের আপন আর কে পর, সে কথা আমরা জানি, কিন্তু এরা কেমন করে জানবে? আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন, কোন কথা বলতে দিচ্ছেন না। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে এ সমস্ত কথা যখন বলতে শুনি, তখন অসহ্য মনে হয়। তা ছাড়া আপনার উপর আক্রমণ হবার আশংকা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের নিজেদের লোকদেরই এই নিয়ে বলাবলি করতে শুনি। তাদের সামলে রাখতে চাই, কিন্তু কি বলে বোঝাব তাদের? অন্তত এই অনুমতিটা দিন, আমরা আভাসে ইংগিতে ভিতরকার কথাটা যেন কিছুটা প্রকাশ করতে পারি। অবস্থা সবই আমাদের পক্ষে, কিন্তু ওলান ঠাকুর না করুন, কোন অঘটন যদি ঘটে যায়, তখন? সে কথা আমি ভাবতে পারি না।

দিব্বোক তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে আশ্বাসের সুরে বললেন, তোমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর পরভু, রুদোক পীঠি থেকে ফিরে আসুক। তারপর সমস্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে। মানুষ নিজের চোখের সামনেই সব কিছু দেখতে পাবে, আমাদের সম্পর্কে তাদের মনে যত বিরূপ ধারণাই থাক না কেন, মিটে যেতে সময় লাগবে না।

কিন্তু পীঠির সাহায্য ছাড়া আমরা কি নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না ? কৈবর্তেরা কত কাল ধরে ওদের সংগে যুদ্ধ করে আসছে, কিন্তু সেজন্য কারু প্রত্যাশায় বসে থাকে নি, এ কি সত্যি নয় ?

হ্যাঁ, সত্যি বই কি, দিব্বোক উত্তর দিলেন, কিন্তু তখনকার যুদ্ধ আর আজকার যুদ্ধ এক নয়। আজ আমরা গৌড় অধিকার করতে চলেছি। অশ্বারোহী সৈন্য ছাড়া সে কাজ সম্ভব নয়। সেই জন্যই পীঠির উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে।

ওদের উপর বিশ্বাস কি ? ওরা সাদা মানুষ হয়ে সাদা মানুষের বিরুদ্ধে কালো মানুষকে সাহায্য করবে, এ কথা বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি না। এমন কি কোন দিন হয়েছে ?

না, হয় নি। কিন্তু যা হয় নি, এমন অনেক কিছুই হয়, আর যা হবার যার যার প্রয়োজন অনুসারেই হয়। ওরা আমাদের অনুগ্রহ করতে আসছে না, ওদের নিজেদের স্বার্থ রয়েছে যে। ওরা এই সুযোগে গৌড়ের সাম্রাজ্যবন্ধন থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

পরভু প্রশ্ন তুলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যদি বিশ্বাস ভংগ করে ? এই সুযোগে নিজেরাই যদি গৌড় দখল করে বসে ? সাদা মানুষদের কথায় বিশ্বাস আছে ?

দিব্বোক প্রতিবাদ করে বললেন, না না, তা হতে পারে না। পীঠিরাজ তেমন লোক নন, তাঁকে আমি বহু দিন আগে থেকেই জানি। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া সেই অসৎ উদ্দেশ্য যদি থেকেও থাকে তবে তা কিছুতেই সফল হতে পারবে না। ওখান থেকে মাত্র কয়েকশো অশ্বারোহী সৈন্য আসবে। একবার যদি আমরা গৌড় অধিকার করে বসতে পারি, কি করবে তারা ? পীঠি এখান থেকে বহু দূরে, আর তাদের পক্ষ হয়ে সাহায্য করবার মত কেউ এখানে নাই। কিন্তু ও কথা থাক এখন, এত দিনই

যখন অপেক্ষা করতে পেরেছ, আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর। এখন আজকার যা কাজ, তাই নিয়েই কথা হোক।

বলুন।

তোমাদের লোকজন কোথায় ?

তারা মেলায় বসে বিকি-কিনি করছে।

সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছে তো ?

হেসে উঠল পরভু, তবে কি খালি হাতে আসবে নাকি ? কোন চিন্তা করবেন না। আজকার শিকার বড় শিকার, সে জন্য আমরা ভালমত তৈরী হয়েই এসেছি। আর যে দলটা নিয়ে এসেছি, এটা আমাদের সেরা দল। এরা এ পর্যন্ত যে সব কাজে গেছে, কোনটাতেই বিফল হয়ে ফিরে আসে নি।

লাকুটিয়া এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে, চেনো তো ? দিব্বোক প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব চিনি, এ অঞ্চলে আমার অচেনা কোন জায়গা নাই। সব কিছু আমার চোখের সামনে ভাসছে। আপনি বলুন।

দিন দুই হয় গৌড় থেকে লাকুটিয়ার ঘাঁটিতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে। খুবই গোপনে নিয়ে আসা হয়েছে, বাইরের লোকে এ খবর জানে না। কয়েকদিন বাদেই ওদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে এই অস্ত্রগুলি বিলি হবে। একসংগে এত অস্ত্র আর কোন দিন ওরা আনে নি। আমার এই সংবাদ নির্ভুল, এটা ধরে নিতে পারো।

উল্লাসে পরভুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আপনার কাছ থেকে এ পর্যন্ত অনেক সংবাদই আমরা পেয়েছি, কিন্তু তার কোনটাই ভুল হয় নি। ওদের সৈন্যসংখ্যা বিশজন, তাই না ?

হ্যাঁ, এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে ওদের উপর কোন আক্রমণ হয় নি। ওদের ধারণা আমার এলাকায় এ সমস্ত ঘটতে পারে না। তাই ওরা খুবই অসতর্ক। পাহারার ব্যবস্থা একেবারেই ঢিলেঢালা। পাহারা থাকলেও একজনের বেশী নয়। গিয়ে প্রথমেই তাকে কাবু করে

ফেলবে। তারপর সৈন্যদের ঘরের দরজাগুলি বাইরে থেকে চটপট বেঁধে ফেলবে, যাতে একজনও বেরোতে না পারে।

ওদের থাকবার ঘরের পিছনে ভাংগা-চোরা ঘর। বাইরে থেকে দেখে সন্দেহ হয় না, এর মধ্যে কোন মূল্যবান জিনিস থাকতে পারে। সেই ঘরের মেজের তলায় সুদৃঢ় গোপন কক্ষ আছে। সেই কক্ষে অস্ত্র মজুত রয়েছে। ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে সেই গোপন কক্ষের দরজা। তালা ভেংগে ভিতরে ঢুকে পড়বে।

বাস, আর কিছু বলতে হবে না। আমি চলি। পরভু দাঁড়িয়ে পড়ল। দিব্বোক হেসে বললেন, বোসো, বোসো. আর একটা কথা শুনে যাও। সংঘর্ষ যত দূর সম্ভব এড়িয়ে চলবে। নেহাৎ আত্ম-রক্ষার জন্য না হলে কাউকে প্রাণে মারবে না।

কেন? পরভু তীব্র ভাবে আপত্তি জানাল। আমি তো ভেবেছি, যদি সম্ভব হয়, সব ব্যাটাকে নিকেশ করে আসব। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ওদের ওই ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে দেব। ওরা আমাদের সংগে যেমন করে, আমরাও ওদের সংগে তেমনি করে থাকি।

দিব্বোক বললেন. আগে যা হয়েছে হয়েছে, কিন্তু এখন সেটা বাদ দিতে হবে। শুধু এখানে নয়, সব জায়গার কথাই বলছি। যতটা সম্ভব ওদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। পরভু বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কেন, ওরা কি আমাদের আদরের কুটুম নাকি?

দিব্বোক হেসে উত্তর দিলেন, ওদের দিয়ে প্রয়োজন আছে আমাদের। দুদিন আগেই হোক আর পরেই হোক যেদিন আমরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করব সেদিন প্রথমেই ওদের সবাইকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে হবে। একটাও যেন পালাতে না পারে। যদি প্রয়োজন হয়, গৌড়ের ধানুকীদের তীরবর্ষণের সামনে এদের স্থাপিত করে আমরা পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। বুঝতে পেরেছ তো?

হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, পরভুর সহাস্য মুখে সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি বাতির আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠল।

কিন্তু দুদিন আগে বা পরে, কবে, আসবে সেদিন ?

বেশী দেরী নেই তার, সময় হয়ে এসেছে।

পরভু আবার উপুড় হয়ে প্রণাম করল, তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সংগে সংগেই ভেজানো দরজাটা ঠেলে দমকা হাওয়ার মত উনছলি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লেন, তারপর দিব্বোককে কোন কিছু ভাববার বা কোন কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। ওর এলো চুলের ঝাপটা খেয়ে বাতিটা নিভে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরটা।

একি, এ আবার কি, চমকে উঠলেন দিব্বোক। কিন্তু ততক্ষণে উনছলি দিব্বোকের মাথাটা তাঁর বুকের উপর চেপে ধরে বলছেন, আমার রাজা, আমার রাজা, আমার রাজা! আমার মণি, আমার মণি, আমার মণি! এখন যে যাই বলে বলুক, যে যত পারে গাল দিক. কোন কিছু আমার গায়ে লাগবে না। আমি সব কিছু হাসিমুখে সইব। তুমি আমার বুক ভরে দিয়েছ। আমার রাজা, আমার রাজা, আমার রাজা!

দিব্বোক এবার বুঝলেন। ও, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শুনছিলে! কেন? কেন? তাঁর কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের সুর ফুটে উঠল। কিন্তু উনছলি বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। তিনি দিব্বোকের কানের কাছে মুখ রেখে গুঞ্জন করে চলেছেন, আমার মণি, আমার মণি, আমার মণি! আমার রাজা, আমার রাজা, আমার রাজা!

পর দিন ভোর হতে না হতেই লাকুটিয়া থেকে খবর এসে পৌছল, লাকুটিয়ার ঘাঁটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ দিব্বোককে অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

জনকয়েক অনুচর সংগে নিয়ে দিব্বোক তখনই লাকুটিয়ায় গেলেন। গিয়ে দেখলেন, যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সুশৃংখল ভাবেই কাজ করা হয়েছে। এক জনও হতাহত হয় নি, সবাই সুস্থ-শরীরে আছে, শুধু যাবার সময় ওরা ওদের মনের ঝালটা মিটাবার জন্য অস্ত্রের ঘরটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। যেখানে অস্ত্র

মজুত করা ছিল সেই ভূগর্ভকক্ষ কুড়িয়ে কাচিয়ে সাফ করে নিয়ে গিয়েছে, কিছুই অবশিষ্ট রেখে যায় নি। আস্তাবলে তিনটা ঘোড়া ছিল, একটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা সম্ভবত অস্ত্রের বোঝা সেই ঘোড়াগুলির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ আর সৈন্যেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। কি সাংঘাতিক কথা! একটা লোকের গায়েও একটু আঁচড় পড়ল না, অথচ সমস্ত অস্ত্র লুটেপুটে নিয়ে চলে গেল। এ খবর যখন রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবে কি হবে তখন অবস্থাটা!

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এমন সংগোপনে অস্ত্রগুলো আনাবার ব্যবস্থা করা হোল, এমন সুরক্ষিতভাবে রাখা হোল, কিন্তু কেমন করে সেই খবর গিয়ে পৌঁছল ওদের কাছে। কারা এরা? নিশ্চয়ই স্থানীয় লোক আছে, শুধু বাইরের লোকের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। খবর পাঠিয়ে অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্যদের আনানো হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামগুলিতে টহল দিয়ে ফিরতে লাগল তারা। পার্শ্ববর্তী বন অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু লুণ্ঠনকারীদের বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

উপর থেকে নির্দেশ আছে, সামন্ত দিব্বোকের সংগে যেন সর্ব বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হয়, তিনি আমাদের নিজস্ব লোক। এত দিন পর্যন্ত তাঁর এলাকায় কোন রকম অশান্তি ঘটে নি। শেষ পর্যন্ত এই খানেই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল। দিব্বোক রাজপুরুষের সংগে গোপনে আলাপ করলেন। এ অবস্থায় কি করা উচিত, তাই নিয়ে পরামর্শ চলল। ভরসা দিলেন এ বিষয়ে সাহায্য করবার ব্যাপারে তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব, তাতে কোনই ত্রুটি হবে না। অনুসন্ধানকারীদের সংগে এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে দেখলেন। সমস্ত গ্রামবাসীরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখতে লাগল।

প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করে দিব্বোক নিজের গ্রামে ফিরে

চললেন। সংগে সেই ক'জন অনুচর, যারা তাঁর সংগে এসেছিল। যেখানে যান, তারা তাঁর সংগে সংগে থাকে। লোকে বলাবলি করে, এক দিন যাকে সমস্ত কৈবর্তেরা দেবতার মত দেখত, আজ তিনি দেহরক্ষী ছাড়া কোথাও যেতে ভরসা পান না। মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায়!

পথটা যেখানে এসে তাঁর গ্রামের দিকে মোড় নিয়েছে, তার এক দিকে প্রান্তর। কথা বলতে বলতে অন্যমনে পথ চলছিলেন তাঁরা। হঠাৎ বনের মধ্যে একটা পাখী ভয়ার্ত স্বরে ডেকে উঠল, ঠিক সেই সময় শাঁ করে একট তীর এসে দিব্বোকের কাঁধের উপর বিঁধে বসল। 'উঃ' বলে তিনি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সংগে সংগে আরও ছুটো তীর তাঁর কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। তীরগুলি তাঁকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল, সে বিষয়ে কারু মনেই কোন সন্দেহ ছিল না। ছুটতে ছুটতে তারা বনের সীমানা ছেড়ে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় এসে হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ালেন। তীরটা অনেকটা বিঁধে বসেছিল। দিব্বোক এক টানে তীরটা খুলে ফেললেন। সংগে সংগে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, সারা গা কাপড় চোপড় লাল হয়ে গেল। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে বাড়ীতে এল।

উনছলি স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। দিব্বোক সস্নেহে ধমক দিয়ে বললেন, থাম, আর কাঁদতে হবে না। আমি এখনই মরতে বসি নি, একটু আঁচড় লেগেছে মাত্র। কাল না বলেছিলে—সে যাই বলুক, আর যে যাই করুক, কিছুই তোমার গায়ে লাগবে না। এরই মধ্যে উলটে গেল সেই কথা!

খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে এল। যারা এসেছিল, তারা নিজেদের মধ্যেই কানাকানি করছিল, এমন যে একটা কাণ্ড ঘটবে, আমরা আগেই জানতাম। তবু তো অল্পের উপর দিয়ে গেছে।

আর এক জন বলল, কিন্তু এতেই কি শেষ হয়ে যাবে ভাবছ?

অল্প বয়সী ছোঁড়ারা যা গরম হয়ে উঠেছে, ওদের সামলে রাখা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার যার নিজের ঘরের কথা ভেবে দেখে না।

কথাগুলি আস্তে বললেও উনছলির কানে এসে ঢুকল। তার ভয় হোল, পাছে দিব্বোক এ সমস্ত কথা শুনতে পান। তাই এ কথা ও কথা বলে তাঁর মনটাকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখতে চাইলেন।

রক্তস্রাব কিছুক্ষণ হয় বন্ধ হয়েছে। দিব্বোক একটু নিস্তেজ হয়ে চোখ বুজে পড়েছিলেন। উনছলি মাথার কাছে বসে হাওয়া করছিলেন। খবর পেয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম থেকে লোক আসছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভীড় জমে গেছে। ঘরের এক কোণায় কয়েক জন লোক খুবই উত্তেজিত হয়ে কি নিয়ে যেন আলাপ করছে। তাদের টুকরো টুকরো কথা দিব্বোকের কানে এসে ঢুকছিল। ওরা বার বার ভীমের নাম বলছে। মনে হচ্ছে যেন তাকে নিয়েই ওদের আলাপ চলছে। কি হয়েছে ভীমের। দিব্বোকের মন আশংকায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ভীম তার ছোট ভাই রুদোকের ছেলে, এ বংশের একমাত্র সন্তান। নিজের সন্তানের মতই তিনি তাকে ভালবাসেন।

চোখ মেলে উনছলির মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ভীম কোথায়? কই, সে তো একবার আমায় দেখতে এল না।

উনছলি যেন তাঁর কথা শুনেও শুনতে পেলেন না। দিব্বোক আবার প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ভীমের? কোথায় সে?

উনছলি এবার আর কথার উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, ও কথা এখন থাক, পরে হবে।

উনছলির কথায় তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়ে উঠল। বুঝলেন, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুতর. সেই জন্যই উনছলি কথাটা চাপা দিতে চাইছে।

তিনি বিরক্তি মিশ্রিত কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, উনছলি, কথা

চাপা দিও না। কি হয়েছে খুলে বল, আমি সব কথা শুনতে চাই। বল, ভীম কোথায় ?

উনছলি এই কণ্ঠস্বরকে ভয় করেন, বলতেই হোল তাঁকে। ভীম আজই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, আমাদের লোকদের সংগে যোগ দিতে চলল সে। এ বাড়ীর সংগে তার সম্পর্ক শেষ, চিরদিনের জন্য শেষ। আর কোন দিন সে ফিরে আসবে না।

ও, এই ব্যাপার। দিব্বোক কোন কথা না বলে আবার চোখ বুজলেন, তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

উনছলি অবাক হয়ে গেলেন, এটা কি একটা হাসবার মত কথা হোল!

আট

আজও সেই মেলার রাত্রির মতই ঘন অন্ধকার রাত্রি। দিব্বোক আর উনছলি তাঁদের ঘরে বসে কথা বলছিলেন। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু কথায় কথায় সে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বাইরের দরজায় কার করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। সংগে সংগে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

ওরা দুজনেই চমকে উঠলেন। এত রাতে এমন সময় দরজায় ঘা মারে কে? উঠে দাঁড়ালেন দিব্বোক। কিন্তু সামনে দু পা বাড়াতেই হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়ালেন উনছলি। বললেন, না তুমি না, আগে আমি গিয়ে দেখে আসি। তার মনে অশুভ আশংকা দেখা দিয়েছে। চিরদিনের আপন জন যারা, ভাগ্যের কি খেলা, তারাই আজ পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কালে যাঁর কথায় তারা সবাই উঠত বসত, আজ তাঁকেই হত্যা করবার জন্য পদে পদে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন অসময়ে কে আসতে পারে! সন্দেহ আর শংকা তো জাগবারই কথা।

আঃ পথ ছাড়, এত ভয় করে বেঁচে থাকা চলে না। ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইলেন দিব্বোক। কিন্তু উনছলি কিছুতেই পিছু হটলেন না, বললেন, তুমি থাকো, আমি যাই। এমন অসময়ে এ ভাবে কোন ভাল মানুষ আসে! আমার যেন ভাল ঠেকছে না।

দিব্বোক হেসে বললেন, এমন সময় পড়ছে, যখন ভাল মানুষ যারা তাদের এই ভাবেই পরস্পরের সংগে দেখা শোনা করতে হয়। আমার মনে হচ্ছে কেউ কোন জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে। পথ ছাড়।

কিন্তু উনছলি ততক্ষণে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেচেন। দিব্বোক সামনে ঝুঁকে পড়ে হাত ধরে টেনে আনলেন তাঁকে।

ওরা যদি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই এসে থাকে, তুমি গিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওদের ?

উনছলি উত্তর দিলেন, তা পারব না। কিন্তু আমার গলার জোর আছে, চ্যাঁচাতে পারব তো। আমার চ্যাঁচামেচি শুনলেই তুমি সরে পড়তে পারবে।

এত সব বুদ্ধি পরামর্শ কোন কাজেই লাগল না। ওরা ঢুকে পড়েছে, এগিয়ে আসছে, ওদের পায়ের শব্দে সে কথা বোঝা গেল। কেমন করে ঢুকল এরা! উনছলি ঘর থেকে বাতিটা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন সামনে।

বাতির আলোয় দেখলেন সবার সামনে হারুক—তাদের বৃদ্ধ ভৃত্য হারুক। সে-ই তা হলে দরজাটা খুলে দিয়েছে। এতক্ষণ তার কথা ওদের মনেই ছিল না। ওদের আসার ভংগি দেখে মনে হোল, কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি ওরা। হারুকের পিছনে পর পর দুজন লোক। দ্বিতীয় লোকটির মাথার বাবড়ী দেখেই উনছলি চিনতে পারলেন, এ আর কেউ নয়, সেই পরভু। সংগে সংগে তার বুকের কাঁপুনিটা থেমে গেল। তৃতীয় লোকটি কে, দেখবার জন্য না দাঁড়িয়েই ছুটে ফিরে গেলেন ঘরে, চঞ্চল বালিকার মত উত্তেজিত ও ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, পরভু গো পরভু, আমাদের পরভু।

ইতিমধ্যে ওরা তিন জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। হারুক নতুন লোক নয়, সে জানে এ সময় এখানে তার উপস্থিতিটা প্রয়োজনীয় নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এদের রেখে সে আস্তে করে সরে পড়ল। পরভু আর তার সংগী দিব্বোক ও উনছলি দুজনের পায়েই প্রণাম জানাল। উনছলির মুখে গর্ব ও আত্মতৃপ্তির হাসির রেখা। এত দিন সবার কাছ থেকে যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা পেয়ে আসছেন, সে দুঃখ আর রইল না। সমাজের মাথার মণি, সকলের আদরের পরভু

তাকে রাণীর মর্যাদা দিয়েছে। সে পরম সমাদরে ওদের দুজনকে বসাল।

জীবনের এই রকম একটা উজ্জ্বল মুহূর্তে দিব্বোক যে হাতের ইংগিত করে তাকে ঘর থেকে সরে যেতে বলতে পারে, এমন একটা কথা তিনি ভাবতেও পারেননি। কিন্তু ইংগিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ভুল করবার কারণ নেই। তবু কুণ্ঠিত অংগভংগির সাহায্যে তিনি তাঁর মৃদু প্রতিবাদ ও ব্যগ্র আবেদন জানালেন। কিন্তু দিব্বোকের চোখ পড়তেই বুঝলেন, এ ক্ষেত্রে আবেদন নিস্ফল। অগত্যা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পা টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরভু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি কোন্ জায়গাটায়?

কি দেখবে? দিব্বোক আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি দেখতে চাও?

তীরটা কোথায় বিঁধেছিল? উঃ খবরটা শোনার পর কি অবস্থায় যে আমাদের দিন কেটেছে।

ওঃ সেই কথা! দিব্বোক তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ও সামান্য একটা খোঁচা সে তো কবেই সেরে গেছে।

কিন্তু সে কথায় পরভুর মনের উদ্বেগ মিটল না। সে স্বচক্ষে দেখে নিয়ে বলল, কোথায় সেরে গেছে, এখনও ঘা রয়েছে যে। কিন্তু কি ভাগ্য আমাদের, একটুকুর জন্য কি না হয়ে যেতে পারত!

কিন্তু তোমার এ ভাবে আসাটা ঠিক হয় নি পরভু। লাকুটিয়ার ঘটনার আগে আমাদের এ অঞ্চল সম্পর্কে ওরা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তার পর থেকে বিশেষ করে আমার উপর আক্রমণ হবার ফলে ওদের টনক নড়েছে। আর এমন নড়াই নড়ছে যে এখানকার লোকদের প্রাণান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সৈন্যদের কাছে ওরা যে বর্ণনা পেয়েছে তাতে ওরা নিশ্চিত ভাবেই বুঝতে পেরেছে সে দিন তুমি সেই দলের সংগে ছিলে। ওদের সন্দেহ, এখন তুমি এই অঞ্চলেরই কোথাও আছ। সেই জন্যই ওরা দিন নাই, রাত নাই, আজ এখানে কাল ওখানে হামলা করে ফিরছে।

যখন খুশী ধরে নিয়ে আটক করছে, ভিতরকার কথা জানবার জন্য মারপিট করছে।

ওদের ভয় পাছে আমার উপর আবার আক্রমণ হয়। সেই জন্য ওরা অতি সতর্ক ভাবে আমাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। ওদের ধারণা এ দেশে আমিই ওদের প্রধান নির্ভর। যে কোন ভাবেই হোক আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এ অবস্থায় এখানকার খোঁজ খবর না নিয়ে তোমার এখানে আসাটা একেবারেই ঠিক হয় নি।

আপনিই ওদের প্রধান নির্ভর? হেসে উঠল পরভু।

হ্যাঁ, ওরা এখনও মনে প্রাণে তাই বিশ্বাস করে। আগে যদি বা কিছু সন্দেহ থাকত, এই আক্রমণের ফলে তাও কেটে গেছে। কিন্তু পরভু, তুমি তো তোমার সংগীর পরিচয়টা এখনও দাও নি।

পরভু বলল, এ আমাদেরই একজন. আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। এর নাম ভাহু। এর সামনে সব কথাই বলা চলে। আমার কাছে যে কথা বলতে পারেন, সে কথা ওর কাছেও বলতে পারেন।

তা হোক, কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাই শুধু তোমার কাছেই বলতে চাই। পরভু, তোমার বন্ধুকে বল একটু বাইরে বসে অপেক্ষা করুক।

কথাটা ভাহুর কানে গিয়েছিল। পরভুর আর বলবার দরকার হোল না। সে নিজেই উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। পরভু একটু অস্বস্তির সংগে বন্ধুর গতিশীল মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার বল, কি জন্য এসেছ? যে জন্যই এসে থাক, ঠিক প্রয়োজনীয় সময়টিতেই এসেছ। তোমাকে দেবার মত জরুরী সংবাদ আছে; আমি নিজেই তোমার সংগে দেখা করবার জন্য ব্যবস্থা করছিলাম। এখন আগে তোমার কথা শুনি।

পরভু বলল, আপনার উপর আক্রমণের খবর শুনে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কি দুর্ভাবনায় যে আমাদের দিন কেটেছে! কিছু দিন থেকে এই ভয়ই তো করছিলাম আমরা। অবশেষে সত্যসত্যই

তাই ঘটল। খবরটা আমার কাছে গিয়ে পেঁীছতে দেরী হয়েছে, তা না হলে সংগে সংগেই চলে আসতাম আমি।

কেন, কি করতে এসে তুমি? দিব্বোকের চোখ দুটি ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। ধর, যদি আমার প্রাণ সংশয়ই হোত, কি সাহায্য করতে পারতে তুমি আমার? তুমি কি বৈদ্য না গুণীন্ লোক? না না পরভু, এ সব ভাল কথা নয়, এর কোন মানে হয় না। তুমি জান, অনেক কিছুই নির্ভর করছে তোমার উপর, আর তুমি অকারণে এ রকম বিপদের ঝুঁকি নেবে, এ কেমন কথা!

দিব্বোকের কথায় সুস্পষ্ট তিরস্কারের সুর। কিন্তু পরভু তা গায়ে মাখল না হেসে বলল, এক পরভু যাবে, কত পরভু আসবে। কিন্তু ওলান ঠাকুর না করুক, আপনার যদি কোন কিছু ঘটে সে জায়গা পূর্ণ করবে কে? সেই জন্যই তো ছুটে আসতে হয়েছে আমাকে। আর এমনিতেই আসিনি, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ফিরব।

তার মানে? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন দিব্বোক, কি যে বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না। হেস্তনেস্ত? কিসের হেস্তনেস্ত?

পরভু তার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল,

আচ্ছা আমরা এ পর্যন্ত আপনার কোন কথা অমান্য করেছি?

তা করনি।

আর আমাদের একটি মাত্র কথা, সে কথাটা আপনি রাখেন না কেন?

পরভু এমন করে কোন দিন তাঁর সংগে কথা বলেনি, দিব্বোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না, প্রশ্ন করলেন, কি তোমাদের কথা? কোন্ কথা রাখিনি?

আমরা কি বলিনি, আপনি সোজাসুজি আমাদের মধ্যে চলে আসুন?

দিব্বোক হেসে বললেন, সেই কথা। আমার কি তাতে বড় অসাধ? যারা আমার সব চেয়ে আপন, তাদের চোখে আমি শত্রু

হয়ে আছি, এ কি আমার বড় সুখের কথা ? কিন্তু কি করব, তবুও আমাকে ছদ্মবেশ নিয়ে চলতে হচ্ছে। এর ফল ভাল হয়েছে না খারাপ হয়েছে, তুমিই বল।

পরভু উত্তর দিল, ভালই হয়েছে মানি। কিন্তু আর বেশী ভালোর কাজ নাই আমাদের। আপনাকে এ ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে আর এক পাও এগোতে রাজী নই আমরা। সেদিন মৃত্যু আপনার কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। যা ভাবতে পারি না তাই যদি ঘটত, কি হোত তবে ? পরভুর কণ্ঠস্বর ভারী হলে এল।

তার কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন দিব্বোকের কান এড়াল না। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, না না, নিশ্চিত মৃত্যু বলছ কেন ? আচ্ছা বেশ। এখন থেকে না হয় আর একটু বেশী সতর্ক হয়ে চলব।

পরভু অধৈর্যের সংগে তার বাবড়ী চুলে ঝাড়া মেরে বলল, রাখুন আপনার সতর্কতা ! যাদের মধ্যে আছেন, তারাই যদি এ ভাবে ক্ষেপে উঠতে থাকে, কি সতর্ক হবেন আপনি ! এখানকার রাজ-পুরুষেরা পাহারা দিয়ে রক্ষা করবে ? ওরা যত বেশী সাহায্য করতে চাইবে আপনাকে, আপনার বিপদ তত বেশী বাড়বে। এখন কত শক্তি আমাদের, দু চার ঘর ধনী আর তাদের সংগোপাংগরা ছাড়া বরেন্দ্রীর সমস্ত মানুষ মনে মনে আমাদের সংগে। অথচ আপনাব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারি, সে শক্তি আমাদের নেই। সেই জন্যই আমরা মিলিত হয়ে স্থির করেছি—

আমরা ? আমরা কারা ? দিব্বোক প্রশ্ন করলেন।

'আমরা' মানে যারা আপনাকে সঠিক ভাবে চিনি, যাদের সংগে আপনি মন খুলে কথা বলেন তারা।

কি স্থির করেছ তোমরা ?

স্থির করেছি, আপনি যদি আমাদের কথা না মানেন, তবে আমরাও মানব না আপনার কথা।

দিব্বোক হেসে বললেন, বেশ তো, নাই মানলে আমার কথা। আচ্ছা ধর, তোমাদের কথায় যদি আমি না-ই রাজী হই, কি করবে তবে?

কি করব? আমাদের যা খুশী তাই করব। পরভু ছেলেমানুষের মত বলে চলল, আসবার সময় আমি বলে এসেছি, যদি রাজী না হন, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব ওখানে, একদিন, দু দিন, তিন দিন, যত দিন লাগে। সে খবর যদি প্রকাশ হয়ে যায়, আর সে জন্য ধরা পড়তে হয়, তবে সে দায় দায়িত্ব তাঁর। আমি কিছু জানি না। সত্যি বলছি আপনাকে, আমি ছোট বেলা থেকে ভীষণ জেদী, যা একবার ধরি তা ছাড়ি না। আপনি যদি কথা না দেন, আমি এ জায়গা ছেড়ে এক পা নড়ব না। তাতে যা হবার হবে।

দিব্বোকের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। এ এক অপূর্ব অনুভূতি। শান্ত সংযত এবং শক্ত মানুষ বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর কোন দিনই হয় নি। এ কি হলো তাঁর, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে যে। পরভুর একটা হাত দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, একটু সবুর ভাই, আর ক'টা দিন। তোমাদের কথা শুনব না তো কার কথা শুনব! তবে আর একটু অপেক্ষা কর, সুখবর আছে। রুদোকের কাছ থেকে খবর নিয়ে লোক এসেছে, ওরা আসছে।

আসছে! উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল পরভু, কবে? কবে আসবে?

আর দু'মাস বাদে।

আরও দু'মাস! পরভুর উৎসাহ যেন নিভে ছাই হয়ে গেল। আরও দু'মাস আমাদের অপেক্ষা করতে বলছেন! তারপর আপনি নিজেকে প্রকাশ করবেন? আর এই দু'মাসে কত কিছু ঘটে যেতে পারে ভেবে দেখেছেন? আমাদের বহু ভাগ্য এবার একটুর জন্য আপনাকে হারাতে হয় নি। কিন্তু আর আমরা এই ঝুঁকি নিতে

পারব না। এ ভাবে আপনার এখানে থাকা আর চলবে না। আমরা সবাই একমত হয়ে ঠিক করেছি। আমাদের এ কথা আপনি কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।

পরভুর কথার মধ্যে দিয়ে এমন গভীর আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠেছিল যে তার সামনে কি যে বলা যায়, দিব্বোক কথা খুঁজে পেলেন না।

সারা দেশের মানুষ আপনার নামে যে সব কথা বলছে, তার কতটুকু আপনার কানে আসে? সে জানি আমরা। আর যারা আমাদের দলের মানুষ, তাদের রাগ আরও বেশী। কি না বলছে তারা। কিন্তু আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন, সত্য কথা প্রকাশ করতে দিচ্ছেন না। আমাদের বুক ফেটে যায়, কিন্তু মুখ বুজে সব কিছু হজম করে যেতে হয়। এ কি কম কষ্ট? আর দিনের পর দিন এ সব কথা শুনে শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, কাজে আর উৎসাহ পাই না।

বলুক না ওরা। ওদের দোষ কি, ওরা তো বলবেই।

ওদের দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আপনাকে আমাদের মধ্যে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত মনে কাজ করতে পারছি না। তা ছাড়া পীঠি থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা এত দূর দেশে আমাদের সাহায্য করতে আসবে, এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি যদি আসার ইচ্ছা থাকত, তা হলে এত দেরী করবে কেন? অথচ সময় বয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি কি আসবে ওরা? আমার তো মনে হয়, ওদের সব কিছুই ফাঁকি। আসার হলে আগেই আসত।

দিব্বোক বললেন, না, এবার ঠিকই আসবে। রুদোক জানিয়েছে, এতদিন ব্যাপারটা নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা গরমিল চলছিল। পীঠিরাজ দেবরক্ষিত এই বিষয়ে আমার কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য সব সময়ই তৈরী আছেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি ভীমযশ এত দিন

আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁর সেই আপত্তি নাকি সম্প্রতি কেটে গেছে। কিছু ভয় কোরো না। ওরা আসবেই।

পরভু অবহেলার সুরে বলল, ভয়! ভয় করব কেন? আমার নিজের কথা বলছি, পীঠির ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা আসুক আর নাই আসুক, সেজন্য আমার কোন ভরসাও নেই, ভয়ও নেই। আমি তো মনে করি, আমরা নিজেরাই যথেষ্ট, কারু সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমাদের। শুধু আপনার নির্দেশ, সেই জন্যই পীঠির ঘোড়সওয়ারদের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

দিব্বোক একটু অধৈর্যের সুরে বলে উঠলেন, এ কথাটা আমি তোমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছি না যে, যে যুদ্ধ আমাদের সামনে, তা এতদিনকার এই বন-জংগলের যুদ্ধ নয়। রাজধানী দখলের এই যুদ্ধের ধরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যুদ্ধ হবে মুক্ত রণক্ষেত্রে, আর নগরের রাজপথে। এ যুদ্ধ ওরা চিরকাল করে এসেছে, তাই এ ব্যাপারে ওরা দক্ষ। কিন্তু কৈবর্তেরা যত যুদ্ধই করে আসুক না কেন, এ ধরনের যুদ্ধ তাদের কোন দিনই করতে হয় নি। আর ঘোড়সওয়াররা যদি আমাদের বাহিনীর সামনে না থাকে, তবে এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হবে না। আমরা যুদ্ধ করতে চলছি শুধু প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলতে নয়, আমরা জয়লাভ করতে চাই।

পরভু দিব্বোকের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমরা জয়লাভ করতে চাই। কিন্তু আমি আপনার এই কথাটা কোনদিনই পুরো-পুরি স্বীকার করে নিতে পারি নি। আগেও না, এখনও না। কিন্তু স্বীকার করি আর না করি, আমরা তো আপনার কথা মেনে নিয়ে অপেক্ষা করেই আছি। কাজেই ও কথা থাক। আমি তো তা নিয়ে কোন কথা বলতে আসি নি। আমি যে কথা নিয়ে এসেছি, সে কথাটা আপনাকে মানতেই হবে। এটা শুধু আমার নিজের কথা নয়, এ আমাদের সকলের কথা।

দিব্বোক কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না।

পরভু তাঁকে বলবার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে চলল, কিন্তু শুধু আপনার প্রাণের আশংকা আছে বলেই যে বলছি, তা নয়, এর মধ্যে আরও কথা আছে। যে মুহূর্তে আপনি আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন, তখন তা মন্তরের মতই কাজ করবে। আমরা যখন এতদিনকার এই চাপা দেওয়া কথাটা সবার কাছে প্রকাশ করে দেব, আর সবাই যখন দেখবে আপনি আমাদের মধ্যে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন অবস্থাটা কি হবে ভাবতে পারেন? আপনি পারবেন না, আমরা পারি। উত্তরের পাহাড় থেকে পাগলী দিস্তাং নদীর ঢল যেমন করে নেমে আসে, সারা ববেন্দ্রীর মানুষের মনে তেমনি করে উৎসাহের ঢল নেমে আসবে। আমাদের মধ্যেই এমন মানুষ আছে, যারা বলে এই কৈবর্ত জাতের কোন আশা নেই। আমাদের রাজা দিব্বোক যার সংগে কারু তুলনা হয় না, সেই যদি এমন করতে পারল, তবে আর কার উপর ভরসা করতে পারি আমরা! অনেকের মনেই এই কথাটা জমে আছে। তাই তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। যদি দেখতে পায় আপনি তাদের মানুষ, তাদেরই আছেন, তবে এই আধমরা মানুষগুলো লাফিয়ে উঠবে। অন্যের কথা কি বলব, আপনাকে যদি সামনে পাই, এই যে পরভু দেখছেন, তারও বুকের জোর দশগুণ বেড়ে যাবে।

এগুলো আপনি ভেবে দেখছেন না, আপনার দৃষ্টি রয়েছে শুধু পীঠির ঘোড়-সওয়ারদের দিকে। আমরা যদি আমাদের নিজেদের শক্তিকে জমায়েত করতে না পারি, ওরা কি করবে? বেগতিক বুঝলে ওরা যে যার প্রাণ নিয়ে পালাবে। আমাদের কালো মানুষদের জন্য ওদের কি এত দরদ!

পরভু যেন এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে থামল। পরভু শুধু যুদ্ধ করতেই পারে না, কথা বলতেও জানে। আর তার কথার পিছনে সুসংগঠিত চিন্তাও আছে। দিব্বোক এত দিন বাদে আজ তাকে নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন। পরভু আজ তাকে নতুন ভাবনায় ভাবিয়ে

তুলেছে। সত্য কথাই বলেছে পরভু, দেশের মানুষের মনের কথা এরাই তো জানে, তিনি আর কতটুকু জানেন ?

দিব্বোককে নিরুত্তর দেখে পরভুর মনে আশার আলো দেখা দিল। একটু অপেক্ষা করে কোন উত্তর না পেয়ে সে প্রশ্ন করল, কই কিছুই বলছেন না যে ?

দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও। কিন্তু একটা দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কোচদের সংগে যে কথাবার্তা চালাতে বলেছিলাম, সেটা কি কিছুটা এগিয়েছে ?

হ্যাঁ, আমরা আলাপ করেছি ওদের সংগে। আমি নিজে যেতে পারি নি। তবে যারা গিয়েছিল, তাদের সংগে আমাদের এই ভাহুও ছিল। ওদের দুজন মোড়লের সংগে ভাহুর পরিচয় আছে। বিশেষ করে সেই জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনি ভাহুর মুখ থেকেই সব কথা শুনুন। বেচারা বাইরে একা একা মনমরা হয়ে বসে আছে।

দিব্বোক তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বললেন, কিন্তু কি করা যাবে। এ সব বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা প্রয়োজন। সময় সময় একটু রূঢ় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উপায় নেই।

ভাহু সত্য সত্যই মনমরা হয়ে বসেছিল। দিব্বোকের সংগে মুখোমুখি কথা বলবার এমন একটা সুযোগ একেবারে হাতের কাছে এসেও এমন করে ফস্‌কে গেল, দুঃখ হবার তো কথাই।

ডাক পড়তেই শশব্যস্ত হয়ে উঠে এল সে। যেটুকু মনঃক্ষোভ জমে উঠেছিল, তা গলে একেবারে জল হয়ে গেল।

ভাহু সমস্ত কথা খুলে বলল। মোড়লেরা স্পষ্টভাবেই তাদের কথা জানিয়ে দিয়েছে—গৌড়ের রাজার বিরুদ্ধে ওরা কিছু করতে পারবে না। গৌড়ের রাজারাই তাদের ডেকে এনে জায়গা দিয়েছিল। একদিন তাঁদের অনুগ্রহে তারা এখানেই ঠাঁই পেয়েছে, এ কথা তারা অস্বীকার করতে পারে না। মোড়লরা তাদের বাপদাদাদের মুখে

শুনেছে, তাদের পূর্বপুরুষরা যখন প্রথমে এখানে এসে বসেছিল, তখন তাদের কোন রকম কর-টর দিতে হতো না। অগাধ বন, যে যতটা পেরেছে, জংগল কেটে জমি আবাদ করেছে। এখন অবশ্য সবারই কিছু কিছু কর দিতে হয়। কিন্তু তা তেমন গায়ে লাগে না। এ ছাড়া আর কোন রকম আদায় নেই। তাদের মাথার ওপর রাজা আছে বটে, কিন্তু তাদের নিজেদের নিয়মে তাদের সমাজ চলে। রাজা তার ওপরে কোন হাত দেন না। তারা বেশ শান্তিতেই আছে। রাজা তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করে না। তারাই বা করতে যাবে কেন?

ভাদু বলে চলল, আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা সবই খুলে বললাম। ওরা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব কথা শুনেছি বটে।

শুনেছেন? একি শুধু শোনা কথাই? আজকাল এত জুলুম চলছে আমাদের ওপর, একি আপনারা চোখে দেখেন না?

মোড়লেরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু গা মোচড়ামুচড়ি দিয়ে শেষে বলল, আরে ভাই, চোখেও দেখি, কানেও শুনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি?

আমাদের মধ্যে একজন বলল, আপনারা আমাদের গা-ঘেঁষা প্রতিবেশী। আমরা চাষী, আপনারাও চাষী। আমাদের সুখে আপনাদের সুখ, আমাদের দুঃখে আপনাদের দুঃখ। আমাদের কথাটা আপনাদের কি একটু চিন্তা করা উচিত নয়?

ওরা তখন এই নিয়ে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নিল। শেষে বলল, না বাপু, আমরা ওসব পারব-টারব না। গৌড়ের রাজা আমাদের তো কোন ক্ষতি করে নি, আমরাই বা তাদের ক্ষতি করতে যাব কেন?

আমরা বললাম, আজ না হয় ওরা আপনাদের সংগে ভাল ব্যবহারই করছে। কিন্তু এ আর ক'দিন! এক সময় তো আমাদের

সংগেও ভাল ব্যবহার করত। কিছুদিন যাক না, তারপর দেখবেন, আপনাদেরও ওরা ছেড়ে কথা কইবে না।

এক বুড়ো বলে উঠল, যখন করে তখন দেখা যাবে, তাই বলে আমরা আগ বাড়িয়ে দোষী হতে যাব কেন?

এই নিয়ে সারা রাত ধরে আলাপ আলোচনা চলল। শেষকালে রাত্রি যখন শেষ হয় হয় তখন ওরা মাঝামাঝি একটা প্রস্তাব দিল। বলল, আর বেশী কথায় কাজ নেই ভাই, আমরা আমাদের শেষ কথা বলে দিচ্ছি, আমরা এ পক্ষেও নেই, ও পক্ষেও নেই। তবে তোমাদের এই দুঃসময়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করব না। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যদি তোমাদের সাহায্য করতে বল, তাও আমরা পারব না।

এর বেশী আর এগোতে পারলাম না। যেটুকু পেলাম তাই নিয়েই ফিরে এলাম আমরা।

কথা শেষ করে ভাহু দিব্বোকের মনোভাবটা বোঝবার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকাল। দিব্বোক খুশী হয়ে অনুমোদনের সুরে বললেন, বেশ, বেশ, ওরা যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। আমাদের এই সংকটের সময় এটা বড় কম সাহায্য নয়। কিন্তু আমি ভাবছি কোচরা শেষ পর্যন্ত তাদের এই মুখের কথা রক্ষা করে চলবে তো?

পরভু উত্তর দিল, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। কোচদের কথার কক্ষনো নড়চড় হয় না। তারা যেটুকু বলে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। আচ্ছা, ওকথা তো গেল, এখন আমার কথাটার উত্তর দিন। এটা মনে রাখবেন, আপনার এই উত্তরের ওপর আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

দিব্বোক বললেন, তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখছি পরভু। তোমাদের কথা যদি মেনে নিই তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সেই জন্যই আমি কথাটা

আরও ভাল করে ভেবে দেখতে চাই। কাল বাদে পরশু—হ্যাঁ, পরশুই আমি তোমাকে আমার চূড়ান্ত মতামতটা লোক মারফৎ জানাব। তুমি তোমার নিজের জায়গায় থেকো। আর এক কথা, তোমাকে বার বার করে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি নিজে কক্ষনো এখানে আসবে না, আপাতত কোন লোক পাঠাবারও দরকার নেই। যা করবার আমিই করব।

পরভু হেসে বলল, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আমার কথায় রাজী হয়ে গিয়েছেন। আর যদি তার বিপরীত ঘটে তা হলে আসতেই হবে আমাকে এখানে। আমি আপনার সব কথাই মেনে চলি, কিন্তু এ কথা কিছুতেই মানতে পারব না। এ আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখছি।

এর দিন সাতেক বাদেই এ অঞ্চলের লোক অবাক হয়ে শুনল, দিব্বোক তাঁর স্ত্রী আর তাঁর ভাই রুদোকের স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় চলেছেন। তীর্থযাত্রাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সময়টা এমন যে অন্য সময়ে যা স্বাভাবিক এখন তা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়াল। তীর্থযাত্রার কথাটা কেউ বিশ্বাস করল না। অনেকেই বলল, প্রাণ বাঁচাবার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন লোকেরা আফসোস করে বলল, এমন একটা মানুষ, শেষকালে এই হলো তার গতি। তরুণরা বলল, গেছে, আপদ গেছে। তবে আরও কিছুদিন আগে গেলে আরও ভাল হতো।

রাজপুরুষরা নাকি এ সময়ে না যাওয়ার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তবে যাবার সময় সবাইকে বলে গেছেন, অতি শীঘ্রই ফিরে আসবেন আবার। কিন্তু খুব কম লোকই সে কথা বিশ্বাস করেছে।

নয়

মধুবনবিহারের এক গোপন কক্ষে তাঁরা পাঁচজন বসে মন্ত্রণা করছিলেন।

বিহারের অধ্যক্ষ সুভদ্র বললেন, আপনাদের সংগে আমাদের প্রথমও প্রধান শর্ত ছিল যে, রাজা মহীপালের পতন ঘটলে আমাদের মধ্য থেকে প্রধান অমাত্য গ্রহণ করতে হবে। বলুন এ কথাটি কি ঠিক নয়?

মথনদেব উত্তর দিলেন, ঠিক বই কি।

তাই যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে হিন্দুদের মধ্যে এই বিপরীত প্রচার চলছে কেন?

বিপরীত প্রচার? সে কি!

হ্যাঁ, আমাদের পক্ষপাতী হিন্দু যারা, শুনছি তারা নাকি বলাবলি করছে, এই রাজত্বের পতন ঘটলে বরাহস্বামীর পরিবর্তে অন্য একজন হিন্দুকে প্রধান অমাত্য নিয়োগ করা হবে। এ সব কথার মানে কি? এ কথা কেন উঠছে?

উঠছে নাকি? মথনদেব একটু অগ্রাহ্য করবার ভংগিতে বললেন, যার মন যে রকম চায় সে সেই রকম কল্পনা করবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

এটা কি শুধু তাদেরই কল্পনা? এর পিছনে আর কিছু নেই?

বর্তমান কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনাটা কিছু দূর এগোতেই সুভদ্র হঠাৎ এমন একটা জায়গায় খোঁচা মেরে বসলেন যে সমস্ত আবহাওয়াটা ঘুলিয়ে উঠল। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল

না। এটা সুভদ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেটাকে সে সত্য মনে করে সে সম্পর্কে স্পষ্টোক্তি করতে তার কখনও বাধে না।

প্রবীণ ও বিচক্ষণ মথনদেব প্রথমে কথাটা গায়ে মাখতে চাইছিলেন না, কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। এই অর্বাচীন তরুণের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে বললেন, আপনি কিসের ইংগিত করছেন? কি বলতে চান স্পষ্ট করেই বলুন।

আমার কথাটা কি যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি? প্রশ্নাকারে উত্তর দিলেন সুভদ্র।

মথনদেব এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে অধিরথের মুখের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির তাৎপর্য—আপনাদেরও কি এই একই বক্তব্য অধিরথ অস্বস্তির সংগে নড়েচড়ে বসলেন।

উপগুপ্ত বাধা দিয়ে বললেন, এসব কি বলছ সুভদ্র। কে কোথায় কি বলেছে না বলেছে, সেটা আমাদের আলোচ্য নয়। এসব সামান্য কথা ছেড়ে দিয়ে মূল আলোচনার দিকে এসো।

কিন্তু এত সহজে সুভদ্রকে থামানো গেল না, তিনি বলে উঠলেন সামান্য? এটাকে সামান্য বলছেন আপনি! আজ যেটা ছোট, তাকে প্রশ্রয় দিলে কাল তা বড় হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজের এই দুর্গতি এই ভাবেই তো হয়েছে। সে জন্য গোড়া থেকেই পরিষ্কার হয়ে নেওয়া ভাল।

মথনদেব এবার একটু মন্তব্য না করে পারলেন না, গোড়াটা মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল, আপনিই অপরিষ্কার করে তুলছেন।

অধিরথ সুভদ্রকে লক্ষ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ও সমস্ত অপ্রাসংগিক কথা এর মধ্যে টেনে আনবেন না। যে কাজের কথা হচ্ছিল, সেই কথাই বলুন। আমাদের মাথার ওপর কত বড় দায়িত্ব সে কথাটা একবার ভেবে দেখুন। অবস্থাটা সব দিক দিয়েই আমাদের অনুকূল ছিল, কিন্তু সেই চিঠিটা ধরা পড়বার পর থেকে দুর্যোগ নেমে এসেছে আমাদের ওপর। আমাদের কিছু লোক ধরা পড়েছে, কিছু লোক

ওদের সন্দেহের পাত্র হয়েছে, আমাদের ভিতরকার কোন কোন কথা ওদের কাছে ফাঁসও হয়ে গেছে। এই সুযোগটা পেয়ে বরাহস্বামী তার জাল ছড়িয়ে ফেলছেন। এটা মনে রাখতে হবে, আমরা খুবই সংকটের মধ্যে আছি।

এ ভাবে বাধা পেয়ে সুভদ্রের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল। তিনি মনের ঝালটা মিটাবার জন্য বলে উঠলেন, এ সংকট তো সাধ করে ডেকে আনা হয়েছে।

তার মানে? সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

সাধ করে না তো কি? কোন প্রয়োজন ছিল কি শংখদেবীকে এই চিঠি পাঠাবার? তিনি একে মেয়ে মানুষ, তার উপর প্রাসাদের মধ্যে প্রায় বন্দিনীর অবস্থায় আছেন। এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর সংগে মতামত বিনিময়ের কি যে সার্থকতা থাকতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগম্য। আর তার ফলটাও হাতে হাতেই পাওয়া গেল। সংকট আপনি আসে নি।

এই কথার মধ্য দিয়ে সোজাসুজি মথনদেবকে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর পক্ষ হয়ে উত্তর দিলেন অধিরথ। তিনি বললেন, এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা নেই। সেই কারণেই শংখদেবীর সংগে মতামত বিনিময়ের সার্থকতা বুঝে ওঠা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনি এমন কথা বলছেন। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক। আপনি সম্প্রতি সব কটি বিহার পরিভ্রমণ করে সেখানকার অধ্যক্ষ ও ভিক্ষুদের মতামত জেনে এসেছেন। তাঁদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কেননা কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল বিষয়েই বহু লোক তাঁদের নির্দেশ মেনে চলে। —আমরা আপনাদের কাছ থেকে তাঁদের মতামতটা জানতে চাই।

সুভদ্র বুঝলেন প্রধান অমাত্যের নিয়োগের প্রশ্নটাকে গোড়া থেকেই আরও বেশী পরিষ্কার করে নেওয়া আপাতত সম্ভব নয়। এ

বিষয়ে এখানে সবাই তার বিরোধী। অগত্যা সেই চেষ্টাটা ছেড়ে দিয়ে তিনি অধিরথের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বিহারগুলির অর্ধেকেরও বেশী আমাদের সংগে আছে। বাকী সবাই বলছে, রাজা মহীপালদেব যাই করুন না কেন তিনি আমাদের সমধর্মী, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারব না। তা ছাড়া বদল হলেই যে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে, এমন কথাই বা কে বলতে পারে। অবস্থা যা আছে তার চেয়ে খারাপও তো হতে পারে।

উপগুপ্ত চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, হিন্দুদের মধ্যে দু'ভাগ. বৌদ্ধদের মধ্যেও তাই। লক্ষণটা আমার কাছে ভাল লাগছে না। একটা বড় রকমের রক্তারক্তি ঘটবার আশংকা আছে। সৈন্যদের মধ্যে আমাদের সমর্থকদের সংখ্যা কেমন ?

মথনদেব উত্তর দিলেন, সে কথা চূড়ান্ত ভাবে বলা কঠিন। কেননা ঘন ঘন অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। তবে মনে হয় আনুমানিক এক তৃতীয়াংশ আমাদের সংগে থাকতে পারে।

মাত্র এক তৃতীয়াংশ ? তবে কিসের উপর আমরা নির্ভব করছি ? উপগুপ্ত প্রশ্ন করলেন আপনারা কি মনে করেন প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশ আমাদের সমর্থক ?

অধিরথ মাথা নেড়ে বললেন, না, এমন কথা বলা যায় না। বরং এর বিপরীতটা হবারই সম্ভাবনা। এখানকার প্রজাদের রাজভক্তি রাজার পক্ষে একটা বিপুল শক্তি।

তবে ?

মথনদেব বললেন, আমাদের প্রধান ভরসা সামন্তরাজেরা। আপনারা কাহ্নুরের মুখেই সেখানকার অবস্থা শুনুন।

মথনদেবের পুত্র কাহ্নুরদেব এতক্ষণ নিঃশব্দে সবার কথা শুনছিলেন। পিতার ইংগিত পেয়ে তিনি বলে চললেন, আমি গত এক বছর ধরে বাণিজ্যের উপলক্ষ নিয়ে কোটাটবী, বালবলভী, অপরমন্দার, কুজবটী, তৈলকম্প, উচ্ছাল, ঢেক্করীয়, কযংগল মণ্ডল,

নিদ্রাবল, পদুবন্বা ও কৌশাম্বী ছোট বড় এই এগারোটি সামন্তরাজ্য পরিভ্রমণ করেছি। সাহায্যের প্রশ্ন নিয়ে আমি এদের সবার সংগেই আলাপ করেছি। এদের কথা-বার্তা শুনে আমার মনে হয়, যদি রামপালদেব বা শূরপালদেব বাইরে থাকতেন, তা হলে এরা সবাই আমাদের সংগে যোগ দিতেন! এদের মধ্যে অপরমন্দার, তৈলকম্প, উচ্ছাল ও নিদ্রাবল সুস্পষ্টভাবে আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অবশ্য তারা তাদের নিজেদের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছে। এই যুদ্ধ উপলক্ষে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করে নেওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য!

আর বাকী ছয়টা রাজ্য? অধিরথ প্রশ্ন করলেন।

তারা দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। দু'পক্ষের সংগেই কথা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। তবে এ কথা আমি ভাল ভাবেই জানতে পেরেছি, বরাহস্বামীর লোকেরা ওদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে কোন কথা আদায় করতে পারেনি। আসল কথা, ওরা একটু আলগা হয়ে বসে শক্তি পরীক্ষার প্রথম পর্যায়টা দেখে নিতে চায়। শেষে যে দিকে জোর দেখবে বেশী, সেই দিকেই ঝুঁকে পড়বে।

সুভদ্র প্রশ্ন তুললেন, যে পাঁচটা রাজ্যের কথা বললেন. তাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যায় তো?

কাহ্নুরদেব উত্তর দিলেন, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় এদের কথায় নির্ভর করা চলে। আর এরা যদি সাহায্য করে তবে পূর্ণ শক্তি নিয়েই সাহায্য করবে। কেননা তারা জানে যে তারা আমাদের সংগে যোগ দেবার পরেও আমরা যদি জয়ী হতে না পারি, তবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অধিরথ বললেন, আমাদের অনুকূলে আরও একটা ঘটনা ঘটছে, আমাদের এই শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাকেও আমরা তুচ্ছ করতে পারি না।

কি ঘটনা? উপগুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

বরেন্দ্রীতে অনেক দিন থেকেই কৈবর্তদের মধ্যে বিক্ষোভ চলে আসছে। তার গুরুত্বের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সেখানকার বিক্ষোভ দমন করবার জন্য রাজধানীর বেশ কিছু সৈন্য সেখানে আটকে পড়ে আছে। আমাদের পক্ষে এ একটা ভাল সুযোগ।

সবাই বলল, তা ঠিক।

আর ওদের বিক্ষোভের মাত্রা যত বেশী বেড়ে চলবে, আমাদের তত বেশী সুবিধা।

সবাই বলল, তা ঠিক, তা ঠিক।

কাহ্নুরদেব এই প্রসংগে একটা নতুন প্রস্তাব তুললেন—এই যখন অবস্থা, তখন উভয় পক্ষের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কি কৈবর্তদের সংগে কোন রকম পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি না?

না না, তা হতে পারে না, মথনদেব প্রবল ভাবে আপত্তি জানালেন, কৈবর্তদের সংগে কোন রকম চুক্তিতে আবদ্ধ হতে আমাদের মর্যাদায় বাধে। তা ছাড়া আরও বড় কথা, এর ভবিষ্যৎ কখনোই ভাল হতে পারে না। এই বিক্ষোভের ইতিহাসটা আমার ভাল করেই জানা আছে। অভাবের তাড়না এবং গৌড়ের রাজপুরুষ ও বণিকদের বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ নিয়ে এক দিন এই বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এখন বিক্ষোভ আর সেই পর্যায়ে নেই। তারা এখন গৌড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনাদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে চাইছে। আজ যদি আমরা পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হই, তা হলে তা তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। আর এ ভাবে তারা যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে আমাদের ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াবে? এ কথা কে না জানে যে, বরেন্দ্রীর শস্যসম্পদের উপর গৌড়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই জন্যই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে ওখানকার

বিক্ষোভ চলতে থাক, কিন্তু তা যেন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে আমরা কখনোই তাকে বাড়িয়ে তুলব না। আমরা সমস্ত রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করব সে কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে আমরা অপরিণামদর্শী হতে পারি না।

ঠিক এমনি সময় সমস্ত বিহার জুড়ে হঠাৎ একটা কোলাহল জেগে উঠল। শিক্ষার্থী ভিক্ষুরা সবাই সমস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে চলেছে। কি ব্যাপার! গোপন কক্ষে মন্ত্রণারত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চমকে উঠলেন।

কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো? উপগুপ্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

অধিরথ বললেন, না, না, বিপদ নয়। শুনছেন না, ওরা উল্লাস ধ্বনি করছে।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাও দেখে এসো তো সুভদ্র, ঘটনাটা কি? উপগুপ্ত ডেকে বললেন।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সুভদ্র, একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। কিন্তু এবার তাঁর চেহারাটা একেবারেই বদলে গেছে। ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সইল না, বাইরে থেকেই বিহারের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত সুভদ্র, আর সমস্ত শিক্ষার্থীদের সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—হয়ে গেছে! হয়ে গেছে!

কি? কি? কি হয়েছে? এক সংগে বলে উঠলেন সবাই।

বিদ্রোহীরা রাজধানী দখল করে নিয়েছে! রাজা মহীপালদেব যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

এক মুহূর্তের জন্য নিঃশব্দ হয়ে গেলেন সবাই। পরক্ষণেই সবাই এক সংগে কথা বলে উঠলেন। মথনদেব প্রশ্ন করলেন, এই সংবাদ সত্য তো?

এ কি সত্য না হয়ে পারে। সুভদ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, সমস্ত লোক এই নিয়েই বলাবলি করছে, পথের মোড়ে মোড়ে লোকের ভিড় জমে গেছে।

খবরটা প্রথম নিয়ে এল কে, তার খোঁজ করুন।

তাঁর খোঁজ? তাঁর খোঁজ পাওয়া সহজ নয় এখন। সেই প্রথম সংবাদ বাহকটির কথা আমিও ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওরাও কেউ ঠিকমত বলতে পারল না। কিন্তু এ খবর কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। আমরা রাজধানী থেকে অনেকটা দূরে। এখানকার লোক যে যার সাংসারিক ধান্ধা নিয়ে ব্যস্ত। তারা এ সব খবরাখবর রাখে না, আর এ সব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিছু যদি নাই হবে, তবে এমন একটা কথা এ ভাবে ছড়িয়ে পড়বে কেন?

মথনদেব বললেন, ঠিক কথাই। শুধু শুধু এমন একটা কথা ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কিন্তু ওরা কি বলছিল? বিদ্রোহীরা রাজধানী অধিকার করে নিয়েছে? এই বিদ্রোহীরা কারা সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলছে না?

বিদ্রোহীরা কারা, এ প্রশ্ন বাহুল্য মাত্র। আমরা ছাড়া আপনি আর কারু কথা ভাবতে পারেন? সুভদ্র প্রশ্ন করলেন।

না, তা পারি না। আমি ভাবছি কিন্তু আমাদের সংগে কোন রকম পরামর্শ না করেই—

কাহ্নুরদেব বললেন, হয় তো এমন কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যার জন্য পরামর্শ করবার মত সময় ছিল না।

অধিরথ বললেন, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। বন্দী রাজকুমাররা হয় তো যে কোন ভাবেই হোক কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। আর তাদের সামনে নিয়ে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করেছে। এমন এক একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত আছে যা মানুষের ভয়, ভাবনা, দ্বিধা, হিতাহিত বিবেচনা সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

খুবই সম্ভব। তা না হলে এমন হঠাৎ—উপগুপ্ত এই পর্যন্ত বলেই থামলেন।

সুভদ্র বললেন, আমার বিবেচনায় আমাদের এই মুহূর্তেই রাজধানীতে চলে যাওয়া উচিত। রাজধানী অধিকার করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের এতদিনকার অভিযোগগুলি যাতে মিটতে পারে, এবার সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

মথনদেব হেসে বললেন, হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বড় জোর এই মুহূর্তে যাত্রা করতে পারি মাত্র। খুব দ্রুত হেঁটে গেলেও গিয়ে পৌঁছতে অন্তত দুটো দিন তো লাগবেই। কিন্তু আমার মনে হয়, তার আগে খবরটা আমাদের ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার।

অধিরথ সমর্থন করে বললেন, ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। এখান থেকে স্থানীয় রাজপুরুষদের আস্তানা কত দূর ?

দু ক্রোশের কিছু বেশী হবে, সুভদ্র বললেন।

একজন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে সঠিক খবরটা আনিয়ে নেওয়া যায় না ?'

সুভদ্র একটু ভেবে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা পারা যায়।

তবে তাই করুন।

বিহারের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে একটা ঘোড়া আছে। ঘোড়াটা বুড়ো হয়ে এসেছে। তার উপর তার একটা পা একটু খোঁড়া। তা হলেও ঘোড়া তো। একজন পরিচারক তামাটি গ্রামের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এই তামাটিতেই রাজপুরুষদের আস্তানা।

সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় সেই লোক ফিরল। খবর শুনবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

রাজপুরুষেরা কেউ সেখানে নাই, সব ভেগে গেছে।

বল কি, এই অবস্থা! তা হলে কোন খবরই আনতে পার নি ?

হুঁ, আমি তেমনি কাঁচা ছেলে কিনা, খালি হাতেই ফিরে আসব। আমি তখন তামাটি গ্রামের লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁ গো, সঠিক খবর তোমরা বলতে পার? তারা বলল, আমরা তামাটি গ্রামের লোক, সঠিক খবর আমরা বলতে পারব না, কে পারবে! কিন্তু তার আগে বল, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ? আমি বললাম, আমি মধুপুর বিহার থেকে আসছি। শুনে সবাই গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করল, তারপর সঠিক খবর বলল। আমি বললাম, একটা কথা বললেই তো হোল না, এই খবরটা কেমন করে পেয়েছ, কার কাছ থেকে পেয়েছ, সেই সব বৃত্তান্ত বল শুনি। আমি ফিরে গেলে এই সব কথা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবে তো।

শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, আহা, সঠিক খবরটা কি সেইটা আগে বল না।

কিন্তু বক্তা সে কথায় কান দিল না, তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারেই সে বলে চলল: ওরা বলল, আমাদের কাছে কোন বাজে খবর পাবেন না। আমরা তামাটি গ্রামের মানুষ, বাজে কথার ধার ধারি না। আমরা রাজপুরুষদের মুখেই শুনেছি। যাবার আগে তারাই আমাদের এই কথাগুলো বলে গেল কিনা। ওরা বিষম ভয় পেয়েছিল।

সুভদ্র এবার একটা কড়া ধমক দিয়ে বললেন, আগে তোমার খবরটা বলে নাও, আর বাদ বাকী যত কথা পরে বলবে।

সুভদ্রের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সে বলল, খবরটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এমন করলে কোন কথা বলা যায়!

অবশেষে যেই সঠিক খবরটা সে নিবেদন করল, তা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল—এ বলে কি! বরেন্দ্রীর কৈবর্তেরা নাকি রাজধানী গৌড় অধিকার করে নিয়েছে। রাজা মহীপালদেব যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন, এ খবরটা ঠিকই।

শ্রোতাদের কয়েক জন বলে উঠল, তুমি ভুল শুনেছ, এ হতেই

পারে না। বরেন্দ্রীর কৈবর্তেরা এসে গৌড় অধিকার করে নিয়েছে, এ কি একটা কথা নাকি? এতই সাহস আর এতই শক্তি তাদের!

বৃদ্ধ পরিচারক তার কথার উপর এমন অনাস্থার ভাব দেখে দস্তুর-মত চটে উঠল। আমি যা বললাম এইটাই সঠিক খবর। এখন তোমরা বিশ্বাস কর কি না কর, সে তোমাদের খুশী।

খবরটা শোনার সংগে সংগেই মথনদেবের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। আর সবার মত কথাটা তিনি উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আজই তাদের আলোচনার সময় এই আশংকাটা একবারের জন্য তাঁর মনের মধ্যে উঁকি মেরেছিল। কিন্তু এ অসম্ভব, এই কথা বলে জোর করে তিনি তাকে চাপা দিয়েছিলেন। অবশেষে সেই আশংকাই কি সত্য হোল?

তিনি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, যেই কৈবর্তেরা গৌড় অধিকার করল, তাদের নেতার নাম কি? কে তাদের চালনা করে নিয়ে এসেছিল?

হ্যাঁ, ওরা বলেছিল বটে তার নামটা। আঃ কিছুতেই মনে করতে পারছি না—একটা বিতিকিচ্ছি নাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে, তার নাম দিব্বোক।

আর সন্দেহ রইল না। মথনদেব কপালে করাঘাত করে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। এ যা বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। অন্তত আমার মনে তো কোন সন্দেহ নাই। শেষ কালে আমাদের সোনার গৌড় এই বর্বরদের হাতে গিয়ে পড়ল। হা অদৃষ্ট!

মথনদেবের কথা শুনে শ্রোতাদের মধ্যে উদ্বেগের গুঞ্জনধ্বনি উঠল। মথনদেবের আশংকাটা যে অহেতুক নয়, তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে তা বুঝতে কারু বাকী ছিল না। এত কাল যেই কৈবর্তেরা তাদের পায়ের তলায় ছিল. এখন তারাই এসে তাদের উপর শাসন চালাবে!

মথনদেব আবার প্রশ্ন করলেন, রাজা মহীপাল দেবের ভাই

শূরপাল দেব আর রামপাল দেব তাঁদের কোন খবর জান তুমি? তারা বেঁচে আছেন তো?

সে উত্তর দিল, না, তাদের কথা কেউ আমাকে বলে নি।

ওরা আক্রমণ করেছে কবে? কবে ওরা রাজধানী দখল করে নিয়েছে?

কবে? আজ থেকে ঠিক তিন দিন আগে।

মথনদেব অধিরথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর আজ তিনদিন বাদে সেই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছল। দেখুন, ভাগ্যের কি পরিহাস। তিন দিন আগে রাজা মহীপালদেব নিহত হয়েছেন, তাঁর রাজধানী গৌড় পরহস্তগত হয়েছে, আর আমরা আজ তার পতন ঘটানোর জন্য কত আলোচনাই না করলাম!

কারাগারের নির্জন কক্ষের শয্যাহীন কঠিন মেঝের উপর শুয়ে শুয়ে হরিগুপ্ত তাঁর জীবনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতির কুসুম নিয়ে মালা রচনা করে চলেছিলেন। এবার মৃত্যু অবধারিত, পরিত্রাণের কোন পথ নাই। কিন্তু কই, মনের মধ্যে সেজন্য তেমন কোন উদ্বেগ নেই তো।

মৃত্যু যখন দূরে ছিল, তার সম্পর্কে মনে মনে কি ভয় আর উৎকণ্ঠাই না ছিল! কিন্তু এখন নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও সেই মন আজ শান্ত হয়ে এসেছে। কোন তাড়া নেই, ছটফটানি নেই, শুয়ে বসে নিজের মনে চিন্তার জাল বুনে চলেছেন। এ অভিজ্ঞতা জীবনে কোন দিন হয়নি, এখানে না এলে কোন দিন হোতও না।

সংসারে আপন বলতে কেউ নেই তাঁর। বাপ মা মারা গেছেন বহুদিন আগে। ভাই বোন কোন দিনই ছিল না। বিয়ে করেন নি, সংসারে নিতান্তই একা। সংগীর মধ্যে স্তূপীকৃত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ আর তাঁর রোগী ও রোগিণীরা। এর মধ্যে কেমন করে জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক আবর্তে। আর তারই ফলে গৌড়ের সুবিখ্যাত

রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত আজ কারাগারে নির্জন বন্দী, আর মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তাঁর সামনে।

ঝিম ঝিম ঝিম—ঘুম নেমে আসছে চোখে। ঘুমের কোমল, মসৃণ পথে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা ঘা খেয়ে সচকিত হয়ে উঠে বসলেন। সমস্ত কারাগার জুড়ে কিসের একটা দাপাদাপি আর মাতামাতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যাপার কি, এমন গোলমাল কিসের? গোলমালটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কতগুলো পায়ের শব্দ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তারই ঘরের দিকে। এবার কি তবে সত্যসত্যই ডাক পড়েছে তাঁর? পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে? সংগে সংগে মনের আকাশে একটি মূর্তি স্বর্ণ রেখায় ফুটে উঠল। এমনি করেই দিবসে নিশীথে সে বার বার তার কাছে আসে—আসে যায়, যায় আসে—তার নির্জন মুহূর্তগুলিকে আনন্দে বেদনায় অভিষিক্ত করে দেয়। কিন্তু যাবার সময় যদি হয়েই থাকে, তবে আর কেন? রূপৈশ্বর্যময়ী এই পৃথিবীর মতই সেও মিলিয়ে যাক। যাক সব যাক। শুধু একটি মাত্র কামনা, যাবার সময় যেন সহজ ভাবে চলে যেতে পারেন। ছিঁচ কাঁদুনে শিশুর মত জীবন নিয়ে বায়না ধরা, এ বড় লজ্জার কথা, বড় অমর্যাদার কথা।

তালাচাবির ঝন্ ঝন্ শব্দ, তার পর ঘরের দরজাটা খুলে গেল। হরিগুপ্ত অবাক হয়ে দেখলেন রামপাল দেব, শুরপাল দেব এবং আরও কয়েক জন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁকে ডেকে বলেছেন, আসুন, বাইরে বেরিয়ে আসুন। আমরা মুক্ত। আমরা মুক্ত।

তার অর্থ? কি বলছে সব এরা? হরিগুপ্ত অভিভূতের মত বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আমরা মুক্ত, ওরা আবার বলে উঠলেন।

শুধু মুক্তিই নয়, তার চেয়েও বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর কতগুলি

সংবাদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বরেন্দ্রী থেকে কৈবর্তেরা রাজধানী আক্রমণ করেছে। নগর থেকে এক ক্রোশ দূরে দু পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছিল, গৌড়ের সৈন্যেরা পরাজিত হয়েছে। রাজা মহীপালদেব যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। বিজয়ী কৈবর্তেরা নগরের দিকে ছুটে আসছে, এখনই এসে পড়বে। ওদিকে আর এক সংবাদ। আর এক দল কৈবর্ত এই সুযোগে নগরের উত্তরাংশে ঢুকে পড়েছে। তাদের সংগে নগরবাসীদের হাতাহাতি লড়াই চলেছে। কিন্তু বৃথা, এখন আর তাদের কে ঠেকিয়ে রাখবে!

এক সংগে এতগুলো সংবাদ হজম করতে হোল। সময় নেই, ওরা এসে পড়েছে, যা কিছু করবার এই মুহূর্তে করতে হবে। পাঁচজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার প্রহরী রাজকুমারদের নিয়ে নগর ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। রাজকুমারদের জন্য দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বার বার মাটিতে খুর ঘর্ষণ করে নিজেদের অধৈর্য প্রকাশ করে চলেছে। আসন্ন বিপদের আভাসটা ওরাও যেন টের পেয়ে গেছে। রাজভক্ত নগরবাসীরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তারাই কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে। হরিগুপ্ত আর অন্যান্য বন্দীদের সংগে নিয়ে তারা নগর ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। তাদের সবার হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের বেষ্টনী ভেংগে বেরিয়ে যাবে।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে রাজপ্রাসাদের কথা উঠল। রামপালদেব আর শূরপাল দেবের স্ত্রীদের অনেকদিন আগেই তাদের পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু মা? রামপালদেব ইতস্তত করছিলেন। একজন নগরবাসী বলে উঠল, শুনেছি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সবাই চলে গেছে। তিনিও নিশ্চয় সেই সংগে গিয়েছেন। তাঁর জন্য ভাববেন না। ভাববার সময়ই বা কোথায়! আক্রমণকারীদের বিকট উল্লাস ধ্বনি ভেসে আসছে। সেই ধ্বনি কারাগারের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে আরও ভয়া-

বহু রূপ ধারণ করল। ওরা এসে পড়েছে। রাজকুমাররা ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠলেন। তারপর সেই ক্ষুদ্র অশ্বারোহীদল ঘোড়ার খুরে আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়ে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাদের পিছন পিছন ছুটল বাকী লোকেরা। হরিগুপ্ত তাদের সংগেই চললেন। চারদিককার এত ব্যস্ততা, ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, এর মাঝখানে কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের শক্তিতে পথ চলছিলেন না, জনপ্রবাহ তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল। যেতে যেতে রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়াটা চোখে পড়তেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আক্রমণকারীদের বিকট চীৎকারে সারা নগর তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভয়ার্ত জনতা প্রাণ বাঁচাবার ব্যাকুল আগ্রহে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তার মধ্যে কে গেল আর কে রইল, সে খবর কে নেয়!

হরিগুপ্ত চারিদিকে দেখলেন, সমস্ত পথ শূন্য, কোথাও একটা লোক দেখা যায় না। সেই সীমাহীন শূন্যতার মাঝখানে তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ-বর্ণ উন্নত চূড়াটা আবার তাঁর চোখে পড়ল। কি দুর্নিবার তার আকর্ষণ! মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ লক্ষ্য করে ছুটলেন।

নগরের রাজপথের মতই সমস্ত রাজপ্রাসাদ জনশূন্য। রাজবৈদ্য তিনি, এই রাজপ্রাসাদে কতবার তাঁকে আসতে হয়েছে, কিন্তু এমন শূন্যতার দৃশ্য কোন দিনই তাঁর চোখে পড়েনি। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠলেন, কিন্তু কোথাও কেউ নেই। রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত, এ খবর তো আগেই পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু এমন একটা দৃশ্য তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তবে কি বৃথাই তিনি এসেছেন?

ছুটতে ছুটতে রাজপ্রাসাদের উত্তর প্রান্তের সেই অতি পরিচিত আর অতিপ্রিয় কক্ষটির কাছে আসতেই তাঁর পা দুটো অচল হয়ে গেল। দরজার উপর একটা তালা ঝুলছে। বাইরে তালা বন্ধ আর ভিতরে মানুষ থাকবে, এ কি কখনও হয়! তাও হয় বই

কি। কারাগারে এই অবস্থাতেই তো তাদের থাকতে হোত। আর সব ঘরের দরজাগুলো হাঁ করে আছে, এই একটা ঘরেই বা তালা ঝুলছে কেন? হরিগুপ্ত এবার দ্রুত পদে সামনে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজাটার উপর ঘন ঘন করাঘাত করে চললেন।

কে? কে? ভিতর থেকে অতি পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল? হরিগুপ্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, তবে তাঁর আসাটা ব্যর্থ হয় নি।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে আসতে দরজার কাছে এসে থেমে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দু জনই দু জনকে দেখতে পেলেন।

শংখ দেবী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আপনি? এমন সময় আপনি এখানে কেন?

দাঁড়ান, পরে কথা হবে। হরিগুপ্ত দরজা ছেড়ে বিপরীত দিকে ছুটে গেলেন। তারপর খোঁজাখুঁজি করে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে ফিরে এলেন। দুটো ঘা মারতেই দরজার তালাটা ভেংগে খসে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এলেন শংখ দেবী।

আপনাকে এ ভাবে তালা বন্ধ করে রাখল কে?

শংখ দেবী হেসে বললেন, চিঠিটা ধরা পড়বার পর থেকে এই অবস্থাতেই থাকতে হচ্ছে।

আর সবাই প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে ফেলেই চলে গেল!

যে যার প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য অস্থির, এ সময় আমার কথা কার মনে পড়বে!

কিন্তু সে কথা যাক, আপনি মুক্ত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। রামপালের খবর বলুন।

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, রামপাল দেব, শূরপাল দেব এবং অন্যান্য বন্দীরা নিরাপদে নগর ত্যাগ করে চলে গেছেন।

সুসংবাদ। কিন্তু ওরা সবাই নগর ত্যাগ করে গেল, আর এ সময় আপনি এখানে কেন?

শংখ দেবী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ওদের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওরা নগরের খুব কাছে এসে পড়েছে!

হরিগুপ্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওরা কতক্ষণ হয় নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

সে কথা জানবার পরেও আপনি এখানে এলেন কেন? শংখ দেবীর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল।

আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমার ভয় ছিল—এখন দেখছি ভয়টা মিথ্যা নয়।

আবার ওদের চীৎকার শোনা গেল। এবার রাজপ্রাসাদের একেবারে কাছে।

ওরা যে এসে পড়েছে। শংখ দেবী বলে উঠলেন।

হ্যাঁ, ওই যে ওদের দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরা এদিক লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে।

কি করবেন, কোথায় যাবেন, চলুন।

হরিগুপ্ত সামনে এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চারদিকটা দেখে নিয়ে ফিরে এসে বললেন, আর কিছুই করবার নাই, ওরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে?

এখন?

এখন? এখন মরবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শংখ দেবী উত্তর দিলেন, মরবার জন্য কোন বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু আপনি জেনে শুনে এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কেন? মেয়ে মানুষ বলে আমাকে হয়তো ওরা কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে তো ছাড়বে না। বলুন, কেন এলেন?

হরিগুপ্ত কোন উত্তর দিলেন না।

বলুন, আমার কথার উত্তর দিন। বলুন, কেন এলেন? হরিগুপ্তের চোখের উপর চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শংখ দেবী।

আমি জানি না, হরিগুপ্ত স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কিন্তু শংখ দেবীর দৃষ্টি থেকে তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

হরিগুপ্তের এই সংকোচটুকু শংখদেবীর দৃষ্টি এড়াল না। দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত মৃদু হাসি তাঁর ঠোঁটে খেলা করে গেল। আর কোন কথা না বলে শংখদেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটা পুঁটলী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। হরিগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন।

এটা আবার কি? এ দিয়ে কি হবে?

এর মধ্যে আমার সঞ্চিত মণি-মাণিক্য রয়েছে। এ আমার ভবিষ্যতের সম্বল।

ভবিষ্যৎ?

হ্যাঁ, যতক্ষণ আমি আছি, আমার ভবিষ্যৎও আছে। এই বলে পুঁটলীটা হরিগুপ্তের হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন ধরুন। হ্যাঁ, এবার চলুন।

কোথায় যাবেন? হরিগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, ওরা যে আমাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, আর ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আপনি নিজেই দেখুন না। হরিগুপ্ত হাত তুলে সামনের দিকে দেখালেন।

কোন কথা বলবেন না, আপনি আমার পিছন পিছন চলে আসুন। শংখ দেবী সামনে এগিয়ে গেলেন। হরিগুপ্ত হতবুদ্ধির মত তাঁর অনুসরণ করে চললেন।

উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন দুজন। প্রাসাদের পশ্চিমাংশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে শংখ দেবী ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা।

ও আপনি এখানে আত্মগোপন করে থাকতে চান? কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। ওরা ধনরত্নের আশায় সমস্ত প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে। তা ছাড়া ওরা তো এই প্রাসাদে বসবাস করবে। এখানে ইঁদুরের মত

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে, সে আমার সইবে না। প্রকাশ্যে দিবালোকেই মরতে চাই। চলুন, বাইরে চলুন।

মরতে চাইলেই মরা যায় না, বলে শংখ দেবী হরিগুপ্তের হাতের পুঁটলীটা থেকে একটা বাতি আর চকমকি পাথর বার করে বাতিটা ধরালেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘরটা।

ঘরের কোণায় একটা প্রশস্ত লোহার পাত পড়ে আছে। সেটার দিকে অংগুলি করে শংখ দেবী বললেন, নিন, ওটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসুন এদিকে।

কেন ?

আঃ আবার প্রশ্ন! কোন কথা নয়, যা বলছি করুন।

হরিগুপ্ত আর কোন কথা না বলে লোহার পাতটা টেনে নিয়ে এলেন। সংগে সংগে একটা গোপন পথ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল, হরিগুপ্তের হতাশ মনে আশার আলো দেখা দিল। তিনি বললেন, বাতিটা আমার হাতে দিন। আমিই আগে নামি।

উহুঁঃ, আপনি পারবেন না, এ পথ বড় জটিল, আপনাকে পায়ে পায়ে হুঁচোট খেয়ে মরতে হবে। এ পথের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমি আপনাকে ঠিক ভাবেই নিয়ে যেতে পারব। আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু এখন থেকে আপনার পরিচালনার ভার আমিই নিয়ে নিলাম।

দশ

পদ্মনাভ ঘটনার দু দিন আগে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তাঁর সংসারের লোকজন সবাই সেখানে থাকে। নগর থেকে তাঁর গ্রাম প্রায় তিন ক্রোশের ব্যবধান। ঘটনার দিন তাঁর নগরে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় ফিরতে পারেননি। অথচ ফিরে আসাটা খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য সেদিন রাত্রি থাকতেই যাত্রা করেছিলেন, যাতে সকাল বেলাই নগরে গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

এ পথে লোকের বসতি খুবই কম। মাঠের পর মাঠ। বেশীর ভাগ মাঠই পতিত পড়ে আছে। দু পাশে ঝোপ ঝাড়, জংগল আর জলা ভূমি। তার মধ্য দিয়ে পথ। নগরের কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলেন তখন সূর্য কিছুটা উপরে উঠেছে।

পদ্মনাভ স্বভাবতই একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। বিশেষ করে পথ চলবার সময় তাঁর স্বভাবটা আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে। তা না হলে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটা বিশেষত্ব তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারত না। এ সময় রাখালেরা দল বেঁধে এখানে গরু, মোষ ইত্যাদি চরাতে আসে। কিন্তু আজ যে দিকেই তাকানো যাক না কেন, একটা গরু নেই, একটা মানুষ নেই, চার দিক খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু তাঁর নিজের মনটা পূর্ণ ছিল বলেই হয়তো মাঠের এই শূন্যতা তার নজরে পড়ল না।

মাঠের পর মাঠ ভেংগে অবশেষে নগরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন। রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। ব্যাপার কি? অন্য দিন এ সময় এখানে ওখানে

লোকের ভীড় জমে উঠতে থাকে। কিন্তু আজ একটা লোকেরও দেখা নেই, এরা সব গেল কোথায়? বেশ বড় একখানা বাড়ী, তার সামনের দরজাটা ভাংগা। উঁকি মেরে দেখলেন, ভিতরে কোন লোক আছে বলে মনে হোল না। অথচ বেশ মনে পড়ছে, সেদিন যখন এই বাড়ীটার পাশ দিয়ে গেছেন তখন বাড়ীটা লোকজনে জমজমাট ছিল। এরই মধ্যে কি হোল আবার?

উপর দিকে তাকাতেই একটা জিনিস বিশেষ ভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নগরের মাথার উপর বহু শকুন উড়ছে। শুধু উড়ছে নয়, ওরা ঘুরে ঘুরে নগর লক্ষ্য করে নীচের দিকে নেমে আসছে। এমন তো কোনদিন দেখেন নি। এসব কিসের দুর্লক্ষণ? পথের একটা মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল তাঁর সামনে একেবারে পথের উপরেই একদল শকুন গোল হয়ে ভোজের উৎসবে মেতেছে। কুকুর বা অন্য কোন পশুর মৃতদেহ হবে। সামনে যেতেই শকুনগুলি সসম্ভ্রমে তাঁর জন্য পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াল। কিন্তু এ কি দৃশ্য! শিউরে উঠলেন পদ্মনাভ। এ যে মানুষের মৃতদেহ! চুল দাঁড়ি দেখে বোঝা গেল লোকটি বৃদ্ধ। ওরা তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। নগর নয়, নগরের উপকণ্ঠ, তা হলেও রাজধানীর উপকণ্ঠের পথের উপর মানুষের মৃতদেহ নিয়ে শকুনে ছেঁড়াছিড়ি করে খাবে এটা কল্পনাতীত। আকাশে এত শকুনের সমাগমের কারণটা এবার বোঝা গেল। কিন্তু শকুনগুলো নগরের বিভিন্ন অংশে নামছে বলেই যেন মনে হচ্ছে। তার মানে কি? নগরের নানা জায়গায় কি তবে মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে? তবে কি নগরে কোন মহামারী দেখা দিয়েছে? কিন্তু মাত্র তিন দিন হয় তিনি নগর ত্যাগ করে বাইরে গিয়েছিলেন, তখন তেমন কোন ব্যাধির প্রকোপ ছিল না, আর এরই মধ্যে এমন ব্যাপক মহামারী দেখা দিল, তাই বা কেমন করে সম্ভব! কিছু সাংঘাতিক কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা লোককেও তো

দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গেল তারা ? সবাই কি পালিয়ে গেছে ? কিন্তু কেন ? পথের মাঝখানে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

হঠাৎ একটা কোলাহলের শব্দে তাঁর ধ্যান ভেংগে গেল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, কয়েকজন কৈবর্ত হল্লা করতে করতে ছুটে আসছে। একটা নতুন দৃশ্য বটে। আজকাল বরেন্দ্রীর কৈবর্তদের রাজধানীর বুকের উপর খুব কমই দেখা যায়। যাক ভালোই হয়েছে, আসুক ওরা, ওদের মুখে হয়তো নগরের খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওরা এমন করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে আসছে কেন ? ওরা যখন দলবেঁধে শিকারের পিছন তারা করে, তখন এমনি করে ওরা ছোটে। প্রশ্নটার উত্তর পেতে দেরী হোল না। দেখতে দেখতে ওরা যখন তাঁকে এসে ঘিরে ধরল তখন ওদের চোখমুখের ভাব দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা শিকারের সন্ধানেই এসেছে, আর তিনিই এখন ওদের শিকার। ওদের সকলের হাতেই কোন না কোন রকম অস্ত্র।

বরেন্দ্রীর কৈবর্তদের সঙ্গে একদিন যথেষ্ট পরিচয় ছিল তাঁর। কি সুন্দর ওদের ব্যবহার! কত দিন কত জনার কাছে ওদের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু এ মানুষগুলো যেন সে মানুষ নয়। ওদের চোখে কি হিংস্র দৃষ্টি! ওরা তাঁকে শিবিকা থেকে টেনে নামিয়ে তাঁর চুলের মুঠি চেপে ধরল। এদিকে শিবিকাবাহীরা শিবিকা ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের বশে পদ্মনাভ এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, কি চাস্ তোরা ?

সংগে সংগে পিছন থেকে তাঁর পিঠের উপর একটা মুগুরের প্রচণ্ড ঘা পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখলেন পদ্মনাভ। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ছিল না, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যেতেন, কিন্তু ওরা তাঁকে পড়তে দিল না, হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল।

পদ্মনাভ চেতন আর অচেতনের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থান

করছিলেন। ওরা তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছে, কোন্ দিকে চলেছে, কি তাঁর পরিণতি সে কথা বুঝবার মত শক্তি তাঁর ছিল না। কি আশ্চর্য, সেই অবস্থাতেই মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলেন মৃত্যুর পর নরকের যমদূতেরা পাপীদের এমনি করেই নাকি টেনে নিয়ে যায়। চোখের সামনে ঝাপসা অন্ধকার, তবে তার মাঝে দুটো একটা ছবি বিদ্যুতের মতই ভেসে উঠছিল, মিলিয়ে যাচ্ছিল। একবার পায়ের তলায় নরম কি একটা ঠেকল। চেয়ে দেখলেন— ভগবান এ কি দেখালে তুমি—একটি শিশুর মৃতদেহ। আবার সেই মৃতদেহ। তবে কি সারা নগরের রাজপথই মৃতদেহে বিকীর্ণ হয়ে আছে। একবার সন্দেহ হোল, তিনি জীবিত আছেন তো? তাঁর দেহটা সংগেই আছে, না রাজপথে কোথাও পড়ে আছে, তাই নিয়ে শকুনীদের উৎসব চলেছে? না, শরীরটা তার সঙ্গেই আছে, মাথার উপর একটা আঘাত পড়তেই সে কথা উপলব্ধি করতে পারলেন। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে পদ্মনাভ জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, পদ্মনাভ দেখলেন, বড় একটা ঘরের শূন্য মেঝের উপর তিনি পড়ে আছেন। তিনি একা নন, আরও অনেক লোক সেই ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে আছে। তাঁর জ্ঞান হতে দেখে অনেকগুলি দিশাহারা ভয়ার্ত মুখ তাঁর সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল।

এরা তাঁকে সবাই চেনে। রাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক, তাঁকে না চিনবে কে? পদ্মনাভ নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর উত্তরীয় বাস নেই, পরণের ছেঁড়া কাপড়টা কোনমতে লজ্জা নিবারণ করছে। সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত, এখানে ওখানে দলা দলা রক্ত জমে আছে। সমস্ত শরীর জুড়ে হাড় পর্যন্ত অসহ্য বেদনা। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল কৌতূহল। একটু একটু করে সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি শুনলেন।

এটা কারাগার-গৃহ। এ ঘরে যারা, তারা সবাই তাঁরই মত

বন্দী। এদের মধ্যে রাজপুরুষ আছে, সৈন্য আছে, সাধারণ নাগরিকও আছে। এরাই সব নয়, অন্যান্য ঘরে নাকি আরও বন্দী আছে। কিন্তু রাজপথে যাদের মৃতদেহ পড়ে আছে তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বহু গুণ বেশী। সবাই সেই কথাই বলছে।

এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কেমন করে ঘটল? ওদের অশিক্ষিত পদাতিক বাহিনী গৌড়ের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীকে কেমন করে পরাজিত করল? পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন।

একজন উত্তর দিল, ওদের সংগেও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

অশ্বারোহী কৈবর্ত সৈন্য? বলছ কি তোমরা?

না না কৈবর্ত নয় তারা। শুনেছি পীঠি-রাজ দেবরক্ষিত কৈবর্ত-দের সাহায্য করবার জন্য তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

বণিক মধুদত্ত পীঠি-রাজ্য থেকে ফিরে এসে রুদোক সম্পর্কে যে সংবাদটা দিয়েছিলেন, পদ্মনাভের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। ঘটনাচক্রে সেই সংবাদটা তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিল। তার যে কতটা গুরুত্ব ছিল, তা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। পদ্মনাভ এ নিয়ে বরাহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটাকে একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বরাহস্বামী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু কৈবর্তদের ব্যাপারটাকে সব সময়ই তিনি লঘু দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। সব সময়ই বলে এসেছেন, এরা বর্বর। এদের জন্য অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নাই। তার মনে যে ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়ে বসে, তা থেকে তাঁকে বিচলিত করা কারু পক্ষেই সম্ভব হয় না।

বরাহস্বামীর কথাটা মনে পড়তেই পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন, বরাহ-স্বামী নিরাপদে আছেন তো?

ওরা কয়েকজন এক সংগে বলে উঠল, বরাহস্বামী? তিনি বেঁচে নেই। কৈবর্তেরা তাঁদের দলটাকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। বরাহস্বামী যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। পদ্মনাভ স্তব্ধ

হয়ে গেলেন। কতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা ফুটল না।

বন্দীদের মধ্যে নানা জনের নানা অবস্থা। গুরুতর আহত যারা, তারা শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। কেউ কেউ শিশুর মত কান্নাকাটি করছে, কেউ বা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে। অনেকেই এসে ঘিরে ধরেছে পদ্মনাভকে। এখানে তিনিই সব চেয়ে বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ লোক। সবাই তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু আশার বাণী শুনতে চাইছে।

একজন বলছিল, ওরা কি আমাদের হত্যা করবে? আপনি কি তাই মনে করেন? কেন, আমরা কি করেছি?

পদ্মনাভের এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। হত্যার জন্য কি কোন অপরাধ করার প্রয়োজন আছে? যারা নিহত হয়, তাদের মধ্যে ক'জন আর দোষী?

সেই সুকোমলদেহ শিশুটি, যার স্পর্শ এখনও তার গায়ের সংগে লেগে আছে, এ সংসারে কার কাছে কি দোষ সে করেছিল?

কি বলবেন পদ্মনাভ? ওদের হতাশ করতে মনে ব্যথা লাগে। কিন্তু মৃত্যু তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এ কথা নিশ্চিত ভাবে বুঝেও আশার কথা শোনানো, তার মধ্যেও যেন একটা নিষ্ঠুরতা আছে।

বন্ধ দরজাটা খুলে ক'জন কৈবর্ত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। সবার আগে যে, পোশাকে আর চাল চলনে তাকে একটা নেতা গোছের লোক বলেই মনে হয়। কুচ্‌কুচে কালো রং—এমন কালো কৈবর্তদের মধ্যেও সুলভ নয়। তার বাবড়ী চুলের বাহারটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মত। ওরা ঘরে ঢুকতেই যারা পদ্মনাভকে ঘিরে ধরেছিল, তারা চোখের পলকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল 'পরভু'।

এই তবে সেই পরভু, সেই বিখ্যাত দস্যু, যার নাম গৌড়বাসীদের কাছে সুপরিচিত। তার দুঃসাহসের কাহিনী লোকের ঘরে ঘরে, মুখে

মুখে ছড়িয়ে আছে। পদ্মনাভ তাকে ভাল করে দেখবার জন্য বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন।

পদ্মনাভের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। একটু বাদেই পরভু গট্ গট্ করে এগিয়ে এল। তার দলবল তার পিছনে চলল। বন্দীরা ত্রস্ত ও সংকুচিত হয়ে সরে গিয়ে তাদের পথ করে দিল। পদ্মনাভের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পরভু, তারপর তাঁর আপাদ মস্তক পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্ন করল, তুমি এ রাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলে?

পদ্মনাভ বিস্মিত হলেন, এরা কেমন করে এ কথাটা জানল? পরক্ষণেই মনে হোল বন্দীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে, তা নইলে আর কেমন করে জানবে! তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। পরভু আর কোন কথা না বলেই চলে গেল। পদ্মনাভ লক্ষ্য করলেন, সে যাওয়ার আগে তাঁকে দেখিয়ে প্রহরীদের কাছে কি যেন বলল। কি বলছে পরভু? পদ্মনাভ মনে মনে ভাবলেন।

তাঁর এই কৌতুহল মিটতে দেরী হোল না। পরভু চলে যাবার সংগে সংগেই দু জন কৈবর্ত প্রহরী এসে তাঁকে এ ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল। ঘরটা ছেড়ে আসবার সময় সমস্ত বন্দীরা এমন কাতর ভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকাল যে তাঁর মনে হোল এবার তার ডাক এসে গেছে, এ ডাক আর ফিরানো যাবে না। কিন্তু না, যা ভেবেছিলেন, তা নয় ওরা তাঁকে নিয়ে কিছু দূরে আর একটা ছোট্ট কুঠরীর মধ্যে পুরল। কুঠরীটা অন্ধকার, তার উপর বাতাস খুব কমই ঢুকতে পারে। বড় ক্লান্ত লাগছিল, পদ্মনাভ ভিজে সাঁৎসেঁতে মেঝের উপর আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন।

কিন্তু বেলা যতই বেড়ে চলল, ক্ষুধা তৃষ্ণাও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। মনের কোণায় ক্ষীণ একটু আশা ছিল, কিন্তু বৃথা, কেউ কোন আহার্য বা পানীয় নিয়ে এল না। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই হাসলেন পদ্মনাভ। মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার

একটা কথা। দেবীর মন্দিরে পূজো দেখতে গিয়েছিলেন, তখন তার বয়স আর কত? কিন্তু সেই ছবিটা এখনও যেন স্পষ্ট তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। একটু বাদেই বলি হবে। বলির ছাগশিশুটি যুপকাষ্ঠের সংগে বাঁধা রয়েছে। কে যেন একটা কাঁঠালের ঘনপত্র ডাল ওর সামনে এনে দিয়ে গেছে। ও মহা আনন্দে সেই পাতা চিবিয়ে চলেছে। ওর চোখে মুখে সে কি তৃপ্তি। সে দিন ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছিল। বলির বাজনা বাজাবার জন্য ঢাকী যখন তার প্রকাণ্ড ঢাকটা নিয়ে এসে দাঁড়াল, তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন মন্দির ছেড়ে। সেদিন তাঁর আর পূজো দেখা হোল না। আজ নিজেকে সেই নির্বোধ ছাগশিশুটার মতই মনে হচ্ছে।

কত দিনের কত কথাই যে মনে পড়ছে। ক্রমে বেলা গড়িয়ে গেল. ক্ষুধার তীব্রতাটা আগেকার চেয়ে কমে এল বটে, কিন্তু পিপাসা ক্রমেই বেড়ে চলল। শরীরের উপর দিয়ে আজ যে ধকলটা গেছে, হয়তো শরীরটা সেই জন্যই এত বেশী করে জল চাইছে।

বিকেল ছাড়িয়ে সন্ধ্যা,সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি নেমে এল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল। শরীরের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। তখন কত রাত্রি কে জানে, নিজের অজান্তেই 'জল' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

কতক্ষণ বাদে বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, এই যে, ও মানুষ শোন, জল খাবে তো সামনে এসো।

কে, কে তাকে ডাকছে জল খেতে। এখানে, এমন সময়, এমন বন্ধু কে তাঁর আছে। বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন। হোক স্বপ্ন, তাও ভাল। চুম্বকের টানে লোহা যেমন করে ছোটে, তেমনি করে তিনি কুঠরীর দরজাটার দিকে ছুটে যেতে চাইলেন। গায়ের বেদনাটা আরও বেড়েছে, জ্বরের দাহে সারা গা পুড়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতে পারলেন না, পশুর মত হাতে পায়ে ভর করে এগিয়ে গেলেন।

দরজার বাইরে কৈবর্ত প্রহরী হাতে জলের পাত্র নিয়ে সামনের

দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই ওর বাতিটা জ্বলছে, সেই আলোতেই তিনি তাকে দেখতে পেলেন।

এই যে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছি, তুমি হাত পেতে নাও।

আঃ কি আরাম। অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করে পদ্মনাভের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণ ক্ষিদের কথাটা মনেই ছিল না, এখন তার খোঁচানি শুরু হয়ে গেল।

ঠিক তখনই প্রহরী প্রশ্ন করল, আজ তোমাকে কি দিয়েছে খেতে ?

পদ্মনাভ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

ও, কিছুই দেয়নি বুঝি ? আহা, সারাটা দিন। আচ্ছা, তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে বোসো আমি দেখছি।

এই কথা বলেই প্রহরী অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজার সামনে বাতিটা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলতে লাগল। পদ্মনাভ প্রহরীর কথার তাৎপর্যটা ধরতে পারেননি। আর ভিতরে যেতে ইচ্ছা হোল না, দরজার কাছেই পড়ে রইলেন।

একটু বাদেই সে ফিরে এসে ডাকাডাকি শুরু করল ওগো, ওঠো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? পদ্মনাভ ঘুমোননি, সাড়া দিলেন, কেন ? সময় হয়েছে ? বাইরে যেতে হবে নাকি ?

বাইরে। বাইরে কোথায় যাবে ?

আমাদের হত্যার সময় হয়নি এখনও ? কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করলেই তো চুকে যায়। আহা, আমি কি সেই কথা বলছি নাকি ? আমি তোমার জন্য খুঁজে পেতে কিছু খাবার এনেছি। নাও, ওঠো।

পদ্মনাভ ততক্ষণে উঠে বসেছেন। দেখছেন, সত্যিই তো, একটা পাতায় করে কি যেন খাবার নিয়ে এসেছে। তিনি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ কি উল্‌টো পাল্‌টা

সব ব্যাপার। শত্রু পক্ষের লোক যার সংগে এখন শুধু প্রাণ দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক সে তাঁর জন্য এত করছে কেন? বাতির আলোয় যতটুকু দেখা গেল, তাতে দেখতে পেলেন সেই বর্বর কৈবর্তের চোখ দুটি থেকে স্নিগ্ধ সমবেদনা ঝরে পড়ছে।

লোকটির বয়স হয়েছে, মাথার চুল কালোর চেয়ে সাদাই বেশী। তার মুখের দিকে তাকিয়ে পদ্মনাভের মনটা আবেগে ভারী হয়ে উঠল।

নাও, ধর, অমন করে চেয়ে রইলে কেন?

পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটি কি ভাই?

এই দেখ, এখন নামের কোন্ দরকারটা পড়ল? আমার নাম অভিমন্ন। হোল তো, নাও।

পদ্মনাভ দরজার ফাঁক দিয়ে খাবারগুলো নিয়ে খেতে লাগলেন। নিতান্ত সাধারণ খাদ্য, কিন্তু অমৃতের মতই মনে হচ্ছে। একি শুধু ক্ষিদের জন্যই, না অভিমন্নর হাতের গুণ?

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ওদের কথা যারা ওই বড় ঘরটায় আটক আছে। ওদের তো কাল থেকে এ পর্যন্ত কিছুই পেটে পড়ে নি, জলটুকু পর্যন্ত না। অমৃতে আর রুচি রইল না, হাত তুলে বসে রইলেন।

অভিমন্ন আপত্তি জানিয়ে বলল, ওটুকু আবার ফেলে রাখলে কেন?

আর পারছি না, পদ্মনাভ আবার একটু জল চেয়ে নিয়ে খেলেন।

কতক্ষণ চুপচাপ কাটল। পদ্মনাভই প্রথম কথা বললেন, আমাদের সবাইকেই হত্যা করা হবে, তাই না?

তাই তো শুনছি, অভিমন্ন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

কেন?

এই 'কেন'র উত্তরে কি যে বলা যায়, অভিমন্ন সম্ভবত তখনই সেই কথাটা খুঁজে পেল না। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, আমাদের

রাজা দিব্বোক এ সব বেশী পছন্দ করেন না! তাঁর প্রথম থেকেই আদেশ দেওয়া আছে, মেয়েদের আর বাচ্চাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না, কারু ঘরে আগুন দিতে পারবে না। যে এই নিষেধ মানবে না তার কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু পরভু যে ক্ষেপে একেবারে আগুন হয়ে আছে! এ আগুন সহজে শান্ত হবার নয়। আর রাজা দিব্বোক তার কথা একেবারে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন না।

কেন, পরভু এমন আগুন হয়ে আছে কেন?

অভিমন্ন উত্তর দিল, হবে না! মানুষের চামড়া যার গায়ে আছে, সে কখনও এ সব চুপ করে সয়ে যেতে পারে? যে মেয়েটার সংগে ওর ভাব হয়েছিল, এমন কি বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তাকেই কিনা ওরা চুরি করে নিয়ে গেল। সেই যে গেল তো গেল, আজ পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে তাও কেউ বলতে পারে না।

কারা চুরি করে নিয়ে গেছে? পদ্মনাভ প্রশ্ন করলেন।

যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা তো আর তাদের নাম লিখে রেখে যায় নি। তবে এ কথা কারু অজানা নেই, হয় রাজপুরুষ নয় তো গৌড়ের বণিক, এ তাদেরই কাজ। তারা ছাড়া আর কেই-বা করবে! কৈবর্তদের সমাজে এই রীতি কোন দিনই ছিল না, আজও নেই। একটি দুটি মেয়ে নয়, এ ভাবে কত মেয়ে যে উধাও হয়ে গেছে, তার সীমাসংখ্যা আছে? মেয়েটাকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল পরভু। তার পরই তো সে এই পথে নামল।

এই তো একমাত্র কথা নয়, আরও অনেক কথা আছে। পরভুর বাড়ী শিয়ালমারি গ্রামে। পরভুর গ্রাম বলে তোমাদের সৈন্যেরা সেই গ্রামের সমস্ত ঘর বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সেই একটা গ্রামে দেড় কুড়ি পুরুষ মেয়ে আর বাচ্চাকে ওরা ঘরের মধ্যে আটকে রেখে সেই ঘরে আগুন দিয়ে তাদের পুরিয়ে মেরেছে। এই ভাবে

গ্রামের পর গ্রাম ওরা উচ্ছন্ন করেছে। বছরের পর বছর ধরে কি যে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে ওরা, সে সব কথা কি আর আমরা ভুলে যেতে পারি! শুধু পরভুই তো নয়, বরেন্দ্রীর সমস্ত মানুষ, কি পুরুষ, কি মেয়ে, সবাই আগুন হয়েছিল। এই আমার কথাই ধর না, এ সব মারামারি কাটাকাটি কোন দিনই আমার ভাল লাগত না। কিন্তু এ সব দেখে শুনে—বিশেষ করে আমার বড় আদরের ছোট ভাইটাকে মেরে ফেলবার পর আমি কি মানুষ হয়ে গেলাম! রাত দিন শুধু এই কথাই বলতাম, ওলান ঠাকুর, ওলান ঠাকুর, তোমার ইচ্ছায় সব চলে। তুমি তো যা খুশী তাই করতে পার। তোমার কাছে আর কিছু চাই না, শুধু এইটুকুই চাই, আমাকে আরও কিছু দিন বাঁচিয়ে রেখো। আর হাতের এই বলটুকু রেখো, যেন তোমার আদেশে ওদের যখন নিপাত ঘটবে, তখন আমার এই দুটো হাত দিয়ে আমি অন্তত ওদের একশোটাকে যেন মারতে পারি। আমার গোষ্ঠির মানুষ, যাদের ওরা মেরে ফেলেছে, তাদের আত্মা এতে শান্তি পাবে। আমিও তাতে শান্তি পাব। তার পর দিনই যদি আমাকে মরতে হয় আমি কোন কথা বলব না, হাসিমুখে মরে যাব।

পদ্মনাভ স্তম্ভিত হয়ে তার কথা শুনছিলেন। অভিমন্যু একটানা এতগুলি কথা বলে নিয়ে একটু থামতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ক'জনকে মারতে পেরেছ এ পর্যন্ত?

ও কথা আর বোলো না। এই দুটো দিন আমার চোখের সামনে যা দেখলাম·আমি ক'জনকে মেরেছি সে কথা আমি নিজেই জানি না। যখন আমরা নগরে এসে ঢুকলাম তখন প্রায় সবাই নগর ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখানে ওখানে কিছু কিছু বাকী ছিল। আমাদের লোকেরা ঘরে ঘরে ঢুকে তাদের শিকার খুঁজে ফিরছিল। হঠাৎ কোথা থেকে তাড়া খেয়ে একটা লোক আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। আমিও আমার তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরে পিছন

পিছন ছুটলাম। বেশী দূর যেতে পারল না, কয়েক কদম ছুটে গিয়ে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরলাম। ও ভয়ে থর থর কাঁপতে লাগল, একটা কথাও বলতে পারল না, কিন্তু এমন করে আমার মুখের দিকে তাকাল যে আমি পারলাম না, চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বললাম, যা চলে যা। ও তখনও ঠিক বুঝতে পারে নি, ঠিক তেমনি ভাবে হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তাড়া দিয়ে বললাম, পালা! মরবি নাকি, পালা! ও তখন যে দিকে চোখ যায়, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। কিন্তু মরণ ওকে ছাড়ল না। উল্‌টো দিক থেকে আমাদের ক'জন লোক আসছিল, পড়বি তো পড়, সে ওদের মাঝখানেই গিয়ে পড়ল। আর কি কথা আছে। ওরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, আর দেখতে দেখতে রক্তের নদী বয়ে গেল। ওর কাটা ধড়টা এক বার লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

আমাদের লোকেরা হল্লা করতে করতে চলে গেল। আমার কি মনে হোল, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম সামনে। ওর কাটা মাথাটা একটু দূরে ছিটকে এসে পড়েছে। ওর চোখ দুটো বুজে গেছে, মুখের ভাব শান্ত, ভয়ের চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আমি শিউরে উঠে দু হাত দিয়ে আমার চোখ ঢেকে বসে পড়লাম। এ যে অবিকল আমার ছোট ভাইটার মত। ওরা তার মাথাটাকেও কেটে এমনি করে পথের উপর ফেলে রেখেছিল, যাতে লোকে দেখে ভয় পায়।

তোমার ভাই কেমন করে মারা পড়ল? পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন।

অভিমন্যু উত্তর দিল, আর কেমন করে! যেমন করে আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা মারা গেছে তেমনি করেই। উপমন্যু পরভুর দলে যোগ দিয়েছিল। একদিন তোমাদের সৈন্যদের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল। রাজপুরুষেরা প্রথমেই ওকে মারল না, নানা ভাবে অত্যাচার করে ওর কাছ থেকে পরভুর দলের ভিতরের কথা

বার করে নেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। পাঁচ দিন পর্যন্ত তারা ওকে কিছুই খেতে দেয় নি, জলটুকু পর্যন্ত না। শুনেছি, ও যখন জল জল করে চ্যাঁচাত, তখন তারা জোর করে ওর মুখে প্রস্রাব ঢেলে দিত। ওদের এই অত্যাচারের ফলে উপমন্ন মারা গেল। সে আজ থেকে এক বছর আগেকার কথা। ওরা তার মাথাটা কেটে রাস্তার উপর ফেলে রেখেছিল। আমি নিজে চোখে দেখেছি, তা কি কোনদিন ভুলতে পারব!

পদ্মনাভের মনে হচ্ছিল, তিনিই যেন মূল অপরাধী। তাঁকে বিচার সভায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। আর বরেন্দ্রীর সমস্ত কৈবর্তদের মুখপাত্র হয়ে অভিমন্ন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করছে। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত একটি কথাও তার বলবার নেই। চুপ করে রইলেন তিনি। অভিমন্নর মুখেও কোন কথা নেই।

কিন্তু অভিমন্নই প্রথম কথা বলল। বলল, তুমি তখন 'জল' 'জল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে। শুনেই আমার মনে পড়ে গেল উপমন্নর কথা। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এলাম। আর যখন তোমাকে খাওয়াচ্ছিলাম, আমার মনে কি হচ্ছিল জান? মনে হচ্ছিল যেন আমার ভাই উপমন্নকেই খাওয়াচ্ছি। বিশ্বাস করবে তুমি আমার কথা?

পদ্মনাভ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তুমি যা যা বলেছ আমি তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকুই বিশ্বাস করি। আমার কি ভাগ্য পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে তোমার মত একজন মানুষের সংগে আমার দেখা হয়ে গেল। মরবার পর যদি ভগবানের সংগে দেখা হয় তবে আমি তাকে তোমার কথা বলব। বলব প্রভু, তোমার সৃষ্টিতে বড় অবিচার, বড় অত্যাচার আর বড় নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তার মাঝখানে এমন সুন্দর একটি মানুষ তুমি সৃষ্টি করেছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আবেগের প্রাবল্যে পদ্মনাভের কণ্ঠস্বর নীচু খাদে নেমে এসেছিল তার শেষের কথা কয়টা অভিমন্যু ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে যে গভীর আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল, তা তার মনের তন্ত্রীতে গিয়ে ঘা মারল। দরজার ফাঁক দিয়ে হাতটা গলিয়ে দিয়ে পদ্মনাভের একটা হাত সে চেপে ধরে বলল, এ কথা কাউকে বলিনি, বলবও না, শুধু তোমাকেই বলেছি। কাল এই নগরে পা দেবার পর থেকে কম মানুষ মরতে দেখলাম না। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে যার মুখের দিকে তাকাই, আমার মনে হয় আমার ভাই উপমন্যুকেই যেন দেখছি। মনে হয় ওরা বার বার করে তাকে আমার সামনে মারছে। এ আমার কি হোল, আমি কালো আর সাদা, কৈবর্ত আর গৌড়-বাসী, আপন আর পর কিছুই ভেদ করতে পারছি না। আমার চোখে সবই যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমার এই কথা আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিই শুধু পারবে, সেই জন্য তোমাকে বলেছি।

পদ্মনাভ বললেন, আমি তোমার সব কথাই বুঝতে পারছি, তোমাকে চিনতে আমার আর বাকী নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অভিমন্যু কিছুটা নিজের মনে, কিছুটা পদ্মনাভকে উদ্দেশ করে বলল, যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকত, আমি এখানকার রাজা, তার দুষ্ট মন্ত্রীরা যারা তাকে কুপরামর্শ দিয়েছে, আর যে সমস্ত রাজপুরুষেরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তারা ছাড়া আর কাউকে কিছু বলতাম না। আর কেউ তো কোন দোষ করেনি।

পদ্মনাভ বুঝলেন, অভিমন্যু এখন আর অভিযোগকারী নয়, সে ন্যায় বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত। তার বিচারে তিনি দোষীদের মধ্যে অন্যতম বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। এই বিচার তিনি মাথা পেতে নিলেন। মনে মনে বললেন, সত্য সত্যই আমি দোষী, আমার দণ্ড পাওয়াই উচিত।

পদ্মনাভ কতক্ষণ ধরে একটা কথা বলি-বলি করছিলেন। কোমরে একটি সোনার কবচ ছিল, সেটা খুলে অভিমন্নের হাতে দিয়ে বললেন, আমার সংগে আর তো কিছুই নাই, এই একটা জিনিস মাত্র আছে, এটা তোমাকে উপহার দিচ্ছি, তুমি নাও।

কেন, এ দিয়ে কি করব আমি? অভিমন্ন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

কি করবে? পদ্মনাভ হেসে বললেন, এ খুব ভাল সোনা। ওজনেও ভারী আছে। সোনা কার না কাজে লাগে!

অভিমন্ন কবচটা নিয়ে বাতির সামনে ধরে দেখল। সত্যই তো সোনা। গরীব মানুষ অভিমন্ন, তার চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের ভাব কেমন যেন ম্লান হয়ে এল।

তুমি কি ভাবছ এই জন্যই তোমাকে আমি—না না না, তোমার জিনিস তুমি ফিরিয়ে নাও।

ছি ছি, একি কথা বলছ? পদ্মনাভ বাধা দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে চিনেছি, ভাল করেই চিনেছি, কিন্তু তুমি এখনও আমাকে চিনতে পারছ না। আমি তোমাকে ভালবেসে দিয়ে দিচ্ছি। আজকের দিনে তোমার মত আপনার মানুষ আর আমার কে আছে! আর এ তো আমার কোন কাজেই লাগবে না। চলে যাবার সময় সব কিছু ফেলে রেখেই চলে যেতে হবে। তখন যে পাবে, সেই নিয়ে নেবে। তার চেয়ে তুমি যদি নাও আমি বড় আনন্দ পাব। এ তুমি ফিরিয়ে দিও না।

পদ্মনাভ অনুভব করলেন, তার হাতের মধ্যে ওর হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অভিমন্ন মৃদু কণ্ঠে বলল, তোমার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি?

পদ্মনাভ হেসে উঠলেন, আমার জন্য? আমার জন্য আর কি করবার আছে?

কিছুই নাই? অভিমন্ন হতাশ স্বরে প্রশ্ন করল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পদ্মনাভের। সংশয়ভরা কণ্ঠে বললেন কিন্তু তুমি কি সে কাজ করতে পারবে?

পারব, নিশ্চয় পারব, তুমি বল।

আমি একখানা লিপি পাঠাতে চাই একজনের কাছে।

খুব পারব। কে সে বল। কোথায় থাকে? কোথায় পাব তাকে?

তোমাদের রাজা দিব্বোক, তার কাছেই পাঠাতে চাই।

আমাদের রাজা দিব্বোক—তাঁকে চেন তুমি? অভিমন্ন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ চিনি, খুব ভাল করেই চিনি।

যেই প্রশ্নটা অনেক আগেই করার কথা, সেই প্রশ্নটা এখন অভিমন্নর মনে পড়ে গেল, সে আগ্রহের সংগে বলে উঠল, তুমি কে? তোমার নাম কি?

আমার নাম? আমার নাম পদ্মনাভ।

অভিমন্ন তার আসল প্রশ্নটার উত্তর পায়নি, সে কথা সে মুখ ফুটে না বললেও পদ্মনাভের তা বুঝতে বাকী ছিল না। কিন্তু আত্মপরিচয় দিতে সংকোচ হচ্ছিল মনে। নিজের এই দুর্বলতা টের পেয়ে নিজের উপর কঠিন হয়ে উঠে মনে মনে বললেন, হায় রে, মরতে বসেও ছলনা। তাঁর পরিচয় পাওয়ার সংগে সংগেই অভিমন্নর মন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। চরম সংকটের মধ্যেই যে সুন্দর পরিবেশটি গড়ে উঠেছে, তা মুহূর্তের মধ্যে আবিল হয়ে উঠবে, এ কথা ভেবে ব্যথায় ভরে উঠছিল মন, কিন্তু না, তবু তিনি আত্মগোপন করবেন না। বললেন, আমি গৌড়ের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলাম। আমার নাম পদ্মনাভ।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক! পরম বিস্ময়ের সংগে এই কথাটি উচ্চারণ করেই অভিমন্ন চুপ করে রইল।

পদ্মনাভ তার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ও, সেই জন্য আপনাকে ওদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে ?

'আপনাকে! পদ্মনাভের কানে কঠিন আঘাতের মতই এসে বাজল। এ যে হবে, এ তো জানা কথাই। কতক্ষণ চুপ করে কি চিন্তা করল অভিমন্ন, তার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কিন্তু তুমি যাই হও না কেন, তুমি কখনোই খারাপ লোক হতে পার না—না না, কিছুতেই না।

পদ্মনাভ হেসে উঠলেন। সে হাসিতে একটু ব্যংগের সুর কিন্তু তার সঙ্গে একটু আনন্দও মিলে আছে। বললেন, নিঠুর মাংসাশী বাঘ বিপদে পড়লে ভেড়া বনে যেতে পারে, কিন্তু তা হলেও বাঘ বাঘই।

উঁহু: আমাকে ও সব কথা বলে ভুল বোঝাতে পারবে না, অভিমন্ন প্রতিবাদ করে বলল। আমি শিক্ষিত লোক নই, সোজা বুদ্ধির মানুষ, কিন্তু তাহলেও আমি মানুষ চিনি। দাও, তোমার লিপি দাও। যেমন করেই পারি, তোমার এই লিপি আমি জায়গামত পৌঁছে দেব। এই বলে অভিমন্ন নেবার জন্য হাত বাড়াল।

হায় ঈশ্বর। কোথায় পাব লিপি। তুমি যদি লেখার উপকরণ এনে দাও, তবেই লিখতে পারি। তা নইলে কেমন করে লিখব! কিন্তু তা কি যোগাড় করে এনে দিতে পারবে তুমি ?

ও, তাই তো, অভিমন্ন চুপ করে একটু করে ভাবল, শেষে বলল, আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।

পদ্মনাভের মনে আশা খুব কমই ছিল, কিন্তু দণ্ডখানেক পরে অভিমন্ন সত্যসত্যই লেখার সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এল।

পদ্মনাভ দিব্বোককে উদ্দেশ করে লিখলেন:

আমার কথা সম্ভবত আপনার মনে আছে। দু জনে বসে এক দিন কত কল্পনাই না করেছিলাম। আমাদের দু জনের মনের গতি

ছিল একই দিকে কিন্তু কি বিচিত্র মানুষের জীবন, ঘটনার প্রবাহ আমাকে বিপরীত দিকে, টেনে নিয়ে গেল। তাই আজ আমি আপনাদের শত্রুপক্ষ। জীবন ভিক্ষা চাইছিনা, সত্য করেই বলছি, জীবনের সাধ আমার মিটে গেছে। তবে মরবার আগে আপনার সংগে একবার সাক্ষাৎ করতে পারলে বড় সুখী হোতাম। কিন্তু তা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?

আপনার কাছে একটা শেষ প্রার্থনা আছে। আপনার মনের সংগে পরিচয় আছে বলেই কথাটা বলতে ভরসা পাচ্ছি। রাজার পক্ষ থেকে আপনাদের উপর যে সমস্ত অবিচার, অত্যাচার, করা হয়েছে, পদাধিকারসূত্রে আমিও তার সংগে জড়িত হয়ে আছি। সে কথা আমি অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু আর যে সমস্ত বন্দী এখানে মৃত্যুর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণে চলেছে, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। কোন দণ্ডই এদের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এদের মুক্তি দিন। ভগবান আপনাদের মংগল করুন।

অভিমন্নর মনের কথা যা-ই থাক, চিঠিটার মর্ম সে শুনতে চায় নি। পদ্মনাভ নিজেই উদ্যোগী হয়ে চিঠিটা তাকে পড়ে শোনালেন। পাঠ শেষ হবার পর অভিমন্ন বলল, নিজের কথাটা অমন করে বাদ দিয়ে গেলে কেন? তুমি নিজে কোন দোষে দোষী নও সে কথাটাও স্পষ্ট করে লিখে দাও। আমি তোমার মুখ দেখেই বলে দিতে পারি তুমি কারু উপর কোন অন্যায় করতে পার না।

পদ্মনাভ আর একটি কথাও লিখতে রাজী হলেন না। পরম তৃপ্তির হাসি হেসে চিঠিখানা হাতে তুলে দিয়ে তাকে বললেন, তুমি কি সত্যসত্যই তাই মনে কর? আর মনে মনে বললেন, যাবার আগে পৃথিবীর কাছ থেকে এই শেষ উপহারটুকু নিয়ে গেলাম।

অভিমন্নর পাহারার পালা শেষ হয়ে গেলে সে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল পদ্মনাভের জন্য সে ওলান ঠাকুরের কাছে

মানত করবে। ওলান ঠাকুর যদি প্রসন্ন হন, তবে অসাধ্য সাধন হয়ে যেতে পারে।

পদ্মনাভ শুয়ে শুয়ে পুরানো দিনের কথা ভাবতে লাগলেন। বরেন্দ্রীতে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি একবার এই দিব্বোকের গৃহে তিন দিন অতিথি হয়ে ছিলেন। তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষ, তখনও মহাসান্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত হন নি। কি আনন্দময় ছিল সেই দিনগুলি! আজ অভিমন্ন তার সম্পর্কে যে কথা বলছে, এক দিন সবাই তাই বলত। বলত, এ মানুষ কোন দিন কারু উপর কোন অন্যায় করতে পারে না।

বরেন্দ্রীর এই কৈবর্তদের সেদিন তাঁর কি ভালই না লেগেছিল। আর তাদের রাজা দিব্বোকের চরিত্র আর কার্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। গৌড়ের রাজা মহীপাল তাঁর রাজ্যের, আর এই দিব্বোক বরেন্দ্রীর সমস্ত কৈবর্তদের হৃদয়রাজ্যের রাজা। একটা মানুধ যে নিজের চিন্তাকে সমাজের সমস্ত মানুষের চিন্তার সংগে এমন করে মিলিয়ে দিতে পারে, এ কথা তাঁর ভাবনার অতীত ছিল।

গৌড়ের মানুষ যে কথা ভাবতে পারে না, বরেন্দ্রীতে গিয়ে তাই তিনি দেখেছিলেন। আর গৌড়ের লোকেরা কি না এদের বর্বর বলে আখ্যা দেয়। ক'টি দিনের মধ্যেই তাঁরা পরস্পর অন্তরংগ হয়ে উঠেছিলেন। দিব্বোকের কাছে কথা দিয়েছিলেন, তিনি বরেন্দ্রীতে গিয়ে তাঁর ঘর বাঁধবেন, আর কৈবর্তদের মধ্যে শিক্ষা দান করে তাঁর জীবনপাত করবেন। এই হবে তার জীবনের ব্রত। সেদিন তাঁর এই কথার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না, পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়েই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল। গুরু বরাহ-স্বামীর অদ্ভুত প্রভাব তাঁর উপর। যেন জোর করে তাঁকে মহাসান্ধি-বিগ্রহিকের পদে বসিয়ে দিলেন। সে শুধু তাঁর যোগ্যতার জন্য নয়, তিনি তাঁকে নিজের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন; এই

আশা নিয়েই তাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন, এ কথা আজ আর তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। অনেক আপত্তি করেছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত গুরুর প্রবলতর ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হোল। তারপর। তারপর যারা শোষণকারী, যারা অত্যাচারী, সব কিছু জেনে শুনেও তাদের সংগে যোগ দিলেন, ক্রমে ক্রমে তাদের সংগে মিশে যেন এক হয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সুদক্ষ সাপুড়ের মত মন্ত্র পড়ে তাঁকে বশ করেছেন। সে মন্ত্র জাতির কল্যাণের মন্ত্র। এর নাম জাতির কল্যাণ?

কৈবর্তদের উপর যে অত্যাচার চলছিল, সে কথা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তা দূরের জিনিস, তাই তার আঁচটা তাঁর মনের উপর তেমন করে এসে পড়েনি। কিন্তু অভিমন্যু তারই ছবিটা তাঁর চোখের সামনে এনে ধরেছে। নগরের বুকে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় সেই ছবিটা যেন আরও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বরেন্দ্রী আর গৌড়ের নির্দোষ মানুষগুলির উপর যে লাঞ্ছনা আর মৃত্যুর অভিশাপ নেমে এল তার জন্য দায়ী গৌড়ের রাজশক্তি। তিনিও তো সেই স্বার্থন্ধ আর হিংস্র রাজশক্তিরই একটি অংশ। মনকে যত করেই বোঝানো যাক না কেন, এই সত্যটাকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না।

একটু আগেই অভিমন্যু তাঁকে বলেছিল যে তিনি কখনও কারু উপর কোন অন্যায় করতে পারেন না। ওর মুখের এই কথাটা তখন বড় ভাল লেগেছিল তাঁর। কিন্তু না, এ কথা যথার্থ নয়, তিনি ওর সরল আর বিশ্বাসভরা চোখ দুটিকে প্রতারিত করেছেন। ভিজে স্যাঁত সেঁতে মেঝেটা তেতে যেন আগুন হয়ে উঠেছে। এ আগুন মনের আগুন। সেই আগুনের জ্বালায় ছট ফট করতে করতে পদ্মনাভ মনে মনে বলছিলেন, আসুক মৃত্যু—সর্বচিন্তাহর, সর্বদুঃখহর, পরম-শান্তির নিদান পরম দয়াল মৃত্যু।

চিঠিটা যখন এ হাত ও হাত ঘুরতে ঘুরতে দিব্বোকের কাছে

গিয়ে পৌছল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। চিঠিটা পড়েই দিব্বোক একটুও দেরী না করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন বধ্যভূমিতে। ঘাতকের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্য সেখানে জড় হয়ে ছিল। সবার সামনে উচ্চাসনে বসে পরভু এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। এমন সময় 'রাজা আসছেন 'রাজা আসছেন' বলে একটা শব্দ উঠল। দর্শকেরা সসম্ভ্রমে দু ভাগ হয়ে মাঝখানে একটা প্রশস্ত পথ তৈরী করে দিল। দিব্বোকের ঘোড়াটা পরভুর কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সংগে সংগেই দিব্বোক লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়লেন। তাঁর মুখে গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন। সবাই তা লক্ষ্য করল।

পরভু শশব্যস্ত হয়ে তার আসন থেকে নেমে এসে উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। দিব্বোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সংগে প্রশ্ন করল কি হয়েছে?

একটা বিরাট লোহার খাঁচা। তার মধ্যে এক দল বন্দীকে বন্য পশুর মত আটকে রাখা হয়েছে। খাঁচাটা বধ্যমঞ্চের গা ঘেঁষে আছে। একজন একজন করে নিয়ে আসা হচ্ছে, আর ঘাতকের রক্তাক্ত খড়গ বিদ্যুৎ বেগে নামছে। দিব্বোককে আসতে দেখে ঘাতক তার উদ্যত খড়গ নামিয়ে রাখল। বধ্যমঞ্চের উপর বলির পশুর মত একজন বন্দী থর থর করে কাঁপছে।

পদ্মনাভ, পদ্মনাভ কোথায়? দিব্বোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

পদ্মনাভ? গৌড়ের মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভের কথা বলছেন? পরভু প্রশ্ন করল।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক? তিনি কি মহাসান্ধিবিগ্রহিক? আচ্ছা, দেখি নিয়ে এসো তাঁকে আমার সামনে।

তাকে? তাকে তো সবার আগেই—

দিব্বোকের কথাটা ঘাতকের কানে গিয়েছিল। সে একটা

রক্তমাখা ,কাটা মাথা নিয়ে ছুটে সামনে এসে বলল, এই যে তার মাথা। মরবার আগে ছুটো অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, সবার আগে আমাকে কাটো, আর আমি মরলে পর আমার মৃতদেহ রাজাকে দেখিও। সেই জন্যই আমি আপনাকে দেখাবার জন্য পৃথক করে রেখেছিলাম।

দিব্বোক পদ্মনাভের কাটা মাথাটার দিকে একবার তাকিয়েই ছু হাতে মুখ ঢাকলেন, তার পর আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, নিয়ে যাও, সরিয়ে নিয়ে যাও।

ঘাতক হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

দিব্বোক এবার পরভুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কত জন বন্দী ? পরভু উত্তর দিল, সবশুদ্ধ একশো তিন জন ছিল। তাদের মধ্যে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়েছে, আর আটানব্বুই জন বাকী আছে।

হত্যা বন্ধ কর। সব বন্দীদের ছেড়ে দাও।

পরভু, আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, ছেড়ে দেব ? কেন ?

এরা নির্দোষ। সেই জন্যই এদের আমি মুক্তি দিলাম।

নির্দোষ ? কেমন করে জানলেন এরা নির্দোষ ? গৌড়ে নির্দোষ বলতে কোন লোক আছে নাকি ?

হ্যাঁ, এরা নির্দোষ। মৃত্যুর আগে পদ্মনাভ আমাকে লিখে জানিয়ে গিয়েছেন, এদের কারু কোন দোষ নাই।

দিব্বোকের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। পরভু বলে উঠল, তার কথায় বিশ্বাস কি ?

দিব্বোক দৃঢ় স্বরে বললেন, আমি তাঁর কোন কথাই অবিশ্বাস করতে পারি না। পদ্মনাভ কখনও মিছে কথা বলতেন না।

কিন্তু পরভু এই আদেশ মেনে নিতে চাইল না, সেও জোরের সংগে বলে উঠল, হোক নির্দোষ, তবু এদের মরতে হবে। ওরা আমাদের যে সমস্ত ভাইবোনদের মেরেছে তারা কি দোষ করেছিল ? এদের রক্তপাত না করলে তাদের আত্মা তৃপ্ত হবে না। আপনি

আপনার এই আদেশ ফিরিয়ে নিন। এ আদেশ আমরা মানতে পারব না। না না, এ হতে পারে না।

দিব্বোক পরভুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির সংযত কণ্ঠে বললেন, পরভু, এ রাজ্যের রাজা কে?

পরভু মাথা নত করে বলল, আপনি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন করছেন?

দিব্বোক বললেন, কিন্তু আমার তো তা মনে হচ্ছে না। আমি যদি সত্য সত্যই রাজা হতেম আমার আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হোত। আমি নই, তোমরা তোমাদের বাহুবলে এই রাজ্য জয় করেছ। তার মধ্যে তোমার কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী, এ কথা সবাই জানে। এই রাজ্য শাসনের ভার তোমার উপরে থাকাই ভাল। তাই থাকুক। এক রাজ্যে দু জন রাজা থাকতে পারে না। আমি বরেন্দ্রীতেই ফিরে যেতে চাই।

যারা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এ সব বলছে কি রাজা! পাথরের মত কঠিন প্রাণ পরভুর। কিন্তু সেই পাথরও এবার গলে গেল। দিব্বোকের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল, আপনি এমন একটা কথা বলতে পারলেন? আপনি কি জানেন না কত দুঃখ আমাদের বুকে জমে আছে, কত দুঃখে এ সব কথা বেরিয়ে আসে? কিন্তু তাই বলে এমন কথা আপনি বলবেন! আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন, আমি আর কোন কথা বলব না।

দিব্বোক তাকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পরভু বুঝি, সবই বুঝি। এ দুঃখ যে আমাদের সকলের। এ দুঃখ কি আমার মনে নেই? এর জন্য যারা দায়ী, তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছে, বাকী যারা তারা আমাদের হাতের নাগালের বাইরে কিন্তু এই নির্দোষ অসহায় মানুষগুলিকে হত্যা করে কি তার কোন প্রতিকার হবে? ওরা অমানুষ বলে আমরা তো অমানুষ হতে পারি না।

এগারো

এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। কোথাও যুদ্ধ কোথাও বা একতরফা লুটতরাজ আর হত্যা। নগরের বিভীষিকা অবশেষে গৌড়ের গ্রামাঞ্চলে এসে হানা দিয়েছে।

সংশক গ্রামবাসীদের মনে শান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই। যথেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাভোজী, পৃথিবীর অপবিত্র সন্তান এই কৃষ্ণকায় বর্বরেরা হিংস্র পশুর মতই কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে বলতে পারে। নানা জায়গা থেকে নানা রকম অশুভ জনরব উড়ে উড়ে এসে পড়েছে, তার সব কিছু সত্য হতে না পারে, কিন্তু সবটাই তো মিথ্যা নয়।

যারা এতকাল পায়ের তলায় ছিল, তারা উপরে উঠে এসেছে। ভগবানের বিধানে যাদের স্থান ছিল সবার উপরে আর এত কাল ভগবানের একান্ত প্রিয়পাত্র বলে যারা গণ্য ছিল, তারা আজ হন্যে হয়ে মাথা গুঁজবার জন্য আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। গৌড়ের প্রাক্তন রাজপুরুষেরা, সৈন্যাধ্যক্ষেরা, সৈন্যেরা, যে যার আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিজয়ীরা 'আগুনের শেষ রাখতে নাই' এই নীতি অনুসরণ করে তাদের পিছন পিছন তাড়া করে ফিরছে।

তারই ফলে অত্যাচার, লুণ্ঠন আর আতঙ্ক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। রণক্ষেত্র আর রাজধানীর বুকে যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছিল, তা শাখা প্রশাখার রূপ নিয়ে নিম্নভূমিতে নেমে আসছে। বাতাসে রক্তের গন্ধ। পশুর মতই মানুষের ঘ্রাণশক্তিও প্রখর হয়ে উঠেছে।

আর এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যেও গৌড়ের বুকে নেমে এসেছে বসন্ত। সেই অপরূপ বসন্ত যা চিরদিন মানুষের মনকে দোলা দিয়ে এসেছে। প্রকৃতি প্রতিবার যেমন মোহিনী মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়, এবারও তেমনি করেই এসেছে। এখানকার মানুষের জীবনে একটা বিকট ছন্দভংগ ঘটেছে, কিন্তু প্রকৃতির ছন্দধারা অব্যাহত গতিতে প্রবহমান। নানা দেশ থেকে পাখীরা নানা দেশের বার্তা নিয়ে চলে এসেছে। তাদের উচ্ছ্বসিত কল-কাকলিতে বনভূমি মুখর। তরু লতার অন্তরে অন্তরে যে সৌন্দর্য বন্দী হয়েছিল, বসন্তের উন্মাদ আহ্বানে তা আবরণ ভেদ করে ফুল হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মন উতলা করা দক্ষিণের বাতাস তেমনি করেই বয়ে চলেছে, প্রতি বসন্তে যেমন করে বয়। পশুপাখী, কীটপতংগ থেকে তরুলতা পর্যন্ত তারই ডাকে সমভাবে সাড়া দিয়েছে। শুধু আত্মঘাতী হতভাগ্য মানুষ আপনাকে আপনি বঞ্চিত করছে, নিজের হাতে গড়ে তোলা সমস্যায় নিজেই জীর্ণ হয়ে চলেছে। কিন্তু সে জন্য প্রকৃতির গতি থেমে থাকে না।

পলাশের বনে যেন আগুন লেগেছে। আর কোন গাছ নয় শুধু, পলাশ আর পলাশ। আর কোন রঙ নয়, শুধু এই আগুনী রঙ। যতদূর চোখ যায়, একই দৃশ্য, একই রঙের খেলা। কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়েছে কে জানে!

কাছে ভিতে কোথাও জন-বসতি নাই। উঁচু নীচু বন্ধুর ভূমি, কোন দিন কোন চাষীর লাঙ্গলের ছোঁয়া পায়নি। এখানকার মাটি কোন দিন শস্য ফলিয়ে দেখেনি। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম, মাটি রোদে পুড়ে পুড়ে ঝামার মত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই কঠিনের বুক নিংড়ে কেমন করে রস রক্ত টেনে দিতে হয় পলাশ তা জানে। তাই এই মাটির মধ্যেও তার এতই বাড় বাড়ন্ত। পলাশ প্রতি বসন্তে অজস্র বীজ ছড়িয়ে দেয়, মাটির গর্ভ থেকে নব নব অঙ্কুর উদগত হয়ে ওঠে। পলাশ বন বেড়েই চলে, বেড়েই চলে।

জনবসতি থেকে বহু দূরে বলে কাঠুরেরা এখানে এসে হামলা করে না, পলাশের অতি-প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থাই নেই। যে মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে, এখানে সেই মানুষের অনধিকার প্রবেশ নেই, আবার যে মানুষ মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করবে, সে মানুষও এখানে নেই।

কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম। বনে ঢুকবার কিছুটা আগেই কাছিমের পিঠের মত উঁচু একটা ঢিবি। একজন প্রৌঢ় আর একজন প্রৌঢ়া তার উপর বসে সেই দক্ষিণ থেকে উত্তরগামী পুষ্পিত পলাশ বনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরস্পর কথা বলছিলেন।

প্রৌঢ় বললেন, সত্য কথাই। জীবনের শেষ পাদে এসে পা দিয়েছি কিন্তু এমন দৃশ্য দেখবার সুযোগ আর কোন দিন পাইনি। আমাদের নগরের বাইরের দিকে কয়েকটা পলাশ গাছ ছিল, যেতে আসতে অনেক সময় চোখে পড়েছে, কিন্তু তারা কোন দিন মনকে এমন করে দোলা দিতে পারেনি। আজ ওদের দিকে তাকিয়ে শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে।

ওরা সারাটা বছর ধরে এই আগুন কেমন করে লুকিয়ে রাখে।

বাঃ বাঃ, প্রৌঢ়া চঞ্চলা কিশোরীর মত হাত তালি দিয়ে বলে উঠলেন।

স্বল্পভাষী রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের মুখ দিব্যি খুলে গেছে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু আমি ভাবছি, এ কি বসন্ত ঋতু, না তার এই প্রগলভা সংগিনী, কার মন্ত্রগুণে এই অসাধ্য সাধন ঘটল? কি বলছিলে শেষ কথাটা আবার বল তো শুনি?

হরিগুপ্ত লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

উত্তর না পেয়ে শংখদেবী এবার নিজেই তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ওরা সারা বছর ধরে এই আগুন কেমন করে লুকিয়ে রাখে, এইটাই তোমার কাছে সব চেয়ে বড় বিস্ময়, তাই না?

আর আমরা যে সারা জীবন ধরে এই আগুন লুকিয়ে রাখলাম, আর তার দাহে দগ্ধে দগ্ধে মরলাম, সে কথাটা তোমার মনেই পড়ল না, না?

হরিগুপ্ত অশ্বস্তির সংগে নড়ে চড়ে বসলেন, শেষে বললেন, রাজমাতা, আমরা কয় দিন ধরে রাজধানী ত্যাগ করে এসেছি, মনে আছে আপনার? আমার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

শংখদেবী ওষ্ঠ দংশন করে বললেন, আমি জানি, ভাল করেই জানি এ সব ছোট খাট বিষয়ে তোমার কোন দিনই ভুল হয় না। তোমার ভুল মূলে। সেই ভুলেই তো আমাদের জীবন এমন করে মিথ্যা হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কি আমাকে শিশু পেয়েছো? এমনি করে একটা বাজে কথা তুলে দিয়ে আসল কথাটা এড়িয়ে যাবে। তোমরা সবাই তো বল, আমার মত বুদ্ধিমতী হয় না, তবে আর এই মিথ্যা চেষ্টা কেন? তোমার ওই সুসংযত, সুচিন্তিত ও পরিচিত কথা অনেক শুনেছি। রাজপ্রাসাদের কৃত্রিম পরিবেশেই তাকে মানায়, কিন্তু এখানে একেবারেই বে-মানান। আজ এই উদার আকাশের নীচে মুক্ত, প্রান্তরের মাঝখানে বসে, এই মাধুর্যে ভরা পরম মুহূর্তে তোমার স্বভাব-কার্পণ্য বর্জন করে সহজ হয়ে একটু মন খুলে কথা বল হরিগুপ্ত।

আবেগের এই ঝাপটাটা সামলে নিয়ে হরিগুপ্ত ধীরে ধীরে বললেন, রাজমাতা, ও প্রসংগ রাখুন। মানুষ যা মনে মনে ভাবে, তার সব কথা বলা যায় না। সেটা শোভনও নয়, সংগতও নয়।

শংখদেবী অধৈর্যের সংগে বলে উঠলেন, কোথায় রাজমাতা? রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে, সেই সংগে রাজমাতারও মৃত্যু ঘটেছে। তুমি কেন বৃথা তার সেই কংকালটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছ? আজ রাজমাতাও নাই, রাজবৈদ্যও নাই, আছে শুধু শংখ আর হরিগুপ্ত।

রাজপ্রাসাদ যেতে পারে কিন্তু রাজ্য আছে, রাজা আছেন,

রাজমাতাও আছেন। রাজমাতাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতেই হবে, আর তিনিও সে মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হতে পারেন না।

কিন্তু তার সেই গাম্ভীর্যে ভরা গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি কোন কাজেই এল না! খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন শংখদেবী। হরিগুপ্তের সর্বাংগে শিহরণ খেলা করে গেল। এমন করে হাসতে পারেন শংখদেবী? এতদিনের সেই জানা মানুষটা হঠাৎ যেন নতুন হয়ে ফুটে উঠছে যেমন করে রিক্ত পলাশ বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে ফুলসজ্জায় সেজে ওঠে।

হাসি থামিয়ে আপনাকে সামলে নিয়ে শংখদেবী স্থির দৃষ্টিতে হরিগুপ্তের মুখের দিকে তাকালেন, শেষে বললেন, তুমি চির দিন আপনাকে বঞ্চনা করে এলে, বঞ্চিত করেছ আমাকেও, তাই বলে আমার চোখে ধুলো দেবে সে শক্তি তোমার নেই। তুমি আপনাকে যতই ঢাকা দিতে চাও না কেন, চাপা দিয়ে রাখতে পার না, পদে পদে ধরা পড়ে যাও।

আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

না, বুঝতে পারছ না, কথাটা ঠিক নয়, বুঝতে চাইছ না। কিন্তু আজ আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই হরিগুপ্ত। আমার একটা কথার উত্তর দাও। সেদিন শত্রুসৈন্য যখন নগরে এসে প্রবেশ করল, তখন নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে রাজপ্রাসাদের দিকে অমন উন্মত্তের মত ছুটে গিয়েছিলে কেন?

কর্তব্য বোধে, হরিগুপ্ত মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন।

কর্তব্য বোধে! মধুর হাসি হাসলেন শংখদেবী। হরিগুপ্ত চোখ ফিরাতে পারলেন না। এই রহস্যময় হাসি কি যে মধুর আমন্ত্রণ বহন করে নিয়ে আসে! তখন বড় কঠিন হয় আপনাকে সংযত করে রাখা। যৌবনের প্রথম দিনগুলিতে যেমন ছিল, জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় এসেও ঠিক যেন তেমনি আছে। এ কেমন করে হয়? বার্ধক্যের দ্বারদেশে এসেও কি প্রবৃত্তি নির্বাণ লাভ করে না?

শংখদেবী আবার বিদ্রূপ মাখা সুরে উচ্চারণ করলেন, কর্তব্য বোধে। তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন, গত রাত্রির কথা স্মরণ কর হরিগুপ্ত।

হরিগুপ্ত চমকে উঠলেন, কি ? কিসের কথা বললেন ?

সে চমক এতই সুস্পষ্ট যে তা ধরা পড়বেই। শংখদেবী হেসে বললেন, আমরা নৌকা করে যে বিলটা পার হলাম তার নাম যেন কী ?

কংকন বিল।

হ্যাঁ, কংকন বিল। মাঝিরা সারারাত নৌকো বেয়ে চলেছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

পথশ্রম আর নৌকার দোলানিতে শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কত রাত্রি তখন জানিনা, হঠাৎ জেগে উঠলাম। জেগে উঠে কি দেখলাম জান—না না দেখলাম নয়, নৌকার ভিতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, অনুভব করলাম, কে যেন আমার পাশে ঘেঁষে ঘন হয়ে বসে আছে। আমার একটা হাত তার হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ। সে যে কে, বুঝতে বাকী রইল না। কত রাত্রি ও দিনের সুপ্ত আর জাগ্রত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই স্পর্শ যেন আমার কাছে অতি পরিচিত। কিন্তু কোন দিন পেয়েও পাইনি। বড় লোভী হয়ে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে শুলাম, আমার আর একটা হাত তোমার কোলের উপর তুলে দিলাম। তুমি ভাবলে ঘুমের ঘোরে, কিন্তু তা নয়, আমার হাত যেন আপনি চলে গেল। আর সংগে সংগেই তুমি আমার মাথাটা—ও কি, ও কি অমন করে মুখ ফিরিয়ে নিলে কেন ? কোন লজ্জার কথা নেই এতে। —আর সংগে সংগেই তুমি আমার মাথাটা তোমার কোলের উপর তুলে নিলে। এ আমার আশার অতীত—আমি আনন্দে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলাম।

হরিগুপ্ত অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শংখ দেবী জোর করে তাঁর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,

আমি যে জেগে আছি, তার বিন্দুমাত্র আভাস দিলাম না। আমি জানতাম তুমি টের পেলে অমনি জমে গিয়ে পাথর হয়ে যাবে। কতটুকু সময় এই ভাবেই কাটল। তার পর তুমি আমার মাথাটা আস্তে করে নামিয়ে রেখে নৌকার সামনের দিকে চলে গেলে। বাকী রাতটা আর ঘুম এলো না। আমারও না, তোমারও না।

থামলেন শংখদেবী। একটু পরেই আবার বললেন, আমি যা বললাম তা কি ভুল বলেছি?

হরিগুপ্ত ভাংগা গলায় বলে উঠলেন, মার্জনা—মার্জনা ভিক্ষা করছি। মানুষ বড় দুর্বল, বড় অসহায়। কি থেকে কি হয়ে যেতে পারে, মানুষ পূর্বমুহূর্তেও তা জানে না। তা না হলে এত বড় পাপ আমি কেমন করে করলাম।

মার্জনা? কে কাকে মার্জনা করবে হরিগুপ্ত? যদি পাপ হয়ে থাকে দুজনেরই পাপ। আর মনে মনে এই পাপ আমরা তো কত কতকাল থেকেই করে আসছি। নতুন কিছু নয়। পাপের নিবাস মনে, দেহে নয়। কিন্তু এ যে পাপ এ কথা মানিনা আমি। কিছুতেই মানব না।

বলতে বলতে শংখদেবী তার দুটি হাত হরিগুপ্তের কাঁধের উপর রাখলেন। হরিগুপ্ত যেমন ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। তার হৃদয়ের কোন গভীর তলদেশ থেকে কম্পিত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, বলছ কি শংখ, এ পাপ নয়?

না, পাপ নয়। আমি বলছি, এ পাপ নয়।

না, পাপ নয়? তুমি বিবাহিতা। তুমি পরের। তুমি সন্তানের মাতা। তুমি রাজরানী। তুমি রাজমাতা। তবু তুমি বলছ, এ পাপ নয়?

হ্যাঁ, তবু আমি বলছি, এ পাপ নয় শংখদেবী দৃঢ়স্বরে উত্তর

দিলেন। শোন হরিগুপ্ত, যে কথা কোন দিন তোমাকে বলবার সুযোগ পাইনি, আজ তা বলব। যাকে তোমরা বল সুদিন, আমার জীবনে তা পরম দুর্দিন হয়ে ছিল। আর তোমাদের এই দুর্দিন আমার কাছে পরম সুদিন হয়ে এসেছে। তাই তো প্রাসাদের অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে এমন একান্ত ভাবে তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি। এত কাল যা স্বপ্ন ছিল, আজ তা সত্য হয়ে উঠেছে। আগে আমার কথা কয়টা মন খুলে বলতে দাও। তারপর পাপ পুণ্যের হিসাব করে দেখা যাবে। কি ? বলব ?

বল।

রাজরানী আর রাজমাতা, যে যাই বলুক না কেন, সেটা আমার সত্যিকারের পরিচয় নয়। এ আমার বাইরের আচ্ছাদন মাত্র। না না, আচ্ছাদন নয়, বন্ধন।

হরিগুপ্ত বললেন, তুমি তো শুধু রাজরানী আর রাজমাতাই নও, তুমি তো রাজকন্যাও বটে। তোমার দেহে রাজরক্ত বইছে। তুমি অস্বীকার করলেই তো তা মিথ্যা হয়ে যাবে না।

শংখদেবী হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাজবংশের কন্যা। আমার থেকে তিন পুরুষ আগে এ বংশের লোক রাজত্ব করত। কিন্তু রাজত্বহারা রাজরক্ত ক'পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে বলতে পার ? আমাদের আর্থিক সংগতি ছিল না, কিন্তু বংশের মর্যাদা ছিল। আমার পিতাকে খুশী করবার জন্য অনেকেই মহারাজ বলে সম্বোধন করত।

আমি কিন্তু মনে প্রাণে নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ে ছিলাম। আর দশটা মেয়ের মত আমার দেহেও এক দিন বয়সের ছোঁয়া লাগল, আর দশটা মেয়ের মত আমার মনেও রঙ দেখা দিল। আমার বয়সী মেয়েদের মুখে নানা কথা শুনতে শুনতে আমার মনও জেগে উঠল। আমি চাইলাম, রাজা নয়, রাজপুত্র নয়, এমন একজন মানুষ, যাকে ভালবেসে আমি সার্থক হয়ে উঠতে পারব।

কেমন মানুষ সে, কত রকম করে মনের চিত্রপটে তার ছবি এঁকে তুলতে চাইতাম! কিন্তু সে ছবিতে ধরা দিত না। এমনি করেই কাটছিল আমার অধীর প্রতীক্ষার দিনগুলি। এমন সময় হঠাৎ এক দিন শুনলাম গৌড়ের সম্রাট বিগ্রহপালের সংগে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। বৃদ্ধ সম্রাট বিগ্রহপাল, আর সকল রাজাদের মত তাঁর আরও কয়েকটি রানী আছে। আমি হব তাদের অন্যতমা। আমি কিন্তু চেয়েছিলাম এমন একটি মানুষ যাকে আমি ভালবাসতে পারব, আর যে হবে একান্ত ভাবে আমার।

সবাই বলল, আমার নাকি সৌভাগ্যের অন্ত নাই, রাজরাণী হয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে পারব। আর এই বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের বংশের মর্যাদা আরও বেড়ে যাবে। পরে বুঝলাম, তার চেয়েও বড় কথা, এর মধ্য দিয়ে আমাদের বংশের আর আমাদের সমাজের লোকেরা গৌড়ের রাজসিংহাসনের চারদিকে বিশিষ্ট স্থানগুলি অধিকার করে বসবার সুযোগ পাবে।

এ সম্বন্ধে আমার মতামত কেউ এক বারের জন্যও জিজ্ঞাসা করে দেখেনি। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতামতের কোন স্থান নেই। আমি কিন্তু কিছুতেই এটাকে মেনে নিতে চাইনি, শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা মেয়ে কিই বা করতে পারে! ওরা জোর করে আমার বিয়ে দিল। পুরাকালে রাক্ষস বিবাহের প্রচলন ছিল বলে শুনেছি, এ কি তার চেয়ে কোন অংশে কম? বল হরিগুপ্ত, এটা কি বিয়ে? তুমি কি এটা সমর্থন করতে পার?

হরিগুপ্ত আমতা আমতা করে কি যেন বললেন।

এ বিয়েকে সেদিন আমি স্বীকার করে নেইনি, আজও করি না। এ বিয়ের দায়-দায়িত্ব মেনে চলতে আমি বাধ্য নই।

চমকে উঠলেন হরিগুপ্ত, এ তুমি কি বলছ! অগ্নিসাক্ষী করে

এই যে পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠান তাকে কি অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায়? আর তাও এত কাল পরে?

হ্যাঁ, অস্বীকার করেছি, প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছি আমি। ওরা যে মন্ত্র পড়িয়েছে, সে মন্ত্র আমি পড়িনি। আমি অগ্নিকে স্মরণ করে মনে মনে বলেছি, হে অগ্নিদেব, তুমি সর্বজ্ঞ, তোমার অগোচর কিছু নেই। তুমি সাক্ষী থেকো, আমি এ বিবাহে সম্মত নই। এ বিবাহ সিদ্ধ নয়। এ বিবাহ মিথ্যা।

হরিগুপ্ত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন, শেষে বললেন, আশ্চর্য, অদ্ভুত মানুষ তুমি! এমন কথা কোন দিন কারু মুখে শুনিনি।

শংখদেবী হেসে বললেন, ক'টা মেয়ের মনের কথা শুনেছ তুমি? আর আমি ছাড়া এমন কথা কেই বা তোমাকে এমন করে বলতে যাবে? তার পর শোন। বিগ্রহপালের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে এখানে এসেছিলাম। পরে সেই বিতৃষ্ণা ঘৃণায় পরিণত হয়ে গেল।

স্বর্গগত স্বামীর সম্পর্কে এ ভাবে কথা বলতে একটুও বাধে না তোমার?

না, একটুও না। তোমরা তাকে শুধু বাইরে থেকেই দেখেছ, তাতে আর কতটুকু দেখা যায়! তার চরিত-কথা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকারাই সব চেয়ে ভাল করে জানে।

হরিগুপ্ত বললেন, কিন্তু এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে শেষ বয়সে তিনি তোমার কথায়ই উঠতেন, বসতেন।

হ্যাঁ, সে কথাও মিথ্যা নয়, শংখদেবী উত্তর দিলেন, কিন্তু সেটাই কি বড় প্রশংসার কথা? কিন্তু ও কথা থাক, আমি বলতে যাচ্ছিলাম তোমার আর আমার কথা। বিগ্রহপাল বার বার তার মাঝখানে পড়ে বাধার সৃষ্টি করছে কেন? যেদিন তোমার সংগে প্রথম দেখা হয় মনে আছে সেদিনের কথা?

আছে।

তোমাকে দেখা মাত্রই কিন্তু চিনে নিতে পেরেছিলাম। আমার মন আমাকে ডাক দিয়ে বলে উঠল, এই যে—এই মানুষটির জন্যই তুমি এত দিন অপেক্ষা করে বসে ছিলে। তোমার উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রশ্ন করলাম, যদি এলেই তবে এত দেরী করে এলে কেন? কিন্তু এখন আমার যে চারদিকেই কাঁটা, আমি কোন পথ দিয়ে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব! সেই দিন থেকেই তুমি আমার দিন রাত্রির চিন্তা হয়ে দাঁড়ালে।

পরপুরুষ হয়েও কেমন করে তুমি এমন আপন হয়ে গেলে! কিন্তু সেজন্য একটি দিনের জন্যও আমাকে অনুশোচনা করতে হয় নি। আজও অনুশোচনা করি না। এই গেল আমার পক্ষের কথা, এবার তোমার পক্ষের কথা শুনি।···সেদিন আমাকে দেখে কি মনে হয়েছিল তোমার?

কি মনে হয়েছিল? মনে হয়েছিল, আমাদের মহারাজ স্ত্রী-ভাগ্যে ভাগ্যবান।

শুধু এইটুকুই? এর বেশী আর কিছুই মনে হয় নি?

না, তার বেশী আর কিছু ভাববার মত ধৃষ্টতা আমার ছিল না।

সত্য কথাই বলেছ। কিন্তু সেই ধৃষ্টতার জন্ম হোল কবে সেই কথাটাই শুনতে চাই।

এরই মধ্যে কখন শংখদেবীর হাত হরিগুপ্তের হাতের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। একটু আগেকার সেই সংকোচ ও অনুশোচনার ভাবটা কখন খশে পড়ে গেছে।

শংখদেবীর হাতের উপর একটু মৃদু চাপ দিয়ে হরিগুপ্ত বললেন, এত কথা জান তুমি, শুধু এই কথাটাই জান না?

শংখদেবী আড় নয়নে নিজের বন্দী হাতটার দিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁটের কোণায় কুটিল হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাইছিলাম। নিজেকে

.ন উঠতে বহু দিন লেগেছিল তোমার। এত লোকের
।গ-লক্ষণ বিচার করে বেড়াও, আর নিজের বেলায়
।ন ভুল ?

হরিগুপ্ত হেসে বললেন, সেই জন্যই তো বৈদ্যেরা কখনও
জেদের চিকিৎসা নিজেরা করে না।

আমার সেই গুরুতর ব্যাধির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার।
। সময় প্রতি দিন তোমাকে আসতে হোত। প্রয়োজনে তো
।সতেই, প্রয়োজন ছাড়াও আসতে। সে কত দিনের কথা, কিন্তু
খনও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার। তোমার চোখের দৃষ্টি বদলে
।য়েছিল। অভিজ্ঞ বৈদ্যের দৃষ্টিতে অমন ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে না।
সই সময়ই তোমার নিজের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ল। বল, ঠিক
লছি কি না।

হরিগুপ্ত স্বীকারোক্তি দিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

তার পর আমার সেই চিঠি। যখন বুঝলাম, তুমি নিজের
কাছে ধরা পড়ে গেছ, তখনই লিখেছিলাম চিঠি, তার আগে নয়।
কিন্তু তার যে এমন পরিণতি হবে, তা কেমন করে জানব! ক'বছর
.দশত্যাগী হয়ে রইলে। কিন্তু কেন, সে কথাটা একবারও জিজ্ঞাসা
করা হয়নি। আজ বল শুনি। পরনারীর এই দুস্প্রবৃত্তি দেখে ঘৃণা
.জেগেছিল মনে ?

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, না, তা নয়। আমার মনে হয়েছিল
এজন্য মূলত আমিই অপরাধী। তা ছাড়া নিজের মনের গতি দেখে
ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। মনের বোঝাটা হালকা করবার জন্য
তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম! কিন্তু মন কিছুতেই মানতে চাইছিল
না। দেশে ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠলাম। ফিরে এলাম দেশে।
পরে বুঝতে পেরেছিলাম এ টান দেশের টান নয়—

'এ টান সেই দুশ্চরিত্রা বিদেশিনী মেয়েটার টান, তাই না
হরিগুপ্ত ? তোমার এই সত্য কথাটির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এত

দিন বাদে সেই সত্য কথাটা আজ তুমি প্রথম শোনালে। বড় কৃপণ, বড় কৃপণ তুমি হরিগুপ্ত।

আমি কি বলব বলে বলছি? তুমি কেমন করে আমার মুখ থেকে কথাগুলো জোর করে টেনে বার করে নিচ্ছ।

না, আমি নই। আমি তো আগেও ছিলাম, কিন্তু এক দিনও তোমার মুখ থেকে এই মধুর স্বীকারোক্তির একটি কথাও বার করতে পারিনি। আজ লোকসমাজে আর লোকলজ্জার গণ্ডী ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে এসেছি আমরা, তাই বুঝি এমন অঘটন ঘটল।

কিন্তু শংখ, আমার কোন কথা তোমার অজানা ছিল?

ছিল না, স্বীকার করি। কিন্তু সেই জানা কথাটাই যখন প্রিয়জনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তা নতুন রূপ রঙ আর রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এটুকু না হলে মানুষের চলে না।

কিন্তু মনের গভীরে যে কথাগুলি জমে ওঠে, মানুষ কি তা প্রকাশ করে বলতে পারে?

পারে না। কিন্তু তার প্রকাশের এই অক্ষম আকুতির মধ্য দিয়ে অমুক্ত কথার যে আভাসটুকু ঝিলমিলিয়ে ওঠে, তার তুলনা নেই।

আমি অবাক হয়ে যাই শংখ, এমন ভাষা তুমি কোথায় খুঁজে পাও? আর আমার মন যত বেশী পূর্ণ হয়ে ওঠে আমি ততই নিঃশব্দ হয়ে যাই।

শংখদেবী মৃদু গুঞ্জনের সুরে বলে উঠলেন, বর্ষণহীন মেঘ, পৃথিবীর তৃষ্ণা কি তাতে মেটে?

হরিগুপ্ত নিঃশব্দ হয়ে মাথা নত করে রইলেন।

না, না, ভুল বলেছি, ভুল বলেছি আমি, শংখদেবী নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, কি জান, হয় তো তুমি তোমার ওই না-বলা কথার মধ্য দিয়েই আমাকে আরও বেশী করে কাছে টেনেছিলে সেদিন। ওগো বর্ষণহীন ঘন মেঘ, দূর আকাশে তোমার ওই অস্পষ্ট গুরু গুরু শব্দে আমার বুক সেদিন দুরু দুরু করে কেঁপে

উঠেছিল। প্রথম যৌবনে আমার যে সুকোমল রক্ত রঙিন কামনা বিগ্রহপালের স্থূল অশুচি হস্তাবলেপে লাঞ্ছিত, ক্ষতবিক্ষত ও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, তুমি তার মধ্যে চেতনার সঞ্চার করে তুললে।

ওগো মেঘ, আমি তোমার সেই গভীর নিঃশব্দতার বিদ্যুৎ-স্পদনে স্পন্দিত হতে লাগলাম। তোমার প্রত্যাশায় আমার কামনা কলাপীর মত কলাপ বিস্তার করে উঠল। ওগো দূর আকাশের মেঘ, তুমি তার কতটুকু সন্ধান পেয়েছিলে।

শংখদেবীর মুদ্রিত চোখ বেয়ে দুই বিন্দু জল গড়িয়ে নেমে এল। সচেতন হয়ে দেখলেন কখন, অজান্তে হরিগুপ্তের দক্ষিণ বাহু তাঁকে নিবিড় বেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে। সামনে ওই আকাশের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তপলাশ তাদের দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জ হাসি হাসছে। আবার চোখ দুটি বুজে নিজেকে ছেড়ে দিলেন শংখদেবী।

বারো

লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা নগরী আবার নতুন রূপসজ্জায় সেজে উঠেছে।

রাজধানী গৌড়ে বিজয়ী কৈবর্তদের বিজয়োৎসব। বরেন্দ্রী থেকে কালো মানুষের ঢল নেমে এসেছে। নাচে গানে হাসিতে আনন্দে কোলাহলে ওরা আকাশ বাতাসকে চঞ্চল আর মুখর করে তুলেছে। ঢোল বাজছে, মাদল বাজছে, বাজছে কত রকমের বাঁশী। সেই সুরে সুরে আর সেই তালে তালে, নাচছে মেয়েরা নাচছে ছেলেরা, কোথাও মণ্ডলীবদ্ধ হয়ে, কোথাও সারি বেঁধে, কোথাও যেমন খুশী তেমন।

এই অভিজাত নগরীর বুকে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। নগরী যেন স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে, এ সব কি ব্যাপার, এই বর্বরেরা পেয়েছে কি। এই সৃষ্টিছাড়া নবাগত কৃষ্ণকায় মানুষগুলির সংগে সে যেন তার কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সবাই যখন নাচগান থামাল, তখন এল পানাহারের পালা। আজকের জন্য সমস্ত মানুষ এক পরিবার হয়ে গেছে। গৌড়ের রাজকীয় পশুশালায় পশুর অভাব নাই। সারি সারি চুল্লী, হাঁড়ীর পর হাঁড়ী মাংস উঠছে, নামছে। মাংসের সুগন্ধে বাতাস মহ-মহ করছে। মাটির উপর চাটাই পেতে ভাতের উঁচু স্তূপ করা হয়েছে। রাজ্যের মাছি এসে পড়েছে তার উপর। ক্ষুধার্ত ছেলেগুলি যেতে আসতে খাবলা খাবলা তুলে খাচ্ছে। বড়দের চোখে পড়লে ধমক ধামক দিচ্ছে। কিন্তু আজ উৎসবের দিন, এ সব শাসন কেই বা মানে! আজ নিয়ম টিয়ম উঠে গেছে।

হ্যাঁ, রোজকার নিয়ম আজ অচল। আজ অবাধ আনন্দের দিন। শুধু বিজয় উৎসব নয়, আজ যে ক্ষেত্তর বুড়ীর পরব। ক্ষেত্তর বুড়ী—যার দয়ায় জমিতে ফসল ফলে আর মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে। জওয়ান ছেলেরা আর মেয়েরা আজ একটু বে-চাল চালে চলবে। সে জন্য কেউ কিছু মনে করে না। সমাজে চিরকালই এই রীতি চলে আসছে। আজকার দিনেও ধরতে নাই। গ্রামাঞ্চলে সুবিধা-অনেক। আড়াল-আবডাল পাওয়া যায়, যাকে যার মনে ধরল তাকে সংগে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু এখানে সবই বড় বেশী খোলা মেলা। কিন্তু কি করা যাবে, স্বয়ং ক্ষেত্তর বুড়ীর বিধান-এ বিধান মেনে চলতে হয়। আজ এই বছরকার দিনে জওয়ান ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে একটু মাখামাখি, একটু পুটোপুটি, একটু দেওয়া নেওয়া হবেই। এ যদি কারু চোখে পড়ে, তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে চলে যেতে হয়। এও ক্ষেত্তর বুড়ীরই বিধান, এই বিধান ভংগ করার ফলে কারু কারু চোখ কাণা হয়ে গেছে, এমন কথাও শোনা যায়।

খাবার সময় সবাই সারি বেঁধে খেতে বসে গেছে। ছোট বড়, মেয়ে পুরুষ, যে যেখানে জায়গা পেয়েছে, বসে পড়েছে। বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে সারা গাঁয়ের লোক এমনি করেই এক সংগে বসে খায়। কিন্তু আজ তো শুধু এক গাঁয়ের লোক নয়, বরেন্দ্রীর কত গাঁয়ের কত লোক এখানে এসে জমেছে, যেন এক রাজ্যের মানুষ একত্র হয়েছে। সারির পর সারি মানুষ, এক দল উঠছে, এক দল বসছে। উঠছে বসছে, আসছে যাচ্ছে, দিচ্ছে খাচ্ছে—চেঁচা মেচি হৈ-হুল্লোড়ে সারাটা নগর সরগরম। হ্যাঁ এর নাম পরব।

এমন জমজমাট পরব কেউ কোন দিন দেখেনি। কেউ কেউ বলছিল সারাটা বছর যদি এই ভাবেই চলত মন্দ ছিল কি। বড় ছোট সবাই মিলে এক সংগে কাজ করতাম, এমনি করে এক

পরিবার হয়ে মিলে মিশে ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া করতাম। তা হলে তুমি খেতে পাও, আমি খেতে পাই না, এ দুঃখ কারু থাকত না।

শণের মত পাকা চুল অথর্ব মত এক বুড়ো মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, বাপ দাদাদের মুখে শুনেছি, আগেকার দিনে সেই নিয়মই নাকি ছিল। তখন সব মানুষ ছিল ভাই-ভাই, সবাই এক সংগে মিলে-মিশে থাকত। পরে আমাদের মধ্যে পাপ দেখা দিল, আমরা লোভী হয়ে উঠলাম, জমি-জমা বিষয়-আশয় নিয়ে 'আমার আমার' বলে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু হয়ে গেল। আর তার ফল এখন দেখ, প্রথমে ঘর ভাংগাভাংগি, তার পর মন ভাংগাভাংগি। সেই জন্যই তো আজ আমাদের দুর্দশা।

আবার কি সেই দিন ফিরিয়ে আনা যায় না? একজন প্রশ্ন করল।

বুড়ো হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলল, যা যায়, একেবারেই যায়, আর তা ফিরে আসে না। এই আমার জীবনেই কত কিছু দেখেছি। যা চলে গেছে, আর কি তা ফিরে আসবে? এই বলে বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কিন্তু উৎসবের চঞ্চল হাওয়ায় সেই দীর্ঘশ্বাস কোথায় উড়ে চলে যায়। বুড়ো তার জীবনে কি পেয়েছিল এক দিন, আর কিই বা হারিয়েছে, তাই নিয়ে প্রশ্ন করবার বা সমবেদনা জানাবার মত অবকাশ কোথায়! শুধু মুহূর্তের স্মৃতি-দংশন, পরক্ষণে বুড়ো নিজেই ভুলে গেছে সে কথা। এমনি সময় একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়োর পাশে এসে বসে পড়ল। চারি দিকে সমস্তগুলি মুখ নড়ছে, খাওয়া শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

ওদের আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

কাছাকাছি যতগুলি মানুষ সবার চোখ ওদের দিকে নিবদ্ধ। এতগুলি উৎসুক দৃষ্টির লক্ষ্য স্থল হয়ে ওরা একটু সংকুচিত হয়ে রইল।

বুড়ো ওদের ভাল করেই চেনে। সে মেয়েটার খোঁপাটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বলল,

কি লো, এত দেরী করলি যে ?

পরক্ষণেই ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, হুঁ, দেরী তো হবেই। দেরী করবার মত বয়সই তো তোদের। আমরা বুড়ো মানুষেরা সেই কখন থেকে বসে আছি। এক খাওয়া ছাড়া আর কিই বা আছে আমাদের! বেশ, বেশ, বেশ।

চার দিকে একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। সেই হাসির তোড়ে সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দুজনেও হেসে উঠল।

খাওয়া শেষ হলে পানীয় এল। এ রাজ-ভাণ্ডারের সংরক্ষিত মদ নয়। এ কৈবর্তদের নিজেদের চোলাই করা ঝাঁঝের উগ্রগন্ধী ধেনো মদ।

রাজধানীতে যে গৌড়ী সুরার প্রচলন আছে, তা সুস্বাদু, সুবাসিত, কিন্তু কৈবর্তেরা নাক সিঁটকে বলে, বড় নরম, এতে নেশা ধরে না। ধেনোর মত জিনিস কি আর সংসারে আছে! ভাঁড়ের পর ভাঁড় আসছে, আর দেখতে দেখতে নিঃশেষ। আজ এমনিতেই পরবের দিন, তার উপরে বিজয় উৎসব ; যে যত পার খাও, কোন বাঁধা বরাদ্দ নেই, অঢেল ব্যবস্থা। তার ফলে কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল কেউ আর বসে নাই, উপুড় হয়ে, চিৎ হয়ে যার খুশী পড়ে আছে। চেতন আর অচেতনের সংগম স্থলে এই যে হাবুডুবু খাওয়া, এর মধ্যেই তো চরম সুখ। একমাত্র তুরীয় অবস্থার সংগেই এর উপমা দেওয়া চলতে পারে। দেহ বোধ বলতে ওদের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই, আছে শুধু একটু অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি। কয়েকজন উলংগ হয়ে পড়ে আছে। ওরা দেহের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দিব্বোক তাঁর দলবল সহ নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে এমনি একটি দৃশ্যের সামনে এসে থমকে

দাঁড়ালেন। ধরাশায়ীদের মধ্যে যে ক'জন পরিমাণে একটু কম টেনে ছিল তারা টের পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। আর সবাই যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল।

নিজের সমাজের এই অতি-পরিচিত ছবিটির দিকে তাকিয়ে দিব্বোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট বেলা থেকে এই দৃশ্য দেখে দেখে তিনি অভ্যস্ত। কোন দিন এ নিয়ে তাঁর মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। কিন্তু আজ অসীম বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উৎসব রাত্রির শেষে ঘুমন্ত নটীদের বিকৃত মুখভংগি ও বিস্রস্ত বেশ বাসের দিকে তাকিয়ে একদিন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুঝি এমনি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সামনেই একটা লোক হড় হড় করে বমি করে ভাসিয়ে দিল। দিব্বোক ত্রস্ত ভাবে কয়েক পা পিছনে হটে এলেন। তাঁর চোখে মুখে বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। হো হো করে হেসে উঠল তাঁর দলের লোকেরা। তাদের কাছে এ একটা মজার ব্যাপার। একজন মন্তব্য করল, পরবের দিনে একটু মাত্রা রেখে সামলে চলতে পারলে এমন মজার ছবি অনেক দেখা যায়।

এই দৃশ্য দিব্বোককে ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ করে তুলল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, না না, এ কিছুতেই চলতে পারে না। কথাটা স্বগতোক্তি। কিন্তু সেই স্বগতোক্তি এমন জোরের সংগে বেরিয়ে এল যে, তা কারু শুনতে বাকি রইল না। তাঁর এই কথার তাৎপর্য কেউ বুঝতে পারল না। দিব্বোক চিরদিনই শান্ত ও সংযত স্বভাবেব লোক। তাঁর কথার সুরে স্পষ্ট বোঝা গেল, কারু বিরুদ্ধে যেন ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? কে সে?

পরভু পিছনে ছিল, সামনে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

কি হয়েছে? দেখতে পাচ্ছ না? দিব্বোক আংগুল তুলে ওদের দিকে দেখালেন।

ওঃ হো, হেসে উঠল পরভু। এ কি আপনি নতুন দেখছেন নাকি? পরবের দিনে এ তো হবেই। আর একটু আমোদ-ফুর্তিই যদি না করল, তবে আর কিসের পরব!

দিব্বোক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমরা এখন বরেন্দ্রীতে নিজেদের ঘরে বসে নেই যে যা খুশী করতে পারি। বাইরের লোক যদি এ সব দেখে, কৈবর্তদের সম্বন্ধে কি বলবে তারা?

কথা শুনে পরভুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে বললে, কে আবার কি-বলবে! বরেন্দ্রীই হোক আর গৌড়ই হোক, আমরা যেখানে বাস করি সেইটাই আমাদের ঘর। এখানে বাইরের লোকটা কে? আর থাকেও যদি থাক না, কার কি বলবার আছে এতে?

কে কি বলবে, এই ভয়ে আমাদের রীত্ আমরা রক্ষা করে চলব না?

পরভু উলটো যেন তাকেই চেপে ধরেছে। দিব্বোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন। শেষে গলার স্বরটা নীচু করে বললেন, আঃ তোমার কি চোখ নেই, ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখ না একবার।

পরভু যেমন বলছিল সেই ভাবেই বলে চলল, তাতে হয়েছে কি? মদ খেলে অমন একটু বে-সামাল হয়েই থাকে। আজ এমন একটা পরবের দিনে তাই বলে মদ খাবে না, এর ওর সংগে একটু রং ঢং করবে না? চেতন হলে পর ওরা নিজেরাই নিজেদের সামলে নেবে। সেজন্য কাউকে কিছু বলতে হবে না। আর এর জন্য ওদের গায়ে কোন দোষও লেগে থাকবে না।

এর উত্তরে কি বলবেন, দিব্বোক কথা খুঁজে পেলেন না। তিনি নিজেও কৈবর্তের ঘরের সন্তান। কিন্তু তা হলেও দেশ বিদেশে ঘুরেছেন, নানা জায়গার লোকের সংগে মিশেছেন। তা ছাড়া তিনি লেখাপড়া করবার সুযোগ কিছুটা পেয়েছিলেন। সভ্য সমাজের রীতি-নীতি আচার ব্যবহার জানা আছে তাঁর।

সেই কথাটাই আবার একটু ঘুরিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন পরভুর কাছে। পরভু দস্তুর মত চটে উঠল। বলল, ও আপনি গৌড়ের ওই শয়তানগুলির কথা বলছেন? ওদের কথা বাদ দিন। ওদের মধ্যে যা কিছু আছে সবই খারাপ, ভাল বলতে কিচ্ছু নেই। ওদের যেমন স্বভাব তেমনি আচার বিচার। ওদের ছোঁয়া পেয়ে আমরা পর্যন্ত খারাপ হয়ে উঠছিলাম। ওদের ওই সভ্যতা দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। ওদের সভ্যতা নিয়ে ওরা ডুবে মরুক।

দিব্বোক আর সবার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন এ বিষয়ে তারা সবাই পরভুর সংগে একমত। তাঁর পক্ষে কেউ নেই। নানা কারণে তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে, তাই এই মদ খেয়ে এ ভাবে পথের ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকাটা তাঁর কাছে দৃষ্টিকটু বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এদের কাছে এটা এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে এর মধ্যে দোষণীয় কিছু থাকতে পারে এরা তা ভাবতেই পারে না।

তিনি কথাটার মোড় একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, সারা রাজ্যের মানুষ যদি এমনি করে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে, তবে তো শত্রুদের পক্ষে মস্ত বড় সুযোগ। ওরা যদি এই দিনটা বেছে নিয়ে আক্রমণ করত, আমাদের অবস্থাটা হোত কি বল দেখি? এরা করত যুদ্ধ?

এবার কিন্তু পরভু কথাটা তেমন করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কিন্তু মেনেও নিল না। বলল, আমাদের এখানকার এ সব কথা ওরা কেমন করে জানবে?

কেন, সেটা জানা কি এতই কঠিন? আমাদের কৈবর্তদের মধ্যেই যে ওদের কাছে খবরাখবর দেবার মত লোক আছে, সে কথাটা কি তোমাকেও মনে করিয়ে দিতে হবে?

পরভুকে এবার নিরুত্তর হতে হোল। এ কথাটা কেমন করে অস্বীকার করবে?

মধুমন্তদের পিছনে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে চলল। তারা কথায় কথায় বিষয়ান্তরে এসে গেল।

পরভু বলছিল, আমরা ওদের পিছন পিছন তাড়া করেছিলাম, আপনি কেন যে আমাদের ফিরিয়ে আনলেন! ওদের যদি একদম শেষ করে দিয়ে আসতে পারতাম, তবে আর ওদের জন্য ভাবতে হোত না।

দিব্বোক্‌ বললেন, শেষ করে দিয়ে আসতে পারলে ভালই হোত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু সে শক্তি তোমাদের ছিল না। আপাতত ওদের দুর্বল বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় ওদের শক্তি ছড়িয়ে আছে। তোমরা যত বেশী এগোতে তত বেশী করে শত্রুদলের ভিতরে গিয়ে পড়তে। তা ছাড়া পীঠির ঘোড়-সওয়াররা আর কত দিন তোমাদের সংগে থাকত! সে রকম কথাও ছিল না তাদের সংগে।

পরভুর এবার মনে পড়ল, পীঠির ঘোড়-সওয়াররা তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল বটে। যদি চলে যেত কি করতে পারত তারা? পরভু মনে মনে নিজেকে শতবার ধিক্কার দিল, নাঃ তার বুদ্ধির কানাকড়ি মূল্য নাই। তাদের নাকের ডগায় যা ঘটছিল, তার গুরুত্ব তলিয়ে দেখবার মত বুদ্ধি ছিল না তাদের, আর দিব্বোক দূরে বসেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন।

পরভুকে নিরুত্তর দেখে দিব্বোক বলে চললেন, ওদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি ছিল, এখনও হয়তো আছে। কিন্তু দুদিন আগেই হোক আর পরেই হোক, কৈবর্তদের হটাবার জন্য ওরা যে কোন রকমেই হোক নিজেদের ভিতরকার গোলমালটা মিটিয়ে ফেলবে। তখন শুরু হবে আসল যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধ যে কতদিন চলবে তার কিছুই ঠিক নেই। ওদের এত দিনের গৌড় ওরা কি এত সহজেই ছেড়ে দেবে ভাবছ? কাল যদি ওরা আক্রমণ করে বসে, কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে ওদের? পীঠির ঘোড়-সওয়াররা পীঠিতে চলে গেছে, আমাদের

নিজেদের হাতে মাত্র পঞ্চাশ জন ঘোড় সওয়ার, তাও সবাই নতুন, এখনও ভাল করে শিক্ষিত হয়ে উঠেনি।

পরভু এবার চিন্তিত হয়ে বলল, তাই তো কি হবে তবে?

সেই জন্যই তো বলছিলাম, এখন কি পরব আর বিজয়োৎসব নিয়ে মেতে থাকবার সময়? এখন প্রতিটি দিন মুহূর্ত আমাদের কাছে মহা মূল্যবান। ওরা আক্রমণ করতে যতটা দেরী করে, আমাদের তত লাভ। এর মধ্যেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সেই জন্যই তোমাদের ফিরে আসবার জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম। আবার বলছি, প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে মহা মূল্যবান। তোমরা তোমাদের যা যা করণীয় কাজ করে চলেছ তো?

পরভু উত্তর দিল, সে দিকে কোন ত্রুটিই হচ্ছে না। প্রতি দিন দলে দলে লোক সৈন্য দলে নাম লেখাচ্ছে। ঘরে ঘরে হাতিয়ার তৈরী হচ্ছে। কি পুরুষ কি মেয়ে কেউ বসে নেই।

কোচরা কি করবে?

তারা এবার সবাই আমাদের পক্ষে আছে। গৌড় দখল করবার সময় ওদের মধ্য থেকে শ'খানেক লোক আমাদের সংগে যোগ দিয়েছিল। আর এবার কথা দিয়েছে, যুদ্ধ যদি আবার বেঁধেই যায়, তবে প্রতি ঘর থেকে এক জন করে লোক দেবে।

বেশ বেশ বেশ, খুব ভাল কথা, দিব্বোক খুশী হয়ে বললেন।

কিন্তু পরভু এই সাফল্যেও খুশী হয়ে উঠতে পারল না। সে তার মনের উদ্বেগটা প্রকাশ করেই ফেলল, কিন্তু ঘোড়া? ঘোড়া আমরা কোথায় পাব? কেমন করেই বা পাব? আপনি ঠিকই বলেছিলেন শুধু পায়ে হাঁটা সৈন্য দিয়ে ঘোড়-সওয়ার বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘোড়া আমরা পাচ্ছি কোথায়?

দিব্বোক আশ্বাস দিয়ে বললেন, এক মাস বাদে দুশো ঘোড়া

আসছে বাইরে থেকে। সেই ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। এখন তুমি ঘোড়-সওয়ার বাছাই কর পরভু।

খবরটা শুনে লাফিয়ে উঠল পরভু, বটে, তুশো ঘোড়া? তবে আর ভাবনা কি! বলতে বলতে পরভু আনন্দের আতিশয্যে দিব্বোকের পায়ের উপর মাথা ঠুকতে লাগল।

আঃ কি কর, কি কর, দিব্বোক বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পরভুর মন যখন নেচে ওঠে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা বড় শক্ত।

তেরো

ওরা গ্রামাঞ্চলের পথ ধরে যাচ্ছিলেন। এক হাতে দণ্ড অপর হাতে ভিক্ষা পাত্র, কাঁধে ঝুলি, পরনে পীত বসন—সৌম্যমূর্তি, উজ্জ্বলশ্রী দুই ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী। পথের মানুষ ভক্তিভরে লুটিয়ে প্রণাম করছে, করজোড়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছে, আর তাঁরা আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছেন।

ভিক্ষু বলছিলেন, আমাদের বয়স কম হয়নি, এই তো প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়। আর এই সময় আমরা—

হ্যাঁ, এই সময় আমরা আমাদের এই নূতন সংসারে পা দিলাম। ভিক্ষুণী ভিক্ষুর অপূর্ণ কথাটাকে পূর্ণ করে দিলেন।

সংসার? এর নাম সংসার?

কেন হরিগুপ্ত, আমাদের এটা সংসার নয়? সংকীর্ণ গৃহকোণে সীমাবদ্ধ নয় বলে? মানব না তোমার কথা। আমাদের প্রেম আর আমাদের এই সংসার বহতা নদীর মত সামনের দিকে বয়ে চলেছে। রাজপ্রাসাদের অন্ধকার, গুপ্ত সুড়ংগ পথ বেয়ে তোমার হাত ধরে যেই মুহূর্তে বাইরে মুক্ত আলোকে বেরিয়ে এলাম, সেই তখনই, তুমি বুঝতে পার নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের সংসার যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

আর তার শেষ—শেষ কোথায়?

শেষ কোথায়, কে বলবে? সে কথা কি কেউ বলতে পারে? যদি তাই পারত, সেটা হোতো পরম দুর্ভাগ্যের কথা। জীবন তার রোমাঞ্চকতা হারিয়ে ফেলে বিস্বাদ হয়ে যেত। তখন কি আর

অভাবনীয়ের প্রত্যাশায়, আর অজানার উন্মাদনায় এমন করে ছুটতে পারত মানুষ।

হরিগুপ্ত একটু ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু শংখ, এ যে যৌবনের ধর্ম, আমরা দুজনেই পরিণত বয়স্ক আমরা কি পর-ধর্ম আচরণ করছি না? মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? মনে হয়, বয়সের জীর্ণ আবরণ আর ভিক্ষুর কাষায় বসনের আচ্ছাদনে নিজেদের স্বরূপকে ঢেকে রেখে সবাইকে প্রতারিত করে চলেছি। এটা কি ভাল?

শংখ দেবী হেসে বললেন, আচ্ছাদনের অন্তরালে নিজের স্বরূপ-টাকে অনুভব করতে পারছ তো? তবে আর পর-ধর্ম বলছ কেন? সেই পলাশ বনের কথা স্মরণ কর। আমিই তো তোমাকে দেখিয়ে-ছিলাম সব চেয়ে বুড়ো সেই গাছটাকে যার মধ্যে সব চেয়ে বেশী ফুল ধরেছিল। ফুল ফোটাবার শক্তি যার আছে, সে ফুল ফোটাবেই। বয়সের কথা মনে করে সে কি আপনাকে সামলে রাখতে পারে। ছলনা? হ্যাঁ, একটু ছলনা করতে হয়। আড়াল? হ্যাঁ একটু আড়াল রাখতেই হয়। কৌতুহলী দর্শকের কৌতুহল মিটাবার জন্য কোন্ মিথুন তাদের গোপন মিলন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখে? তোমার আর আমার এই গোপন লীলা, লোকচক্ষের অন্তরালেই তার বসতি, অন্তঃসলিলা নদীর মতই তা অশ্রুতসুরে কল্লোলিত হয়ে চলবে। এর নাম প্রতারণা নয়।

হরিগুপ্ত একটু সময় চুপ করে থেকে শেষে বললেন, তুমি এমন করে কথা বল, শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে পড়ি। তখন কথার কোন উত্তর খুঁজে পাই না। কিন্তু একটা কথা সত্যি করে বল, মানুষের যা সহজ সংস্কার তুমি কি তার সব কিছু থেকেই মুক্ত? ভয় বলতে কিছুই কি তোমার নেই?

অমন কথা কি বলতে পারি! তবে ভয়টা চির দিনই আমার একটু কম। আর লোকে যে সকল কথা বেদবাক্যের মত নিঃসংশয়ে

মেনে নেয়, আমি তার সব কথা মেনে নিতে পারি না। এ জিনিসটা আমি আমার এক পিতৃব্যের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তাঁর মনে স্বাধীন জিজ্ঞাসা ছিল। কোন কথা বহু কাল ধরে চলে আসছে বা বহু লোক তাকে সত্য বলে মেনে আসছে, একমাত্র এই কারণেই তিনি তাকে সংশয়াতীত সত্য বলে মেনে নিতে চাইতেন না। এই সব নিয়ে কত দিন কত লোকের সংগেই যে তাঁর মতদ্বৈধ ও মনান্তর ঘটেছে। সে জন্য তাঁকে দুঃখও বড় কম পেতে হয় নি। কিন্তু কোন দিন এই দুঃখকে এড়াবার জন্য তাঁর নিজের পথ থেকে তাঁকে ভ্রষ্ট হতে দেখিনি। তাঁর সেই অটল সত্যনিষ্ঠা আর একান্ত নির্ভয়তাকে আমি চির দিন প্রণাম জানিয়ে এসেছি। আমি যেটুকু শিক্ষা পেয়েছি, তাঁর কাছেই পেয়েছি। আর তাঁরই মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই স্বভাবের একটুখানি যেন আমার মধ্যেও এসে গেছে। সেজন্য অনেক নিন্দাও শুনতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু আমি ভাবছি হরিগুপ্ত, আমার বেখাপ্পা স্বভাবটা তোমার আর আমার মাঝখানে ব্যবধানের সৃষ্টি করে তুলছে না তো?

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, ঠিক তার বিপরীত। তুমি জান না, এর জোরেই তুমি যেন আমাকে আরও বেশী করে তোমার কাছে টানো। এ যে কি রহস্য আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আবারও তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এই যে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী না হয়েও তাদের ছদ্মবেশ ধরে লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি আর আতিথ্য কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এর মধ্যে কোন পাপ নেই?

পাপ? এর মধ্যে পাপের কি আছে? শংখদেবী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমরা তো কারু কোন ক্ষতি করিনি, কাউকে ভাল কথা ছাড়া মন্দ কথা বলিনি। বিপদে আপদে লোকের যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি। মনে আছে, সেই যে চক্রশীলা গ্রামে দারুণ মহামারী লাগল, তুমি তোমার প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে চিকিৎসা করে কত লোকের প্রাণ বাঁচালে, আর

আমি আমার যেটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে তাদের সেবা করলাম—

হরিগুপ্ত বলে উঠলেন, হ্যাঁ। সেদিন তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি রাজরাণী, রাজমাতা, চিরদিন পরের সেবা পেয়ে এসেছ, এমন সেবা তুমি কেমন করে শিখলে? ক্লান্তি, ঘৃণা আর ভয় বলতে কিছুই যেন তোমার ছিল না। সেদিন তোমাকে আমি নূতন করে দেখলাম, আর নূতন করে ভালবাসলাম।

শংখদেবীর চোখের সামনে সেই ছবি ভাসছিল। তিনি যেন নিজের মনেই বলে চললেন, কি বিচিত্র আর কি বিস্ময়কর সেই দিনগুলি। আমার জীবনে এমন দিন যে আসতে পারে, সে কি আমি কখনও ভাবতে পেরেছি! ওরা আমাদের ডাকত বাবা আর মা, তাই না? আহা কি মিষ্টি সেই ডাক! আজ যখন সেই পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকাই, তখন অবাক হয়ে ভাবি, আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি! এমন সুখ আমি আমার জীবনে আর কখনও পাইনি। ধন্য হয়েছি আমি। তুমি কি বলতে চাও এই সবই আমাদের পাপের ফল? পাপের ফল যদি এই ভাবেই ফলে, তবে পাপই আমার ভাল, পাপই আমার মাথার মণি। হরিগুপ্ত, সেই পাপের কথা মনে করে এখনও কি তুমি অনুশোচনা কর?

হরিগুপ্ত ঠিক বুঝতে পারলেন না, বললেন, কোন পাপের কথা বলছ?

আমি পরস্ত্রী, সন্তানের মাতা—আর সেই জন্যই তো এ ভাবে আত্মগোপন করে ফিরতে হচ্ছে। যদি কারু কানে এ কথা যায়, কেউ ক্ষমা করবে না, সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর পরকালে অনন্ত নরক, শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা আমাদের জন্য এই ভবিষ্যৎবাণীই করবেন। এ সব কথা মনে করে তোমার ভয় হয় হরিগুপ্ত?

ভয় ? না, ভয় ঠিক নয়। আর পরকালের কথাটা মনেই হয় নি। কিন্তু বিরাট একটা ধিক্কার এসেছিল মনে। অনুশোচনার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে চলেছিলাম। কিন্তু মনের সেই আগুন নিভে গিয়ে এখন নেমে এসেছে বিমল শান্তি ! তোমার কথা শুনতে শুনতে তোমার সংগে কথা বলতে বলতে আর তোমার সংগে পথ চলতে চলতে সেই অনুশোচনা কখন, কোথায়, কেমন করে খসে পড়ে গেল, নিজেই তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এবার তোমাকে পালটা প্রশ্ন করি। করব ?

কেন করবে না ? কিন্তু প্রশ্ন অনাবশ্যক। আমি নিজে থেকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। আমার মনেও কোন অনুশোচনা জেগেছিল কি না ? না, এক বিন্দুও না। আমার কথা বিশ্বাস কর, এক দিনের জন্যও না, এক মুহূর্তের জন্যও না। আমি জানি এ পাপ নয়। পাপ কাকে বলে, মর্মে মর্মে জেনেছি আমি। কত দিন পাপের পংকে আকণ্ঠ ডুবে ছিলাম, তুমি এসে আমায় উদ্ধার করলে। আর সেই তোমাকে ভালবাসা পাপ।

আমি তোমায় পাপের পংক থেকে উদ্ধার করেছি, এ বলছ কি তুমি শংখ ? অযথা এ সব কথা বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কোরো না।

শংখদেবী হেসে বললেন, না, এ ভাবে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আমার যা বলবার আছে তা আমি বলবই। ও চলবে না, তোমাকে শুনতেই হবে।

না শুনতে চাইলেও জোর করে শোনাবে ?

হ্যাঁ তাই শোনাব।

তবে আর কি করব, বল।

বাঃ, এই তো ভাল ছেলে। কিন্তু এ ভাবে চলতে চলতে নয়। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়েছি, অনেক দূর থেকে ঐ বটগাছটা দেখতে দেখতে আসছি। অনেক খানি ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, যেন

আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। ওর তলায় বসে একটু জিরিয়ে নেব, আর সেই সময় তুমি যে কথাগুলো শুনতে চাইছ না, সেগুলো বলব।

সত্যিই ভারী সুন্দর গাছটি। এখনও বিরাট বনস্পতি হয়ে উঠেনি, তবু প্রচুর ছায়া ছড়িয়ে আছে। যে আসে সামনে, তাকেই বসবার জন্য সাদর আহ্বান জানায়। এই ছায়াশীতল আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন।

আঃ, বলে হরিগুপ্ত একটুও দেরী না করেই ঘাসের উপর সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। শংখদেবীও বসলেন। বসে বললেন, এখন দেখছি, আমার চেয়েও তোমার বিশ্রামেরই দরকার ছিল বেশী।

হ্যাঁ, মিছে বলনি, বলে হরিগুপ্ত কাত হয়ে শুলেন। চিৎ হয়ে শুয়ে শংখদেবীর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

নিজের মানুষ এত কাছে থাকতে উপাধানহীন হয়ে অমন করে মাটিতে গড়াগড়ি আর কেন? শংখদেবী আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু হরিগুপ্ত বুঝতে পেরেও সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না, যেমন ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন। শংখদেবী এবার একটু কাছে সরে বসে তাঁর মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বললেন, আমার যেটুকু পাওনা সবই কি এমনি করে জোর করে কেড়ে নিতে হবে?

সাহস পাই না যে।

সাহস পাও না? কিন্তু সেই কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রিতে, কংকন বিলের বুকে, নৌকার উপরে—সেদিন তো সাহসের অভাব হয় নি?

সে সাহস চোরের সাহস, উত্তর দিলেন হরিগুপ্ত।

শংখদেবী কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

চুপ চুপ, কেউ যদি শুনতে পায়। ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীকে এ অবস্থায় দেখলে কি বলবে!

কে আছে এখানে, কে দেখবে?

স্থির, শান্ত প্রকৃতি। মাঝে মাঝে এক একটা দমকা বাতাস এসে সেই স্থির সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের দোলা জাগিয়ে তুলছিল। বটের পল্লবগুলি মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

উপর দিকে চেয়ে দেখ শংখ, বটের পাতাগুলি ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর দিকে তাকিয়ে কেমন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

হাসছে ওরা? হাসুক। হাসুক আকাশ, হাসুক বাতাস, হাসুক দশদিক, হাসুক নিখিল প্রকৃতি। আর ওদের হাসি আশীর্বাদের মত আমাদের উপর ঝরে ঝরে পড়ুক। সত্যি করে বল তো হরিগুপ্ত, বয়সের বোঝাটা আপনা থেকেই খসে পড়ে যাচ্ছে না?

হরিগুপ্ত প্রতিবাদ করলেন, আপনা থেকে? না আপনা থেকে নয়। এ তোমার হাতের যাদু। তোমার স্পর্শে আমার বয়সের জমা বরফগুলি গলে গলে ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, আমি আমার হারিয়ে যাওয়া তারুণ্যকে আবার ফিরে পেয়েছি।

আর আমার মনে পড়ছে সেই দিনের কথা যখন আমার জেগে-ওঠা কুমারী মন তোমাকে চোখে দেখার আগেই তোমার স্বপ্ন দেখছিল।

হরিগুপ্ত হেসে বললেন, এও আবার হয় নাকি?

হ্যাঁ হয়। তা না হলে তোমাকে দেখা মাত্রই আমি কেমন করে চিনে ফেললাম? কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তার আগেকার কাহিনী বড় মর্মান্তিক। আমার স্বপ্ন ভেংগে দিয়ে এক দিন বৃদ্ধ বিগ্রহপালের দীর্ঘ লোলুপ হস্ত আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তার কদর্য কামনার অন্ধকূপে।

রাজপ্রাসাদকে তুমি বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছ, তার ভিতরকার আসল রূপটার পরিচয় পাওনি কোন দিন। তার কানায় কানায় বিলাস, ব্যভিচার আর বিকৃত কামনার দুর্গন্ধ পংক। প্রথম প্রথম ঘৃণায় আমার মুখ ফিরে আসত। দেখতাম ভোগের বলি হিসাবে নিত্য নতুন মেয়ে আসে, কিছুদিন বাদেই রাজ-উচ্ছিষ্ট হয়ে তারা

কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। চোখের সামনে দেখতাম, কিছুই করার উপায় ছিল না, মনের বিক্ষোভ মনেই চাপা দিতে হোত। কিন্তু তাতেও বিগ্রহপালের কামনার নিবৃত্তি ছিল না। তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য কত ভাবেই না চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হোত। আমার সপত্নী ছিল আদর্শ পতিব্রতা। আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্বামীর কাছে নিয়ে উপহার দিত। আর আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত, কিছুতেই সাড়া দিতে চাইত না, কিন্তু সে তার দৈহিক বল প্রয়োগ করে আমাকে তার আয়ত্তে আন' সময় সময় আমাকে কৌশলে মদ খাইয়ে মাতাল করে আমার শরীরটাকে নিয়ে সে তার কামনা চরিতার্থ করত।

আঃ থাম, থাম শংখ, বাধা দিলেন হরিগুপ্ত।

কিন্তু শংখদেবীর কানে সে কথা গেল না। তিনি বলে চললেন, এই হল আমার রাজরাণী জীবনের প্রথম অধ্যায়। আমার পিতৃগৃহের স্বজন যারা, তারা বলেছিলেন, আমি পরম ভাগ্যবতী। সৌভাগ্য না থাকলে রাজরাণী হওয়া যায়! কিন্তু সেই সৌভাগ্যের রূপটা কি এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম, আর মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। এ এমন এক যন্ত্রণা যা মুখ ফুটে প্রকাশ করা যায় না, যার ফলে সমস্ত বিষ অন্তরাত্মাকে বিষাক্ত করে তোলে।

কিন্তু ক্রমে সবই বুঝি গা সওয়া হয়ে যায়। একটু একটু করে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগল। আমি ক্রমে ধাপের পর ধাপে নেমে আসতে লাগলাম। মোটামুটি একটা রফা করে বসলাম সেই জীবনের সংগে। এত দিন বিগ্রহপাল তার গায়ের পাঁক আমার গায়ে মাখিয়ে এসেছে, আর আমি এখন নিজেই সাধ করে নিজের গায়ে পাঁক মাখতে শুরু করলাম। রক্ষী বেষ্টিত রাজ অন্তঃপুরের গোপনকক্ষে কত কিছু ঘটতে পারে, তোমরা বাইরের জগতের মানুষ, সে ধারণা তোমাদের নেই। মনে আছে, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমি দেবী। শুধু তুমি নও, এমন অনেকের মুখেই

আমি একথা শুনেছি। শুনেছি, আর মনে মনে ব্যংগ ভরে হেসেছি। কিন্তু সেদিন তোমার এই কথা শুনে হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণায় ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে সব কথা তোমার কাছে খুলে না বলা পর্যন্ত এই যন্ত্রণা থেকে কিছুতেই আমার মুক্তি নেই। আজ যখন বলবার সুযোগ পেয়েছি, সব কিছু বলব, কোন কথাই গোপন রাখব না, তোমার চোখের সামনে তোমার এই দেবীর স্বরূপটা নগ্ন করে খুলে দেখাব।

আমাকে দয়া কর, দয়া কর শংখ, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না।

হরিগুপ্তের ব্যথাদীর্ণ আর্ত কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলেন শংখদেবী, তারপর পরম স্নেহভরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সব কথা শুনতে কষ্ট হচ্ছে তোমার? থাক তবে, বলব না। কিন্তু যে কথা খুলে বলা হোল না, সে কথাগুলি তুমি বুঝে নিও। এত দিন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শ্রদ্ধা সম্মান আর প্রীতির অর্ঘ্য পেয়ে আসছি। কিন্তু তোমার কাছে ফাকি দেওয়া আমার সইবে না। সেই জন্যই তো বলবার জন্য এমন ব্যাকুল আর উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম।

হরিগুপ্ত এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। শংখদেবীও আর কোন কথা বললেন না।

সময় নিঃশব্দে বয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ শংখদেবী চমকে উঠে বললেন, নাও, এবার ওঠ, উঠে বসো।

কিন্তু হরিগুপ্তের উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি যেমন চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, তেমনি রইলেন। বায়না ধরা শিশুর মতই বলে উঠলেন, উঠতে বলছ কেন? যেমন আছি, থাকি না।

এমন লগ্ন জীবনে আর ক'বার আসবে!

শংখদেবীর মনের আকাশে যে মেঘটা এসে জমেছিল, মুহূর্তে তা কেটে গিয়ে সারা আকাশ আলোয় ঝলমল করে উঠল। তিনি

লঘু কণ্ঠে হেসে বললেন, ওরে লুব্ধ, এত দিন এই লোভ কোথায় ছিল? কিন্তু উঠে বসতেই হবে। লগ্নটা ভাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্প্রতি তার উপর দুষ্টগ্রহের ছায়াপাত হয়েছে।

তার মানে? হরিগুপ্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

আহা, শুনতে পাচ্ছ না, এক দল মেয়ে কথা বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। ওই ঝোপটার আড়াল পড়েছে বলে ওদের দেখা যাচ্ছে না। এই এখনই বেরিয়ে আসবে।

ব্যাস, আর বেশী বলতে হোল না। ভিক্ষুণীর কোলের মায়া ছেড়ে ভিক্ষু ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। তার এই সন্ত্রস্ততা দেখে হেসে উঠলেন শংখদেবী।

চুপ, চুপ, কোন ভিক্ষুণী কোন দিন এমন চপল কণ্ঠে হাসে না। হাসতে নাই।

শংখদেবী ঠিকই বলেছিলেন। একটু বাদেই দেখা গেল কয়েকটি নারীমূর্তি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ওদের সবার মাথার উপরে একটা যেন কি। আর একটু কাছে এলে পর হরিগুপ্ত বললেন, ওরা গোয়ালিনী, দই বিক্রি করতে বেরিয়েছে।

ওরা কলকল করে কথা বলতে বলতে আসছিল। প্রথমে লক্ষ্য করেনি, পরে তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, শেষে মাথার ভাঁড় মাটিতে নামিয়ে রেখে একে একে সবাই সাষ্টাংগে প্রণিপাত করল।

কোত্থেকে এলে গো তোমরা? প্রশ্ন করলেন শংখদেবী।

দই নিয়ে হাটে গিয়েছিলাম মা।

এখনই ফিরে এলে? যেতে যেতেই সব দই বিক্রি হয়ে গেল বুঝি? কোথায় আর বিক্রী, এক ফোঁটাও না। আজ কি দেখেই যাত্রা করেছিলাম! মিতারার হাট এত বড় হাট, কিন্তু সেই হাট আজ বসলই না মোটে। এত বয়স হোল, চির কাল এই হাট করে এলাম, কিন্তু জন্মে এমন কখনও দেখিনি!

কেন গো, হাট বসল না কেন?

মুখপোড়া সৈন্যেরা নাকি আসছে। এলে পর হাটের উপর এসে হামলা করবেই। ওরা দাম দেয় না, ওদের মনের মত যা কিছু পায়, সবাই লুটে পুটে নিয়ে নেয়। এটাই নাকি ওদের রীত্। এই কথাই বলাবলি করছে সবাই। এ সব কথা শোনার পর আমরা আর এক দণ্ড দাঁড়াতে সাহস করলাম না। বয়সের মেয়ে রয়েছে সংগে। সৈন্যদের বিশ্বাস আছে!

হরিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কাদের সৈন্য—আমাদের না ওদের?

সে কথা জানি না বাবা। আর কি-ই বা হবে সে কথা জেনে!

সৈন্য—সব সৈন্যই সমান, এর আর আমাদের আর ওদের কি! যে আসবে সেই লুটপাট করে নেবে, আর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে আমাদের ক্ষেতের ফসল খাওয়াবে। তাই নিয়ে কি কথা বলার উপায় আছে? বাড়ীতে ডাকাত পড়লে মানুষ সুযোগ পেলে দল বেঁধে রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু ওদের বেলা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। আর সব চেয়ে ভয় এই বয়সের মেয়েগুলিকে নিয়ে।

দলের মধ্যে দুটি বয়সের মেয়ে, ওরা এসব কথা শুনে কেমন জড়সড় হয়ে আছে।

যেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ওদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছিল, হরিগুপ্ত তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, কি গো মা, তোমাদের এখানে রাজা কে এখন? আমরা তীর্থ করতে গিয়েছিলাম বিদেশে, বহু বছর বাদে ফিরছি, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি।

রাজা? রাজার কথা বলছ? রাজা তো মহারাজ মহীপাল।

আর একটি মেয়ে সংগে সংগেই তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, আহা-হা কেমন কথা বলে শোন, মহারাজ মহীপাল না মারা গেলেন সেদিন কৈবর্তদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে?

তা বটে, তা বটে, বৃদ্ধা নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, অত মনে-টনে থাকে না।

হরিগুপ্ত এবার অন্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এখানকার রাজা এখন কে ?

মেয়েটি উত্তর দিল, সঠিক করে বলতে পারব না বাবা। মিতারার হাটে নানা জায়গা থেকে লোক জন আসে, তাদের কাছেই আমরা খবরাখবর পাই। শুনেছিলাম কৈবর্তেরা রাজ্য দখল করে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানকার রাজা কে, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে এক এক জন এক এক রকম কথা বলে। কেউ বলে, মহারাজ মহীপালের দ্বিতীয় ভাই শূরপাল, আবার কেউ বলে, না শূরপাল নয়, তার পরের ভাই রামপাল। জানিনা কার কথা ঠিক, আমরা যেমন শুনেছি তেমনি বললাম। আবার একজন বলছিল, দেশ এখন অরাজক—আমাদের মাথার উপর কোন রাজা নাই। আমি বললাম, এ তুমি কি বলছ ? প্রজা থাকবে অথচ রাজা থাকবে না, একি কখনও হয় নাকি ? কোন শাস্ত্রে এমন কথা লেখেনি ! রাজা না থাকলে আমরা আছি কেমন করে ?

তার কথার ভুল ধরে আর তাকে ডিংগিয়ে আর একজন এতগুলি কথা বলে যাবে, প্রথমা স্ত্রীলোকটির এটা একেবারেই মনঃপুত হয়নি। সে ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, আহা লো, কত বড় পণ্ডিতানী আমার, বড় শাস্তর কথা শোনাতে এসেছেন—রাজা না থাকলে আমরা আছি কি করে ? রাজা আমাদের কোন্ কাজে লাগে শুনি ? দেশে অনাবৃষ্টি-অজন্মা লেগেই আছে, চোর ডাকাতের উপদ্রবে মানুষ অস্থির, অসুখ-বিসুখ ঘর থেকে নামতে চায় না, অভাবে-অনটনে মরে গেল মানুষ, কিন্তু রাজা কোন দিন দেখতে এসেছে ? ডেকে একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছে—ওগো তোমরা কেমন আছ ? রাজা জানে শুধু তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিতে। জমির কর দাও, হাটের কর দাও, ব্যবসা বাণিজ্যের কর দাও শুধু—দাও, দাও, শব্দ। এমন রাজা থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভাল।

আহা কি যে কথা বল মাসী, একজন বলে উঠল, এমন কথা বলতে নেই গো। রাজা আর দেবতায় কি কোন তফাৎ আছে ?

বৃদ্ধা উত্তর দিল, সে যেদিন ছিল, সেদিন ছিল। সেই দিনও নেই, সেই রাজাও নেই। এখনকার রাজারা নিজের পেট ভরতেই ব্যস্ত। সেই যে সেবার আকাল লাগল, সারা দেশ ছারখার হয়ে গেল, মহারাজ বিগ্রহপাল তখন দেশের রাজা, কি করল সে ? তারই চোখের সামনে মানুষগুলো পট পট করে মরছে, কিন্তু সে তখন তার পাওনা গণ্ডা আদায় করেই চলেছে। আমি তখন নূতন বউ, কোলে এক বছরের ছেলেটা। না খেয়ে না খেয়ে হাড্ডি সার হয়ে গেলাম. বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। শেষ কালে বুকের দুধটুকুও না পেয়ে সোনার বাছা আমার ছটফটিয়ে মরে গেল।

বহু দিনের পুরানো সেই দুঃখ আবার যেন নূতন হয়ে উথলে উঠল। চোখে আঁচল তুলে দিল সে। সবাই অনেক করে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে থামাল।

এদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট যে সে বলল, সে কোন যুগের কথা মাসী, এখন সেই সব কথা তুলছ।

কোন যুগের কথা কি লো ! এ যে সেদিনকার কথা। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এখন ওদের ঘরে ফেরার তাড়া, দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নাই। মাসীকে কোন মতে সামলে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন বলল, যাই গো মা, যাই গো বাবা। মিত্তারায় সৈন্যদের কথা শুনে এলাম, গাঁয়ের লোকদের খবর দিতে হবে তো।

তোমাদের গ্রাম কতদূর এখান থেকে? শংখদেবী প্রশ্ন করলেন।

আমাদের গাঁ ? না, দূর আর কোথায় ? সামনে ওই যে মাথাভাংগা তালগাছটা দেখছ না, ওই গাঁয়ের নাম সিদ্ধল। তার পরেই আমাদের শিমুলতলী।

যাবার আগে ওরা আর একবার প্রণাম করে নিয়ে বলল, তোমরাও আর এখানে বসে থেকো না। সময়টা ভাল নয়।

মাসী প্রস্তাব দিল, তোমরাও চল না আমাদের সংগে। আমাদের গাঁয়ের লোক তোমাদের মত পূণ্যবান লোক পেলে বড় খুশী হবে। অনেক ভাল কথা শুনতে পাব তোমাদের মুখ থেকে।

শংখ দেবী মিষ্টি হাসি হেসে বিদায় দিলেন, না গো না, তোমরা তোমাদের ঘরে যাও। আমরা অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করছি এখানে। আর সৈন্যরা? না, ওরা আমাদের কিছু বলবে না। আমাদের কি আছে, কিইবা নেবে!

ওরা চলে গেল। সবার মাথায় দৈয়ের ভাঁড়, কিন্তু সেজন্য দৃকপাত নাই। স্বচ্ছন্দে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে দূর থেকে ভেসে আসছে ওদের কলকলানি। মনে হচ্ছে যেন সবাই মিলে একই সংগে কথা বলে চলেছে।

ওরা চলে গেল। দুজনেই নিঃশব্দ হয়ে রইলেন। প্রথমে কথা বললেন শংখদেবী, হরিগুপ্ত, তুমি আমাকে এক নূতন জগতে নিয়ে এসেছ, আর সাথে সাথে নূতন মানুষ হয়ে উঠছি আমি। এই যে গ্রামের মানুষগুলি যাদের চিনতাম না, জানতাম না, যাদের কথা ভুলেও মনে করিনি কোন দিন, কি আশ্চর্য দেখ, আজ মনে হচ্ছে এরাই আমার আপন মানুষ, আর মনে মনে কামনা করছি, এদের মাঝখানেই যেন আমার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি এই যে ওদের মাসী, রাজাদের সম্পর্কে মন খুলে কত কথা বলে গেল, আমার মনে হয় এতটুকুও বাড়িয়ে বলেনি সে। কিন্তু যদি জানত আমি কে, কার সংগে সে কথা বলছে, তা হলে কি এমন করে বলতে পারত? সেই জন্যই যে নিষ্ঠুর নির্মম পাষাণপুরীর অবরোধ ভেংগে বেরিয়ে এসেছি, আর সেখানে ফিরে যেতে চাই না। আমি এদের সংগে মিশে যেতে চাই, যেমন করে জল জলের সংগে মিশে যায়। রাজপ্রাসাদ আমার কাছে অতীত দিনের ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। তার

মাঝখানে আবার যেন আমাকে ফিরে যেতে না হয়। তুমি আমাকে বাঁচাও হরিগুপ্ত। একমাত্র তুমি ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

হরিগুপ্ত র উত্তরে বললেন, একটা অপ্রিয় কথা বলব? কিছু মনে করবে না তো!

শংখদেবী হেসে বললেন, এক দিন অনেক প্রিয় কথা শুনেছি তোমার কাছে, আজ না হয় একটা অপ্রিয় কথাই শুনলাম, বল তুমি। নির্ভয়ে বল।

আমার ভয় হয়, এখন তুমি যা বলছ, তার অনেকটাই তোমার স্বপ্ন দেখা। চারি দিককার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়া আর সাময়িক ভাবাবেগ তোমাকে তোমার নিজের মাটি থেকে উন্মুলিত করে তুলতে চাইছে। কিন্তু দু'দিন বাদে এই স্বপ্নের বুদ্বুদ যখন কেটে যাবে—

কেন, এ কথা বলছ কেন? আমার কাজের মধ্য দিয়ে কোন দিন কি তুমি অতিরিক্ত ভাবালুতার পরিচয় পেয়েছ?

না, পাইনি। কিন্তু আজ তুমি যা বলছ আর যা করছ, এ তোমার স্বধর্ম নয়।

কি আমার স্বধর্ম বলতে পার?

অভয় দিয়েছ যখন একটু মন খুলেই বলি। তুমি যাই বল না কেন, রাজপ্রাসাদ তোমার পক্ষে একটা দৈব ঘটনা মাত্র নয়। ভগবান তোমাকে একান্ত ভাবে রাজপ্রাসাদের যোগ্য করেই গড়ে তুলে-ছিলেন। তোমার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, কুটবুদ্ধি আর সুচতুর কর্ম-কৌশল তোমার স্বপক্ষ আর প্রতিপক্ষ সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, সে কথা তোমার অজানা নয়।

হ্যাঁ, জানি আমি।

আর সেই একই কারণে আমি মনে মনে তোমাকে ভয় করে এসেছি, সে কথা হয় তো তোমার জানা নেই।

ভয় ?

হ্যাঁ, ভয়ই তো। ভয় ছাড়া আর কি নাম দেব তার? কূট রাজনীতি আর জটিল চক্রান্ত, এদের সম্পর্কে আমার ভয়ও আছে, বিতৃষ্ণাও আছে। আমি আমার ভাগ্যগুণেই হোক বা ভাগ্যদোষেই হোক, প্রথম জীবন থেকে রাজপ্রাসাদের সংগে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তা হলেও আমি যতদূর সম্ভব এ সব এড়িয়ে আসছিলাম।

শংখ দেবীর মুখের ভাব বদলে এল, বললেন, তা হলে আমার সম্পর্কে শুধু ভয়ই নয়, বিতৃষ্ণাও ছিল ?

হরিগুপ্ত হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলেন। একটা কাক নীচু একটা ডালে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে খুব মনযোগ দিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ এই হাসির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে ঝটপট করে উড়ে চলে গেল।

শংখ দেবী ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু কঠিন সুরে বললেন, অমন করে হাসছ কেন ?

শংখ দেবীর ভ্রূভংগিতে হরিগুপ্তের কিন্তু ভয়ের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি হাসি মুখে বললেন, তোমাদের কথা শুনে না হেসে থাকতে পারা যায়! এত দিন বাদে এমন একটা কথা তুমি বললে! বিতৃষ্ণাই যদি থাকত, তবে তো রক্ষা পেয়ে যেতাম। তা হলে কি আর ভাল মন্দ বোধ বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে মধুমত্ত ভৃংগের মত তোমাকে ঘিরে এমন করে ঘুরে ঘুরে মরতাম!

শংখ দেবীর মুখের ভাব সহজ হয়ে এল। বললেন, কয়েক দিন থেকে অ-বাকপটু হরিগুপ্তের আশাতীত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সেও তোমারই গুণে। কিন্তু শংখ, বিতৃষ্ণার কথাটা তুমি কেমন করে বললে, সেই কথাটা এখনও আমি ভাবছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের এই সব কাজের মধ্যে এ হেন আমাকেও তো তুমি পেয়েছিলে। সে কথা তোমার মনে নেই? তোমাদের ওই সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি, হানাহানি আর দলাদলির রাজনীতি

আমার কাছে বড় অরুচিকর লাগত। কিন্তু তবু আমি তোমার কথা এড়াতে পারিনি। যেটকু করেছি, একমাত্র তোমার মুখের দিকে চেয়েই করেছি।

শংখ দেবী মাথা নীচু করে রইলেন। এর উত্তরে স্বপক্ষে বলার মত কোন কথাই খুঁজে পেলেন না। হরিগুপ্ত তার মনের ভাব কিছুটা অনুধাবন করতে পেরে অন্য প্রসংগ টেনে নিয়ে এলেন। কিন্তু শংখ দেবী সে কথায় যোগ দিলেন না।

হঠাৎ হরিগুপ্তকে চমকে দিয়ে তাঁর একটা হাত দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তিনি অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর হরিগুপ্ত। ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তোমার মত বিশুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়কে আমাদের এই সংকীর্ণ স্বার্থচক্রের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলাম, সে জন্য আমি এখন অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরছি। বিশ্বাস কর আমার এই কথা।

এ কি, শংখ, এ সব কি বলছ তুমি ?

হ্যাঁ, সত্য কথাই বলছি। এ দুঃখ আমার কোন দিন যাবে না। আমি এ বিষয়ে অপরাধী, শত বার স্বীকার করি। কিন্তু তবু একটা কথা বলি, তুমি যাকে বলছ আমার স্বধর্ম, তা ঠিক নয়। তোমার এই কথা মানব না, আমি কিছুতেই মানব না।

হরিগুপ্ত প্রবোধ দেওয়ার সুরে বললেন, বেশ তো, সত্যি যদি না হয়, কেন মানবে ? আমি বললাম বলেই যে কথাটা সত্যি হয়ে গেল, তা তো নয়।

তার এই কথাটাকে একেবারেই গায়ে না মেখে শংখ দেবী প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু কেন ভালবাস বলতে পার হরিগুপ্ত ?

প্রশ্ন শুনে হরিগুপ্ত তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন।

আমার যৌবনে আমি সুন্দরী বলে খ্যাত ছিলাম। কিন্তু সেই

সৌন্দর্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই আজ। এতএব রূপের জাল দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে রেখেছি এ কথা সত্যি নয়।

না, সত্যি নয়, হরিগুপ্ত প্রতিধ্বনির মতই বললেন।

আমার স্বধর্ম বা প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার ঘোর বিতৃষ্ণা। তুমি নিজেই প্রকারান্তরে এ কথা বলেছ। এখন আমার মুখের দিকে চেয়ে এ কথার প্রতিবাদ করতে যেও না।

হরিগুপ্ত কোন কথা বললেন না।

তাই যদি সত্য হয়, তা হলে আমার মধ্যে এমন কি আছে যা তুমি ভালবাস? চুপ করে থেকো না, কথাটার উত্তর দাও।

আমি জানি না, উত্তর দিলেন হরিগুপ্ত।

জান না? সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু আমি জানি। তুমি বোঝ আর নাই বোঝ, আমার মধ্যে যাকে তুমি ভালবেসে এসেছ, সেইটাই আমার সত্যিকারের নিজস্ব প্রকৃতি। তুমি তো জান না, প্রতি মুহূর্তে আমার মধ্যে কি যে সংঘর্ষ চলে এসেছে। আমি একটি সুন্দর, সুকুমার, শুভ্র মন নিয়ে তোমাদের এখানে এসেছিলেম, কিন্তু রাজপ্রাসাদের কুৎসিৎ পরিবেশ আর জীবন-ধারা আমার সেই মনকে অশুচি ও বিকৃত করে তুলল। কিন্তু তা আমাকে একেবারে মেরে ফেলতে পারেনি। যে ভাবেই হোক তোমার অন্তরের গভীরে আমার সেই রূপের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই যদি না হবে তা হলে তোমার মত মানুষকে আমি কেমন করে আমার এত কাছে টেনে নিয়ে এলাম? এ তো ক্ষণিকের মোহ নয়। আমাদের দীর্ঘ আর সংকটসংকুল জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে সে কথা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

হরিগুপ্ত চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তুমি আমাকে নূতন করে ভাবিয়ে তুললে। এ কথাটা এমন করে আর কখনোই ভেবে দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার কথাই হয়তো সত্য। কিন্তু তবু ভয় হয়, কি জানি যদি—

যদি আবার সেই বিকৃতির মধ্যে ফিরে যাই, সেই কথাটাই বলতে চাইছ তো? না, এখন আমি আমার পরম নির্ভর খুঁজে পেয়েছি, আর আমার ভয় নাই। একটা কথা তুমি জান না, আমার অতীত দিনের এই দুর্গতির জন্য তুমিও কম দায়ী নও।

আমি! আমাকে দায়ী করছ! কিন্তু কেন? হরিগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, তুমিই সব চেয়ে বেশী দায়ী। শংখ দেবীর কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারী হয়ে এল। আমার প্রতি কি তোমার কোন দায়িত্বই ছিল না? আমার জীবনের সেই পরম দুর্দিনে, আমার জীবনের সেই পরম আনন্দময় লগ্নে এক লিপির মধ্যে দিয়ে তোমাকে জানালাম, বন্ধু, এই রাজপ্রাসাদ আমার আত্মাকে তিলে তিলে হত্যা করে চলেছে। তুমি আমাকে বাঁচাও, আমাকে মুক্ত করে তোমার ওই আনন্দময় জগতে নিয়ে যাও। মনে পড়ে সে কথা?

হরিগুপ্ত মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পড়ে।

আর তুমি কি করলে তখন? কাউকে কোন কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলে। সবাই বলল, ধন্য, ধন্য হরিগুপ্ত, এই বয়সেই ভগবানকে লাভ করার জন্য সংসার ত্যাগ করে চলে গেল। সারা সংসারে এক মাত্র আমিই জানলাম—সে পালিয়েছে। আর তার ফলে কি ঘটল জান?

কি? শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হরিগুপ্ত।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম তোমার উপর, আমার নিজের উপর আর সমস্ত সংসারের উপর। বললাম, আর আমার কোন দায় দায়িত্ব নেই, আমি যে পথ পাব, সেই পথেই ভেসে চলব। ভেবে দেখ, তুমি চলে যাওয়ার পর কি আমার রইল? অমন শূন্যতার বোঝা বয়ে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? তখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম কূট রাজনীতির আবর্তে, মেতে গেলাম স্বার্থের নির্মম হানাহানির খেলায়, যে খেলায় নীতি আর বিবেকের কোনই স্থান নেই।

তারপর এক দিন তুমি ফিরে এলে। তোমার চোখে দেখলাম গভীর মমতার ছবি, বুঝলাম, আমার তুমি আমারই আছ। এত লাঞ্ছনার মধ্যেও আমার সেই মনটা একেবারে মরে যায় নি। তোমার দৃষ্টিপাতে মরা গংগায় বান জাগল। মনে হোল, যেন আমি কানায় কানায় ভরে উঠলাম। কিন্তু তখন আমি কূট চক্রান্তের সহস্রজালে জড়িয়ে পড়েছি। তার মধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আসি সে শক্তি আমার নেই। বুঝি বা ইচ্ছাও নেই। শক্তির খেলায় তখন আমি প্রমত্ত হয়ে উঠেছি। সামনে একটি মাত্র পথ, সেই কুটিল পথ, এ ছাড়া আর কোন পথ আমার চোখে পড়ল না। আর সেই পথ দিয়ে তোমাকেও টেনে নিয়ে চললাম। আরও শুনতে চাও?

না, আর দরকার নাই।

এবার বুঝতে পারছ, শুধু আমি নই, আমার জন্যে তুমিও দায়ী?

না, আমি তা মানি না। তুমি মুক্তি চেয়েছিলে, কিন্তু তা তো মুক্তির পথ নয়। যে আমার প্রিয়তমা, তাকে কি আমি এমন করে সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র করে কলংকের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারি? আবেগে হরিগুপ্তের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

শংখ দেবী কতক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে হরিগুপ্তের এই মধুর স্বীকারোক্তি-টুকু গভীরভাবে উপভোগ করলেন, তার পর বললেন, আর আজ?

আজকার কথা স্বতন্ত্র। ভাগ্যের স্রোতে আজ আমরা ভেসে চলেছি। আর লোক সমাজের মাঝে থেকেও এক দিক দিয়ে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে আছি।

একটু থেমে হরিগুপ্ত আবার বললেন, কিন্তু এ ভাবে কত দিন আর ভেসে চলবে শংখ? কুলে তো এক দিন ভিড়তেই হবে।

শংখ দেবীর চোখে শংকার ছায়া ভেসে উঠল। হরিগুপ্তের একটা হাত চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, কুলের কথা আর তুলো না হরিগুপ্ত। জীবনের কতই বা বাকী। এই বাকী ক'টা দিন আমি এমনি করে অকুলেই ভেসে বেড়াতে চাই।

কিন্তু রামপাল! তুমি যে তার মা। তাকে ছেড়ে তুমি কেমন করে থাকবে?

রামপাল? সে তো ওই রাজপ্রাসাদেরই অংশ। তাকে পেতে হলে রাজপ্রাসাদেই ফিরে যেতে হবে। হরিগুপ্ত, আর কত দুঃখ দেবে আমাকে, আবারও কি আমাকে সেই চক্রান্তের জালের মধ্যেই ফেলে দিতে চাও?

হরিগুপ্ত আশ্বাস দিয়ে বললেন, আবার কিসের চক্রান্ত? চক্রান্তের মূল তো ছিঁড়েই গেছে।

ভুল, ভুল বলছ তুমি, ওর মূল ছিঁড়বার নয়। রাজপ্রাসাদ থাকবে, আর চক্রান্ত থাকবে না, এ কি কখনও হতে পারে? আমি পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এবার শক্তির সংঘর্ষ বেঁধে উঠছে শূরপাল আর রামপালের মধ্যে। ওর মধ্যে আমি আর গিয়ে পড়তে চাই না।

এ তোমার মিথ্যা সন্দেহ, হরিগুপ্ত প্রতিবাদ করলেন, এ কখনও হতে পারে না। রাজধানী গৌড় কৈবর্তদের অধিকারে চলে গেছে। এই চরম দুঃসময়ে এরা কখনই আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না।

শংখ দেবী হেসে বললেন, রাজবৈদ্য, মনুষ্যদেহ বা দেহগত ব্যাধি সম্পর্কে তুমি যদি কোন অভিমত প্রকাশ করতে, আমি এক কথায় তা মেনে নিতাম। আর রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে আমার মতামতগুলো তুমিও তেমনি করে মেনে নিও। যতই দুঃসময় হোক না কেন, এই সংঘর্ষ চলছেই, আমার একথাটা তুমি শুনে রাখো। কেনই বা চলবে না? এত দিন ধরে আমরা তো তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছি। আমি জানি কনিষ্ঠ হলেও রামপালের মনে রাজ্যলিপ্সার শিখা লেলিহান হয়ে উঠেছে, আর সেই আগুন আমরাই নিজ হাতে জ্বালিয়ে তুলেছি। তা ছাড়া যত দিন আমার ভাই মথনদেব জীবিত আছেন, তত দিন এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনমতেই শান্তি স্থাপিত হতে পারে না।

কিন্তু সে কথা থাক। হরিগুপ্ত, শোন আমার কথা, আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছি, আমার আর রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়া হবে না—কোন দিন না। কিন্তু সেই সংগে তোমার কথাটাও শুনতে চাই। বল, তুমি কি এরই মধ্যে আমার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ?

ছিঃ শংখ, এ কি কথা বলছ তুমি ? আমার কোন কথা তোমার জানা নেই ? তবে কেন এমন করে বল ?

শংখ দেবী উত্তর দিলেন, না বলে কি করব, তুমিই যে জোর করে বলাও। আজ যদি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাই, আর কি তোমাকে কোন দিন এমন করে পাব ? সারা জীবন ধরে যাকে চেয়ে এলাম, এতদিন বাদে তাকে পেয়ে আমার বুক ভরে উঠেছে। আর কি আমি তাকে হাত-ছাড়া করতে পারি ? আর হরিগুপ্ত, তোমার প্রিয়তমাকে বিদায় দিয়ে তুমিই বা কি নিয়ে থাকবে ? আমার ছেলে আছে, ভাই আছে, স্বজন আছে, রাজ্য আছে, তোমার যে আর কেউ নেই।

হরিগুপ্ত কোন কথা বলতে পারলেন না, অভিভূত হয়ে বসে রইলেন।

শংখ দেবী বলে চললেন, এখন আর কূলের কথা ভেবে লাভ নেই। এখন থেকে এ নিয়ে তোমাকে কোন কিছুই ভাবতে হবে না। যা ভাববার আমিই ভাববো। শত্রুবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ থেকে পালাবার সময় সুড়ংগ পথে পা বাড়াতে গিয়ে শেষ কথাটা কি বলেছিলাম মনে আছে ? বলেছিলাম, এখন থেকে তোমার পরিচালনার ভার আমিই নিয়ে নিলাম। সেদিন এই কথাটার তাৎপর্য তুমি হয় তো বুঝতে পারনি। আমি কিন্তু পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই কথাটা বলেছিলাম।

ওরা কথার মধ্যে এমন করেই ডুবে গিয়েছিলেন, বেলা যে পড়ে এসেছে সেদিকে কারও খেয়াল ছিলনা। প্রথম নজর পড়ল

হরিগুপ্তের। তিনি উৎসাহের ঝোঁকে চেঁচিয়ে উঠলেন, আঃ শংখ, রাখ তোমার কথা।

চেয়ে দেখ একবার পশ্চিম আকাশের দিকে।

সত্যি চেয়ে দেখবার মতই বটে। একবার চোখ পড়লে আর চোখ ফেরানো যায় না। লাল টকটকে সূর্য পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করেছে। তারই লালিমায় স্নান করে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি লাল হয়ে উঠেছে। সে লাল কোথাও সিঁদুরের মত লাল, কোথাও আবীরের মত লাল, কোথাও গেরুয়া মাটির মত লাল, কোথাও বা লালের পাতলা একটু আমেজ। একই আকাশ জুড়ে কত রকম রংয়ের খেলা। একই লালিমা, যে যতটুকু পারে গ্রহণ করেছে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

এমনি করে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রথমে কথা বললেন শংখ দেবী।

হরিগুপ্ত তার কথায় সাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এমনি করে হঠাৎ আমাদের জীবন সন্ধ্যাও একদিন নেমে আসবে। আজও তো এসে যেতে পারে, পারে না?

কেন পারবে না? কিন্তু যতক্ষণ তা না আসছে, রাত্রিবাসের আস্তানাটা ঠিক করে ফেলতে হয়। আজকের রাতটা আমরা কোথায় কাটাব হরিগুপ্ত?

সে কথা আমি কি জানি। উত্তর দিলেন হরিগুপ্ত। পরিচালনার ভারটা তো তুমি নিজের হাতেই তুলে নিলে। এখন তুমি যে পথে চালাও, আমি সেই পথেই চলব।

শংখ দেবী হেসে উঠে বললেন, বেশ বেশ, কিন্তু সব সময় মনে থাকে যেন সেই কথাটা। আমার কিন্তু এই জায়গাটা বড় মনে ধরে গেছে, ছাড়তে মায়া লাগছে। এখানে বসেই আজ আমরা আমাদের মনের অনেকগুলো গ্রন্থি খুলে ফেলেছি। দেখ গো, আমি বলি কি, আজকের রাতটা এখানেই কাটুক

না। খোলা আকাশের নীচে এমন অনেক রাতই তো আমরা কাটিয়েছি!

ঠিক আমার মনের কথাটাই খুলে বলেছ।

আমার নিজের মন দিয়েই আমি তোমার মন দেখতে পাই যে।

কিন্তু আমরা কি খাব? শুধু কথা দিয়েই কি আমাদের পেট ভরাতে হবে?

আঃ, সে ভাবনা তুমি ভাবছ কেন? আমি তোমাকে না খাইয়ে রাখব না। আমার উপর কি এটুকু নির্ভর করতে পার না তুমি? আমাকে একটা রাজ-সংসার চালাতে হোত এক কালে, সে কথাটা ভুলে যাও কেন?

তাই স্থির হয়ে গেল। আজকের রাত এখানেই কাটবে।

কিন্তু সেই স্থির আর স্থির রইল না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীকে নিয়ে যাবার জন্যে শিমুলতলী থেকে কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত। অদ্ভুত যোগাযোগ! ওদের মধ্যে একজন সামনে এগিয়ে এসে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ গো, এঁরাই তো তাঁরা! আমি আগেই ভেবেছিলাম বলেই সে শংখ দেবীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। সংগে সংগে আর সবাই।

শংখ দেবী একটু পিছনে হটে গিয়ে বললেন, কে গো তোমরা? কি চাও আমাদের কাছে?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মা আমি, আমি তোমার বেরজবাসী।

বেরজবাসী? সে আবার কে? শংখ দেবী আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। বেরজবাসী এবার মুখের হতাশা সূচক শব্দ করে বলল, আহা মা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে! সেই যে ক'মাস আগে চক্রশিলা গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল—

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে আমাদের, শংখদেবী আর হরিগুপ্ত একই সংগে বলে উঠলেন।

মনে আবার থাকবে না, সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে! কি দিয়েছিল কালব্যাধি দেখা দিল ঘরে ঘরে। ভাগ্যিস তোমরা গিয়ে পড়েছিলে, তা নইলে গাঁয়ের একটা মানুষ বাঁচত না, চক্রশিলা গাঁয়ের লোকেরা সবাই এ কথা বলে। চক্রশিলা আমার শ্বশুরের দেশ। বউ আর ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বেড়াতে, হারে আমার বেড়ানো, যাওয়ার সংগে সংগে বউ আর ছেলে দুটোই পড়ল এক সংগে। কেবল ঘর আর বার, ঘর আর বার, শেষে আর বাইরে যেতে পারে না। মরেই তো গিয়েছিল, তোমরা গিয়ে বাঁচালে। আমার বউর নাম সন্ন আর ছেলে মাণিক। এই বার মনে পড়েছে তো?

সেদিন চক্রশিলা গ্রামে কত স্বর্ণ আর কত মাণিক সেই দারুণ রোগে লুটোপুটি খেয়েছে, পুরো একটা মাস কত রোগীর সেবা করতে হয়েছে, তাদের মধ্যে কারু নাম কি আর মনে করে রাখা সম্ভব? তবু বেরজবাসীকে খুশী করবার জন্য শংখ দেবী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে বটে। তোমার বউর নাম সন্ন ছেলের নাম মাণিক, কেমন ঠিক বলছি না?

বেরজবাসী গালভরা হাসি হেসে বলল, অ্যাঃ হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা যা বলেছ, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। তাই তো বলি, তুমি কি কখনও আমাদের কথা ভুলে যেতে পার! শংখ দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আমরা যে এখানে, ও ব্রজবাসী, তোমরা কেমন করে জানলে?

কেমন করে জানলাম? আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা দই বেচতে গিয়েছিল হাটে। ফিরবার পথে এইখানেই তো তোমাদের সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে। ওরাই গিয়ে বলল। আমি বললাম, এ আর কেউ নয়, আমাদের সেই মা আর বাবা।

সবাই বলল, তা তোরা তাদের সংগে করে নিয়ে এলি না কেন?

ওরা উত্তর করল, আমরা বলেছিনু গো, তা তেনারা এলেন না, আমরা কি করব।

হরিগুপ্ত সেই মেয়েদের পক্ষ সমর্থন করে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক কথাই, তারা অনেক করে আমাদের বলেছিল। আমরাই যাইনি।

এবার আর কেউ তাঁরা যাবেন কি যাবেন না এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাইল না, সবাই মিলে কলরব করতে করতে যেন তাদের টেনে নিয়ে চলল। সম্মতি বা অসম্মতি জানাবার মত কোন অবকাশই পেলেন না তাঁরা।

ইতিমধ্যে আকাশে ভাংগা চাঁদটা দেখা দিয়েছে।

আকাশের কোলে জ্যোৎস্নার পাতলা পর্দাটা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বট গাছটা ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। শংখ দেবী হতাশাখিন্ন কণ্ঠে হরিগুপ্তের কানের কাছে গুঞ্জন করে বললেন, দেখ গো দেখ, একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ। বটগাছটা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা যে বলেছিলাম ওর তলায় সারাটা রাত কাটাব। আঃ কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর বাতাস আর কি সুন্দর ওই গাছটি।

হরিগুপ্ত তার প্রত্যুত্তরে বললেন, সত্যই ভারী সুন্দর, কিন্তু এবার এদিকে চেয়ে দেখ একবার, কি সুন্দর এই মানুষগুলি। কেমন করে ওরা পরকে আপন করে নিতে পারে।

সত্যি বলেছ, কি সুন্দর এই মানুষগুলি, আমি কাকে ফেলে কার দিকে তাকাই। শিমুলতলীতে এসে একটা নূতন সংবাদ পাওয়া গেল। পূর্ব পাড়ার অনংগ গয়ায় গিয়েছিল বাপের পিণ্ড দিতে। কালই ফিরেছে। আসবার সময় পথে শুনে এসেছে রাজা শূরপালদেব কাঞ্চন নগরে তাঁর নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কাঞ্চন নগর? হরিগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, তবে যে শুনেছিলাম গৌড় ছেড়ে তাঁরা ধর্মপুরের দিকে গিয়েছিলেন, সে কথাটা কি তা হলে ঠিক নয়?

অনংগ বলল, কথাটা সম্ভবত ঠিকই। আমিও সেই রকমই শুনেছি।

প্রথমে তাঁরা ধর্মপুরেই গিয়েছিলেন। কিন্তু কৈবর্তেরা ধর্মপুর আক্রমণ করতে আসছে সংবাদ পেয়ে তাঁরা ধর্মপুর ছাড়লেন। তারপর কিছুদিন এখানে কিছুদিন ওখানে এই ভাবে ছুটোছুটি করে অবশেষে কাঞ্চন নগরে গিয়ে স্থায়ী হয়ে বসেছেন।

আজকালকার দিনের খবর কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যে বলা কঠিন। রামপালদেব কোথায়? হরিগুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

অনংগ উত্তর দিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এক একজন লোক এক এক রকম কথা বলে। কেউ বলে তিনিও কাঞ্চন নগরেই আছেন, আবার কেউ বলে তিনি বর্তমানে কোটিবর্ষে।

কোটিবর্ষে? কোটিবর্ষে কেন?

লোকে বলছে কৈবর্তদের বিরুদ্ধে দল বাঁধবার জন্য তিনি নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কথায় কথায় কৈবর্তদের কথা উঠে পড়ল। এখানকার লোকদের মধ্যে কৈবর্তদের সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা। এরা বলে, এদের মত সরল ও সৎ স্বভাবের মানুষ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এরা যে বীরের জাত সে কথা তো প্রমাণ হয়েই গেছে।

এখান থেকে দশ-এগারো ক্রোশ পথ ছাড়লে পর তবে বরেন্দ্রীর প্রত্যন্ত দেশে পৌছানো যায়। শিমুলতলী গ্রাম আর তার পাশাপাশি গ্রামগুলিতে বহু গোয়ালার বাস। এ অঞ্চলের গোয়ালারা মহিষ কিনবার জন্য বরেন্দ্রীর মহিষের হাটে যায়। ভাল জাতের মহিষ এই অঞ্চলে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আগে গৌড়ের রাজপুরুষেরা এই সব হাট থেকে কর তুলত। মহিষের ক্রেতা আর বিক্রেতা উভয় পক্ষকেই কর দিতে হোত। কিন্তু কৈবর্তেরা স্বাধীন হয়ে যাবার পর হাটের কর বলে এখন আর কিছু নেই। এখানকার গোয়ালারা এতে ভারী খুশী।

গৌড়ের হাত থেকে মুক্ত হবার ফলে বরেন্দ্রীর লোকদের এখন সব দিক দিয়েই সুবিধা হয়েছে, এখানকার লোকেরা সবাই এই কথা স্বীকার করে। আগে বরেন্দ্রীর অধিকাংশ ধান বাইরে চালান হয়ে যেত। তার ফলে প্রায়ই আকাল লাগত। কিন্তু এখন থেকে আর তা চলবে না, বরেন্দ্রীর প্রয়োজন মিটিয়ে যেটা বাড়তি থাকবে একমাত্র সেটাই চালান যাবে। এই হচ্ছে রাজা দিব্বোকের আদেশ।

সুযোগ সুবিধা নানা দিক দিয়েই বেড়েছে। সব চেয়ে বড় সুবিধা আগে প্রজাকে শস্যের ছ ভাগের এক ভাগ রাজার কর হিসেবে দিতে হোত। আর এখন তাকে কমিয়ে আট ভাগের এক ভাগ করা হয়েছে। ওখানে এত দিন ধরে যে জোর জুলুম অত্যাচার চলে আসছিল, এখন আর তার চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট নেই। মানুষ এখন বড় শান্তিতে আছে। আর রাজা দিব্বোক তো সমস্ত প্রজার বাপ মায়ের তুল্য।

এখান থেকে যারা বরেন্দ্রীর হাটে মহিষ কিনতে যায়, তারাই ফিরে এসে এখানে এ সব কথা ছড়ায়। তাদের মারফত কৈবর্তেরা এখানকার লোকদের কাছে ঘন ঘন খবর পাঠাচ্ছে, তোমরা আমাদের সংগে এসে পড়। ওদের সংগে থেকে কি লাভ ? আমাদের এখানে কর বলতে ফসলের আট ভাগের এক ভাগ এই মাত্র, এ ছাড়া আর কোন আদায় নেই। আরও দেখ, যে ফসল রাজভাণ্ডারে জমা হয়, তার সবটাই প্রজাদের ভালোর জন্য খরচ করা হয়ে থাকে। রাজা দিব্বোক তার একটা কনাও ছুয়ে দেখেন না।

এ সব কথা শুনে অভাবী লোকদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তা তো হবেই। ফসলের ছ ভাগের এক ভাগ, ছিষ্টির প্রথম থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। কত রাজা এল, আর কত রাজা গেল, কিন্তু এই নিয়ম কেউ বদলাতে পারল না। আর কৈবর্তেরা রাতারাতি সব কিছু বদলে দিল। তাদের এই নিয়ম যদি এখানেও আসে, তবে এরা খেয়ে পরে বাঁচবে। এরা তো ভালই বলছে।

কিন্তু বুড়ো মোড়লরা এতে একেবারেই নারাজ। তারা বলে, আরে ওরা আজ আছে, কাল নেই। দেখ না, আমাদের রাজারা এই এসে পড়লেন বলে। গৌড় আর ক'দিন ওদের হাতে থাকবে! কুকুরের কি আর ঠাকুর ঘরে জায়গা হয়! আমাদের রাজা তৈরী ছিলেন না, তাই না একটা অঘটন ঘটে গেল। আবার যার ধন তার হাতেই চলে যাবে। মাঝখানে, ওদের সংগে গিয়ে আমরা অনর্থক বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। ওসমস্ত কথা ভেবো না তোমরা। আর তা ছাড়া আমাদের রাজা কত বড় রাজা, সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের নাম। তাদের ছেড়ে আমরা ওই বর্বর কৈবর্তদের রাজা বলে মানব? আমাদের একটা মান মর্যাদা নেই?

এই শেষের কথাটা সবার মনেই একটু খুঁতখুঁতি জাগায়। কিন্তু মান বড় না প্রাণ বড়? আবার ওদিকে কৈবর্তেরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের গরীব রাজাই ভালো। গরীব না হলে গরীবের দুঃখের কথা কে আর বুঝবে। এ কথাটাকেও তো একেবারে মিছে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই নিয়ে এখানকার লোকের মনে নানা রকম সংশয়। কয়েক-জন হরিগুপ্তকে চেপে ধরল, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তার উপর আপনি আমাদের আপন লোক, আপনি বলুন, এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। এতক্ষণ ওদের আগ্রহ মিটাবার জন্য অনেক ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছিলেন হরিগুপ্ত। কিন্তু এই প্রশ্নটা এমন ভাবে তার উপর এসে পড়তে থমকে গেলেন। প্রজারা রাজার সংগে থাকবে না রাজদ্রোহীদের সংগে যোগ দেবে? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন তিনি? রাজার সংগে থাক—এইটাই তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর। কিন্তু রাজধানী ছাড়বার পর থেকে এই কয় মাসে এ রাজ্যের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আর আশা-আকাঙ্খার সংগে তার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে, তার ফলে সেই সহজ ও স্বাভাবিক কথাটাও মুখ

দিয়ে বেরিয়ে এল না। কিন্তু রাজদ্রোহীর সংগে যাও, এমন একটা কথাও তিনি বলে উঠতে পারলেন না।

শেষকালে অনুরূপ অবস্থায় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যা করে, তিনিও তাই করলেন—উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, সংসারের মধ্যে থাকলেও আমরা সংসারের বাইরে। এ সব কথা আমরা ভাল বুঝি না। তোমরা দশ জনে মিলে ভেবে দেখ। কোনটা তোমাদের করণীয়, তোমরাই তা স্থির কর।

তাঁর মুখ থেকে এমন একটা কথা কেউ আশা করেনি। ওরা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হোল।

সেই রাত্রিতে সবার কাছ থেকে ওরা যখন নিরালা হলেন, শংখ দেবী বললেন, ওরা ওদের জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করল, আর তুমি এমনি করে এড়িয়ে গেলে!

হরিগুপ্ত তার কথাটা বুঝতে পারলেন, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের কথা বলছ?

কিসের কথা বলছি? বুঝতে পারছ না তুমি? ওরা রাজার পক্ষে থাকবে, না কৈবর্তদের পক্ষে যাবে, ওরা তোমার মুখ থেকে এই প্রশ্নের উত্তরটাই শুনতে চাইছিল। তোমার কি এর উত্তরে কোন কিছুই বলবার মত ছিল না?

হরিগুপ্ত একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, উত্তর একটা ছিল। কিন্তু কে জানে কেন, ওদের কাছে বলে উঠতে পারলাম না। সত্য কথাটা আমার ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে গেল।

আমার কাছেও কি বলতে পার না?

হ্যাঁ, পারি। কিন্তু তোমার হয় তো ভাল লাগবে না। তবে শুনতে যখন চাইছ, তখন বলি।

এ পর্যন্ত যা কিছু দেখে এসেছি, আর এখন যে সব কথা শুনছি, তাতে মনে হয়, আমাদের সভ্য রাজাদের রাজত্বের চেয়ে বর্বর কৈবর্তদের রাজত্ব অনেক ভাল।

চৌদ্দ

এক বছর বাদে ওলান ঠাকুরের পরবের দিন আবার ঘুরে আসছে। বরেন্দ্রী আর গৌড়ের কৈবর্তেরা নেচে উঠেছে। সারা বছরে এই একটা দিন, এ দিনের সংগে আর কোন দিনের তুলনা হয় না। সেই কবে থেকে ওরা দিন গুণে গুণে আসছে! তিনশোর উপরে আরও তিন কুড়ি পাঁচ দিন, এতগুলো দিন পেরিয়ে তবে আসবে সেই পরবের দিন। ধৈর্য কি বাঁধ মানতে চায়! মাসখানেক আগে থেকেই উয্যুগ আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। ঢাকীরা আর ঢুলীরা তাদের যন্ত্রের সারাই করবার কাজে লেগে গিয়েছে। পরবের পাঁচ দিন আগে থেকেই ওরা লোকের কানে তালা ধরিয়ে ছাড়বে। ঘরে ঘরে মদের চোলাই হচ্ছে। কি পুরুষ কি মেয়ে, সবাই সাধ মিটিয়ে নাচবে, গাইবে, আর ঢোকে ঢোকে মদ গিলবে। চোখ পলাশ ফুলের মত লাল হয়ে উঠবে, গা ঝিমঝিম, পা টলমল করবে, শেষে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, ধুলোয় পড়ে লুটোপুটি খাবে। আর মনটা দেহের পিঁজরা ছেড়ে পাখীর মত আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াবে। মানুষ কি আর তখন মানুষ থাকে!

প্রতি বছর এমন দিনে পরবের নামে এমনি করে মেতে ওঠে সবাই। কিন্তু মাত্র দিন দশেক আগে সংকট দেখা দিল। ওলান ঠাকুরের পরব নিয়ে এমন সংকট আর কখনও দেখা দেয়নি। কথাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। থেমে গেল আনন্দ উৎসব, লোকের চোখে আতংকের চিহ্ন, পথে ঘাটে এ ওর সংগে কানাকানি করে।

রাজা দিব্বোক নাকি আদেশ দিয়েছেন এবার থেকে ওলান-ঠাকুরের কাছে মানুষ বলি দেওয়া চলবে না। সেই কোন যুগ যুগান্ত

ধরে এই প্রথা চলে আসছে, তার উপর হাত দিতে চায় রাজা, এতই তার দুঃসাহস। এই দিনে ওলান ঠাকুরের কাছে শুধু মানুষ বলিই যে হয় তা নয়, মহিষ, শুয়োর, ছাগল মোরগ আরও কত রকম বলি পড়ে। ওলান ঠাকুর যে বটবৃক্ষের উপর ভর করে আছেন, তার তলায় মাটি রক্তে কাদা হয়ে যাবে। কিন্তু সকল প্রাণীর সেরা প্রাণী মানুষ। সেজন্যে মানুষ বলিই শ্রেষ্ঠ বলি। আর যত কিছু বলি পড়ুক না কেন, মানুষ বলি না পড়লে ওলান ঠাকুর তৃপ্ত হন না। এ কথা কৈবর্তদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে। সেই বলি বন্ধ করতে চাইছেন রাজা। ওলান ঠাকুরের দয়াতেই কৈবর্তদের সব কিছু, তিনিই যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে আর কাউকে বাঁচতে হবে না।

প্রথমে কথাটা শুনেও লোকে বিশ্বাস করতে চায় নি। এটা কি একটা বিশ্বাস করবার মত কথা। কিন্তু মোড়লরা আর রাজপুরুষরা যখন এই নিয়ে প্রকাশ্যে বলাবলি শুরু করল, তখন বিশ্বাস না করে উপায় কি?

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কৈবর্তেরা পরবের অন্তত এক মাস আগে বরেন্দ্রীর বাইরে অন্য সমাজ থেকে বলির মানুষ চুরি করে বা মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে আসে। ওলান ঠাকুরের বিধানে এ চুরিতে কোন পাপ নেই, বরঞ্চ এটাই প্রশস্ত। তারপর বলির আগ পর্যন্ত এক মাস কাল সেই মানুষকে তারা প্রতি দিন গন্ধতেল মাখিয়ে স্নান করায়, সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ায়, পরম সমাদরে তার পরিচর্যা করে। এখানে এই রীতি আবহমান কাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে।

এবার ওরা এক কিশোর ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ক' দিন আগে সেই ছেলেটাকে স্নান করাবার জন্য পুকুরের ঘাটে নিয়ে যাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময় রাজা দিব্বোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে কি মনে হোল ছেলেটার, সে এক ঝটকায় ওদের হাত ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রাজাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

এই থেকেই সংকটের উৎপত্তি। রাজা বলে দিয়েছেন, এ রাজ্যে মানুষ বলি দেওয়া চলবে না।

ওলান ঠাকুরের পূজক যারা তারা বলছে, রাজা রাজ্যের শাসন পালনের কর্তা, সে কথা মানি আমরা, কিন্তু ওলান ঠাকুরের পূজা পরবের ব্যাপারে তাঁর কোন কথা বলবার অধিকার নেই। তা ছাড়া আর কোন দেবতা নয়, সর্ব দেবের রাজা স্বয়ং ওলান ঠাকুর। এমনিতে তিনি খুবই ভাল, যাকে প্রসন্ন হয়ে দেন, দু হাত ভরে দেন, কিন্তু একবার যদি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, তবে আর কারু রক্ষা নেই।

এ সব কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেল। সত্য কথাই তো, সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি, যার দয়ায় খেয়ে পরে বেঁচে আছি, সেই ওলান ঠাকুরের সংগে এমন ব্যবহার! ওলান ঠাকুরের চাহিদা তো বেশী নয়, বছরে মাত্র একটি করে মানুষ, সেটুকুও যোগাতে পারব না আমরা? প্রথমে কানাকানি, তার পরে দলে দলে লোক রাজা দিব্বোকের কাছে এসে ধর্ণা দিতে লাগল। তারা বলল, আপনি এমন করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। আমাদের বহু ভাগ্য আপনার মত রাজা পেয়েছি, আর তারই ফলে এত দিন বাদে একটু সুখের মুখ দেখেছি। কিন্তু ওলান ঠাকুরকে যদি এমনি করে চটিয়ে তোলেন, তবে কি আর কিছু থাকবে! সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

দিব্বোক নিজের ঘরে বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলেন। এই পরবে যোগ দেবার জন্য এখানকার সকলের অনুরোধে তাকে গৌড় থেকে কিছুটা আগেই চলে আসতে হয়েছে। গতবার এ সময়ে গৌড়ে থাকাটা তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, এখানকার লোকের মনে সেই দুঃখটা আছে। তারা বলে, তিনি না থাকলে উৎসব নাকি মোটে জমেই না। সেই জন্যই ছোট ভাই রুদোকের হাতে রাজধানীর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি বরেন্দ্রীতে চলে এসেছেন। কিন্তু আসার সংগে সংগেই অশান্তি বেঁধে উঠল। আর এই অশান্তি তাঁকেই কেন্দ্র করে। এখন কি হবে এর পরিণতি কে জানে!

এক বছর হোল তাঁদের দেশ তাঁদের হাতে চলে এসেছে। মাত্র এক বছরে এই দরিদ্র দেশের কতটুকুই বা উন্নতি করা যায়! কিছুই না। তবু লোকদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, যেন তারা কত কিছুই পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, পাবে, তারা নিশ্চয়ই পাবে। সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন তিনি দেখে এসেছেন, সে স্বপ্ন এক দিন সার্থক হয়ে উঠবেই। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে এত কাল যারা পদদলিত হয়ে এসেছে; বর্বর বলে সকলের কাছে অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলে গণ্য হয়েছে, এক দিন তারাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, এ স্বপ্ন সফল হবেই, কেননা এ তো তার একার স্বপ্নই নয়, এ যে বরেন্দ্রীর সকল মানুষের স্বপ্ন। স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে সারা দেশ জুড়ে কি এক অদ্ভুত কর্মচাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। সাধারণ মানুষগুলি কোন্ মন্ত্রের জোরে এমন নূতন মানুষ হয়ে উঠল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, আর অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে এসেছেন। তখন মনে হয়েছে, কে এদের ঠেকিয়ে রাখবে।

মাঝে মাঝে নানা সূত্রে সংবাদ আসে শত্রুপক্ষ গৌড় পুনর্দখল করবার জন্য তাদের শক্তি সমাবেশ করছে। এমনও সংবাদ এসেছে, ওরা যে কোন সময় অতর্কিত এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তিনি গৌড় আর বরেন্দ্রীর প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে লোকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। ওরা বিন্দু মাত্র ভয় পায় নি। সতেজ কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে, আপনি সামনে থাকলে আমরা কাউকে ভয় করি না। আর তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছেন আর আমি তোমাদের মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন আমার মনেও কোন ভয় থাকে না। ওরা শুনে হেসেছে। কিন্তু তিনি ভাল করেই জানেন, এ হাসির কথা নয়, গাছ যেমন করে আকাশ থেকে আলোক পান করে সতেজ হয়ে ওঠে, তিনিও তেমনি এদের মুখের দিকে তাকিয়ে নূতন শক্তি আহরণ করেন।

কিন্তু এ হোল এক দিক। এর বিপরীত দিকও আছে। মাঝে

মাঝে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে, যা মনকে বড় পীড়িত করে তোলে, কেমন একটা অনির্দিষ্ট আশংকা ঘিরে ধরতে চায়। মনে পড়ে, গৌড় বিজয়ের পর নগরীর ভাল ভাল বাড়ীগুলিকে দখল করে বসবার জন্য বরেন্দ্রীর বিশিষ্ট কৈবর্ত দলপতিদের পরস্পরের মধ্যে সে কি প্রতিযোগিতা! তাদের সামলাতে কম বেগ পেতে হয় নি সেদিন। আর তার জের যে পুরোপুরি কেটে গেছে তাও নয়।

সে সময় নগরীর বড় ছোট প্রতিটি গৃহ লুণ্ঠিত হয়েছিল। আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য সাধারণের সম্পত্তি, সাধারণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হবে। এতএব যে যা পায় সবাই যেন রাজ-ভাণ্ডারে জমা দেয়। অনেকে জমা দিয়েছিল, কিন্তু সবাই দেয় নি।

সবাই যে দেয় নি, সেই সত্যটা জানা গেল যখন তিনজন লোক লুণ্ঠিত মাল নিয়ে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ল। পরভু ক্ষিপ্ত হয়ে তিনজনকে ঘটাস্থলেই হত্যা করল। কথাটা পরে দিব্বোকের কানে এসেছিল। শোনার পর তিনি মনে মনে বলেছিলেন, অপরাধীর দণ্ডবিধান তো হোল। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে নূতন সমস্যা দেখা দিল, তার সমাধান কোথায়? আমরা তো কেউ এজন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

কৈবর্তদের মধ্যে এ রোগ কোন দিন ছিল না। এ রোগ গৌড়ের সভ্য জাতির রোগ এই কথাই তাঁরা জেনে এসেছেন। তবে কি ধন সম্পদ এই রোগকে তার সাথী করে নিয়ে আসে?

এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে ঐশ্বর্যময়ী গৌড় নগরীর অধিকারী কৈবর্তদের ভবিষ্যৎটাই বা কি? যে সব কৈবর্তেরা গ্রাম ছেড়ে নগরে চলে এসেছে, তাদের স্বভাব আর চালচলন বড় বেশী দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে।

গ্রামের মানুষ নগরবাসী হয়েছে, স্বভাবের পরিবর্তন হবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরিবর্তনের রকমটা তাঁর কাছে স্বাস্থ্যকর বলে মনে হচ্ছে না।

লোকে বলে, বর্বর কৈবর্ত। মুখের সামনে নাই বলুক, কৈবর্তদের সম্পর্কে অসাক্ষাতে অনেকেই এই কথা বলে। এই কথাটা মনে হলে তাঁর গায়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়ে যায়। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে কথাটা কি একেবারেই অমূলক? মূর্খ অশিক্ষিত লোক, আর বর্বরের মধ্যে তফাৎটা কি? কৈবর্ত সমাজে লেখাপড়ার চর্চা কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। আর তা নিয়ে কারু মাথা ব্যথাও নাই। এ নিয়ে কয়েকজন মোড়লের সংগেই আলাপ করে দেখেছেন তিনি। কেউ যেন কথাটা গায়ে মাখতে চায় না। তার পরেও যদি জোর করে কথাটা চালিয়ে যাওয়া যায়, তখন তারা ঘন ঘন হাই তুলতে থাকে। আর সরে পড়বার জন্য ছুতো খোঁজে।

আবার কেউ কেউ সোজা আপত্তি জানিয়েই বসে। বলে, দরকার নাই বাপু বেশী লেখাপড়া শিখে। এমনিতেই ভাল আছি। লেখাপড়া শিখলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ওই পুঁথিগুলির পাতায় পাতায় যত রাজ্যের দুষ্ট বুদ্ধি আর বজ্জাতির বীজ রয়েছে। গৌড়ের মানুষগুলো এত কুবুদ্ধি কোথা থেকে যোগাড় করত? ওদের ওই পুঁথি-গুলো থেকেই তো। তুমি কি আমাদের ছেলেগুলোকে ওদের মত করে তুলতে চাও নাকি? দিব্বোক অনেক চেষ্টা করেও ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। এদের আর সব কাজেই উৎসাহ আছে এই একটা কাজ ছাড়া। এমন একটা মানুষ নাই যার সংগে এই নিয়ে মন খুলে আলাপ করতে পারেন, বুদ্ধি পরামর্শ করতে পারেন বা কোন কাজের ভার দিতে পারেন। ঠিক এই রকম সময়ই মনে পড়ে যায় পদ্মনাভের কথা। গৌড়ের অনেক লোকের সংগেই তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু এমন একটা মানুষ কোন দিন তাঁর চোখে পড়েনি। মাত্র তিনটি দিনের পরিচয়। এই তিন দিন তারা বসে বসে কত কল্পনাই না করেছিলেন। পদ্মনাভ বলেছিলেন, আমি আমার নিজের জায়গা ছেড়ে এইখানে এসেই সংসার পেতে বসব।

কৈবর্তদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারই হবে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, দিব্বোক সেদিন তার কথাগুলি বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কি হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, তাদের হাতেই পদ্মানাভের মৃত্যু ঘটল। তাঁর সেই চিঠিটা তিনি এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। চিঠিঠা পড়লে মনে হয় মানুষটির মন যেন সেই রকমই ছিল। নাঃ, এমন একটা মানুষ তিনি আর কোন দিন দেখেন নি।

একটা কথা নিয়ে ভাবতে বসলে কত দিক থেকে কত কথাই না ভেসে আসে। কৈবর্তদের কথা ভাবতে ভাবতে পদ্মনাভের কথায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু হঠাৎ চমক ভাংগল তাঁর। এ সমস্ত কি কথা নিয়ে এখন ভাবতে বসেছেন তিনি! তিনি কত বড় এক সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, এ কথা কেমন করে ভুলে গিয়েছিলেন! ছেলেটাকে সেদিন আশ্বাস দিয়ে এসেছেন, কোন ভয় নাই তোমার। আমি কথা দিচ্ছি, কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। কিন্তু তাঁর সেই আশ্বাস এখন বৃন্তলগ্ন শুকনো পাতার মতই কাঁপছে? এখন দেখছেন এ বিষয়ে সবাই তাঁর বিপক্ষে। এ অবস্থায় কেমন করে তিনি ওকে বাঁচাবেন!

সবার মুখেই এক কথা—এমন সর্বনাশ করবেন না। ওলান ঠাকুর চিরকাল এই বলি পেয়ে আসছেন! কোন দিন নিয়মের নড় চড় হয় নি। আর আজ যদি সেই নিয়ম ভাংগে তবে কি যে মহাবিপদ ঘটবে সে কথা কি কেউ বলতে পারে!

বলে বলে হার মেনে গিয়েছেন তিনি, কিন্তু ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। কোথাকার কোন্ দূরের, কোন্ সমাজের, কাদের এক ছেলে তার জন্য এত কিসের টান। ও আমাদের কে যে, ওর কথা মনে করে সমস্ত কৈবর্ত সমাজের উপর এমন বিপদ টেনে আনতে হবে? সকল ব্যাপারে এমন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ রাজা, কিন্তু এমন বুদ্ধিভ্রংশ তাঁর কেমন করে ঘটল, সব মানুষ এই কথাই বলে।

দিব্বোকের কথাটা মনের সংগে মেনে নিয়েছে শুধু কয়েকটা

ছেলে—কয়েকটা কাঁচা বয়সের ছেলে। কিন্তু ওদের কথায় কি আসে যায়, ওদের কথার দাম দেয় কে !

ওদের মধ্যে দুজন কাল এসেছিল। ওরা চুপি চুপি বলল, আপনি বলুন, আমরা ওদের হাত থেকে ছেলেটাকে চুরি করে কোথাও সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু ওদের কথায় সায় দিতে পারেন নি তিনি। বলে দিয়েছেন, না না, এমন কাজ করতে যেওনা, এতে অশান্তি আরও বাড়বে।

বরেন্দ্রীর সমস্ত কৈবর্ত সমাজ দিব্বোকের যে কোন আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এইটাই তারা অনুভব করেছে যে এই একটা মানুষ যার কথার উপর তারা নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারে, এই একটা মানুষ যার কোন কথা কখনও ভুল হয় না। আজ দিব্বোক ওদের কাছে শুধু রাজা নয়, দেবতা হয়ে উঠেছেন। দিব্বোকের নিজের কাছেও এ কথা অজানা নয়। সেই জন্যই সেই ছেলেটাকে যখন প্রাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন ভাবতে পারেন নি যে তাকে এত বড় বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়াতে হবে। কেমন করে বুঝবেন ? ওলান ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আর তো কখনও দাঁড়াতে হয়নি।

ব্যাপারটা কতদূর গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে, কালই তা প্রথম ভাল করে বুঝলেন। গৌড় থেকে রুদোক এই খবর জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোড়-সওয়ার মারফৎ চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে. কথাটা শোনার পর থেকে আমাদের মনে একটু শান্তি নেই। খবরটা আসার সংগে সংগেই সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এখানকার রাজপুরুষ আর সৈন্যদের মধ্যে এই নিয়ে খুবই অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বাইরে শত্রুপক্ষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই খবর নানা সূত্রে আমাদের কাছে আসছে। এ সময় ওলান ঠাকুরের বলির বিষয়টা নিয়ে যদি আত্মকলহ বেঁধে ওঠে তবে পরিণাম খুবই ভয়ের। সে জন্য এখানকার সকলের পক্ষ হয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা

জানাচ্ছি, সমাজের সকলের মনের কথা বিবেচনা করে আপনার এই আদেশ তুলে নিন, মানুষ হয়ে দেবতার সংগে বাদ সাধতে যাবেন না। আমার এখন এখান থেকে নড়বার উপায় নেই, নয় তো নিজেই ছুটে যেতাম।

এরই মধ্যে কথাটা গৌড়ে গিয়ে পৌঁছেচে। বরেন্দ্রী আর গৌড়ের ব্যবধান তো কম নয়। এই ক' দিনের মধ্যে কারু পক্ষে সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। খবরটা এখান থেকে ঘোড়-সওয়ার মারফৎ পাঠানো হয়েছে, এটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। তার চোখের আড়ালে এই সব চলেছে। আরও কত কিছু চলেছে, তাইবা কে জানে। পরিস্থিতি গুরুতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সারা দেশের মানুষ বলছে—তোমার এই আদেশ ফিরিয়ে নাও। আর তিনি তাদের সকলের ইচ্ছার উপরে নিজের ইচ্ছাটাকেই বজায় রেখে চলবেন ? এ তো কৈবর্ত সমাজের নিয়ম নয়। সমাজ একজনের কথায় নয়, দশজনের কথায় চলে।

কিন্তু এ আদেশ কেমন করে তিনি ফিরিয়ে নেবেন ? দেবতার সামনে নরবলি, এ যে সত্যসত্যই বীভৎস, এর নামই তো বর্বরতা। এক কালে এই প্রথা নাকি অনেক দেশেই ছিল, কিন্তু এখন লোপ পেতে পেতে মাত্র কয়েকটা জায়গায় ঠেকে আছে। প্রতিবেশী কোচেরা পর্যন্ত এই নিয়ে কৈবর্তদের নিন্দা করে বেড়ায়। কেন করবে না ? করবেই তো। শুধু আজ নয়, বহু দিন থেকে এই প্রশ্ন তার মনকে পীড়া দিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুটা নিজের মনের প্রাচীন সংস্কারের জন্য আর তার চেয়েও বেশী আর সকলের মনের কথাটা ভেবে বলি বলি করেও বলে উঠতে পারেন নি। কিন্তু সেদিন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে মনের কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেছে। তিনি নন, তার চেয়েও বড় কে যেন একজন তার ভিতর থেকে এই আদেশ ঘোষণা করল।

সেই অসহায় আর নিষ্পাপ ছেলেটির ভয়াতুর দৃষ্টি তার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। তিনি তাকে অভয় দিয়েছিলেন, ভয় নেই তোমার, আমি তোমাকে বাঁচাব। তাঁর মুখের এই কথাটা শুনে ওর চোখ দুটি আশার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই প্রতিশ্রুতি কেমন করে ভংগ করবেন তিনি ? ও যে তাঁর সেই মুখের কথাটাকে আঁকড়ে ধরে এখনও আশায় আশায় দিন গুণছে।

সবাই সমস্বরে বলছে, তোমার এই আদেশ ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। কিন্তু মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, কিছুতেই মেনে নিতে চায় না।

হায় ভগবান, তার আর তার সমাজের মানুষের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান কেমন করে সৃষ্টি হয়ে গেল ? এ যে কল্পনাতীত।

সেবার কাঁধের উপর যেখানে তীরটা বিদ্ধ হয়েছিল, হঠাৎ সেই জায়গাটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। সেই জায়গাটা নয়, তার গভীর তলদেশ থেকে তীব্র বেদনা দমকে উঠে আসছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মুচড়ে উঠল। ক্ষতস্থানটা শুকিয়েও শুকায় না। ওষুধ প্রলেপের ফলে মাঝে মাঝে চাপা থাকে, আবার কখনও কখনও তার মুখ থেকে পুঁয গড়িয়ে পড়ে। আর এই বেদনাটা এমনি করেই মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কখন যে উঠবে আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

দিব্বোক বসেছিলেন, শুয়ে পড়লেন। একটু বাদেই কে একজন তাঁর পাশে এসে বসল, আর তাঁর মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার হাত থেকে যেন মমতা ঝরে পড়ছিল। দিব্বোক চোখ বুজেছিলেন, বুজেই রইলেন। চোখ না খুলেও বুঝলেন এ কে।

তোমার সেই ব্যথাটা আবার উঠল বুঝি ? নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করল উনছলি।

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে ?

উনছলি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে চললেন।

হাতের গুণেই হোক বা আপনা থেকেই হোক, ব্যথাটা কমে আসতে লাগল।

কেন এমন করে কষ্ট পাচ্ছ? তার চেয়ে ওরা যা চাইছে তাই করুক না। বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হবে না।

দিব্বোক বুঝলেন, তাঁর মনের ছবিটা উনছলির চোখে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা কথাও তো তিনি ওর কাছে বলেন নি। যতক্ষণ ঘরে থাকেন, মনের আগুন মনের মধ্যেই চেপে রাখেন। কিন্তু আশ্চর্য, ও কেমন করে যেন সব কিছু টের পেয়ে যায়। শুধু আজকার কথাই নয়, চিরদিনই এমনি দেখে আসছেন।

ওই কথাটা নিয়েই যে মনোকষ্ট পাচ্ছি, এমন কথা ভাবছ কেন উনছলি? রাজ্য শাসনের বোঝা যার মাথার উপর তাকে তো কত কিছু নিয়েই চিন্তা ভাবনা করতে হয়!

আমাকে ভুল বুঝিয়ে কি হবে? উনছলি বললেন, কাল রাত্রি-বেলা তুমি খেতে বসে আধপেট খেয়েই উঠে পড়লে, সারা রাত একটু ঘুমোলে না, শুধু এপাশ ওপাশ করলে। আর আজ কোন কাজেই মন নাই তোমার, সকাল থেকে চুপ করে বসে আছ—এ সব কি আমি দেখি না? তুমি যতক্ষণ কাজ নিয়ে থাক আমি নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু যখন তোমার কাজে মন বসে না, তখন বড় ভয় হয় আমার, মনে হয়, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। যেদিন থেকে পুকুর-ঘাটে সেই ছেলেটাকে নিয়ে—বলেই একটু থামলেন উনছলি। তারপর বললেন, তখন থেকেই তোমার এই অবস্থা শুরু হয়েছে। বল, সত্যি করে বল, ঠিক বলছি কিনা।

দিব্বোক এ কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না, বললেন, উনছলি এ অবস্থায় তুমি কি করতে বল আমাকে? তুমি ঠিকই বলেছ, সত্যিই কষ্ট পাচ্ছি আমি।

দিব্বোক এ পর্যন্ত রাজকার্যের ব্যাপারে কোন দিনই উনছলির পরামর্শ চাননি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আজ যেন একমাত্র উনছলি ছাড়া আর কোন অবলম্বনই তাঁর নেই। আর কার কাছেই বা এ নিয়ে কথা বলতে পারেন! উনছলির মনের কথাটা কি, সে কথা জানা নেই, কিন্তু যাই থাক, তার দুঃখটা সে দরদ দিয়ে বুঝবে।

উনছলি উত্তর দিল, কিন্তু এ তো নূতন কিছু নয়, চিরকাল চলে আসছে। কই, তুমিও তো কোন দিন কিছু বলনি, এবারই বা এমন করছ কেন? সবাই তো এই কথাই বলছে।

চিরকাল চলে এসেছে, তাই বলে চলতেই থাকবে? কাজটা যদি খারাপ হয় তবুও?

তুমি বলছ খারাপ, কিন্তু কই আর কেউ তো তা বলছে না। দশের মুখেই ভাল, আর দশের মুখেই খারাপ। সেই জন্যই তো বলে দশের কথায় মরাও ভাল।

তার মানে এই বাচ্চা ছেলেটাকে মেরেই ফেলুক ওরা, এই কথাই তো বলতে চাইছ? কিন্তু এ যদি তোমার নিজের ছেলে হোত, এমন একটা কথা বলতে পারতে তুমি? এওতো এর বাপমায়েরই ছেলে!

কথাটা ফস্ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। উনছলি প্রথমে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নিঃসন্তান উনছলির যেখানে সব চেয়ে বড় ব্যথা, স্বামী হয়েও দিব্বোক সেই জায়গাটাতেই আঘাত করলেন। ভিতর থেকে হু হু করে কান্না ঠেলে উঠতে লাগল তাঁর। উনছলি চেষ্টা করেও আপনাকে সামলাতে পারলেন না, মুখে কাপড় দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

কথাটা বেরিয়ে যেতেই হুঁশ এসে গিয়েছিল দিব্বোকের। উনছলিকে কেঁদে উঠতে দেখেই তিনি উঠে বসে ওর মাথাটা নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, আমাকে মাপ কর, মাপ কর উনছলি। আমি কোন কিছু মনে করে কথাটা বলিনি। হঠাৎ কেমন করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

উনছলি তার কান্নাটা চেপে বিকৃত কণ্ঠে বলল, শোও, শুয়ে পড় তুমি। আজ আর কোথাও বেরোতে পারবে না। বলে জোর করে তাকে শুইয়ে দিল।

দিব্বোক একটু অনুনয়ের সুরে বলল, ব্যথাটা তো কমেই গেছে।

না কমে নি, বলে উনছলি আগেকার মতই তার মাথায় হাত বুলিয়ে চললেন।

দিব্বোকের মনে হোল ওর হাতটা যেন একটু কাঁপছে।

উনছলি ঠিকই বলেছিল, ব্যথাটা মাঝখানে একটু কমেছিল বটে, কিন্তু আবার সেটা ফিরে এসেছে। দিব্বোক আপনাকে সম্পূর্ণভাবে তার হাতে ছেড়ে দিলেন।

ব্যথাটা এই রকমই। কখন উঠবে, কখন নামবে, কিছুই বলা যায় না।

বরেন্দ্রীর লক্ষ্মণদাস কৈবর্তদের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন চিকিৎসক। সারা বরেন্দ্রী জুড়ে তাঁর নাম ডাক। লোকে বলে লক্ষ্মণদাস রোগীর গায়ে হাত দিয়ে তার বিশ বছর আগেকার রোগের খবর বলে দিতে পারেন। তিনি এক দিন মুখখানা গম্ভীর করে বলেছিলেন, এই রোগের লক্ষণটা বড় বেশী ভাল ঠেকছে না আমার কাছে। ক্রমেই যেন ভিতরে, আরও ভিতরে চলে যাচ্ছে। কে জানে হয় তো এই রোগেই এক দিন—

কথাটা আর কেউ জানে না। লক্ষ্মণদাস উনছলির কাছে চুপি চুপি এই কথাটা বলেছিলেন। আরও সাবধান করে দিয়েছিলেন, রোগীর মনটা যাতে ভাল থাকে, সেদিকে যেন সব সময় দৃষ্টি রাখে, কোন রকম দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ যেন তাকে পেয়ে না বসে।

লক্ষ্মণদাস তো বলেই খালাস। কিন্তু দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ দিব্বোকের সব সময়কার সাথী। উনছলি তাকে তা থেকে কেমন করে রক্ষা করবেন? কোলের ছেলে হলে না হয় সামলে রাখতে পারতেন। কিন্তু এ যে রাজা, সারা দেশের মানুষ তাঁর মুখের দিকে

তাকিয়ে আছে। উনছলির মত সামান্য মেয়ে কি কথা বলবে তাঁকে ? আর বললেই সে কি তা শুনবে !

কিন্তু লক্ষ্মণদাসের সেই সতর্কবাণী যখনই মনে পড়ে, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে উনছলির। মনের এই বোঝাটা একাই তাকে বহন করে চলতে হয়।

দিব্বোকের ওই কথাটার ফলে যে অস্বস্তিকর ও আড়ষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, একটু একটু করে তা স্বাভাবিক হয়ে এল। আবার তারা ফিরে এলেন আগেকার কথায়।

উনছলি বলছিল, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, আমি তার কতটুকু বুঝি, কিইবা বলব। কিন্তু একটা কথা জেনো, শেষ পর্যন্ত তোমার এই কথা কেউ মানতে চাইবে না। দেবতাকে কে না ভয় করে। বিশেষ করে ওলান ঠাকুরের মত জাগ্রত দেবতা।

মানতে চাইবে না ? নাই বা মানল। ওরা আমাকে মুক্তি দিক, তার পরে ওদের প্রাণ যা চায়, ওরা তাই করুক। আমার আর ভাল লাগছে না। চাইনা আমি রাজত্ব করতে।

কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন উনছলি। বললেন, তুমি বলছ কি ? সারা দেশের মানুষ তোমার উপর নির্ভর করে আছে, আর তুমি রাগ করে এই দুঃসময়ে ওদের ছেড়ে চলে যাবে ? তোমার মুখেই তো শুনেছি, বড় কঠিন দিন আসছে সামনে। শত্রুরা দল বেঁধে তৈরী হচ্ছে, যে কোন সময় এসে হানা দিতে পারে। আর এবার যখন আসবে, দলে বলে ভারী হয়েই আসবে। বলনি তুমি ?

হ্যাঁ বলেছি। দিব্বোক উত্তর দিলেন, কথাটা তো মিথ্যে নয়। ওরা আসবেই। ওদের সমস্ত শক্তি নিয়েই আসবে। গৌড় থেকে রুদোকও সেই রকম কথাই জানিয়েছে।

আর সে সময় কৈবর্তদের রাজা যদি তাদের সামনে না থাকে, তবে কি হবে তাদের দশা, সে কথাটা ভেবে দেখেছ ?

দিব্বোক নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তাঁর থাকা আর না থাকার

মধ্যে প্রভেদটা যে কত সে কথা তাঁর কাছে অজানা নয়। তাঁকে অবলম্বন করে যে বিরাট একতা গড়ে উঠেছে, এই মুহূর্তে তিনি সরে গেলে তা ধুলিসাৎ হয়ে পড়ে যেতে পারে, এ আশংকা অমূলক নয়। এমন কোন দ্বিতীয় লোক নেই, যার উপর সমস্ত দেশের মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারে।

দিব্বোককে চুপ করে থাকতে দেখে উনছলি আবার বললেন, ওলান ঠাকুর না করুন কিন্তু ওরা যদি আবার আমাদের এই দেশ দখল করে নিতে পারে, তখন কেউ কি আর বাঁচাবে? সারা দেশময় ওরা রক্তের নদী বইয়ে দেবে না? এত দিন এত দুঃখ এত কষ্ট করে আমরা যেটুকু পেয়েছি, তার সব কিছুই ধুলো-ধুলো হয়ে যাবে। এই একটা ছেলের জন্য তুমি ভেবে মরছ, আর তোমার সারা সমাজের মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, সেটা তোমার সইবে?

দিব্বোক এবারও কোন কথা বললেন না। বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উনছলির মুখের দিকে।

উনছলি যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। বলে চললেন, যখন প্রথম তোমার ঘরে এলাম, তুমি এক দিন কথায় কথায় বলেছিলে, আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি আমার সমাজের লোকদের। সে দিন কথাটা শুনে আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার চেয়েও? তুমি সোজা উত্তর দিয়ে দিলে, হ্যাঁ। তোমার কথা শুনে আমার তখন বড় কান্না পেয়েছিল। সে কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই, কিন্তু আমি ভুলিনি।

দিব্বোক ভেবে দেখলেন সত্যিই মনে নেই তাঁর। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে উনছলির সংগে কত দিন কত কথাই তো হয়েছে, তার ক'টা কথাই বা মনে আছে!

কিন্তু এটা প্রথম সময়কার কথা। পরে এ নিয়ে আমার মনে কোন দুঃখ ছিল না। তোমার কথা শুনে শুনে আর তোমার কাজ দেখে দেখে আমিও কেমন যেন বদলে গেলাম। তখন মনে হোল,

এটাই তো ঠিক কথা। সমাজের সমস্ত মানুষের চেয়ে কি আর আমি বড় হতে পারি? কিন্তু দিব্বোক—

দিব্বোক চমকে উঠলেন। তাঁর কানে যেন মধু ঝরে পড়ল। বিয়ের আগে উনছলি তাঁকে এমনি করে নাম ধরে ডাকত, বিয়ের পর থেকে আর সে নামে ডাকে না। কেন ডাকে না? এতদিন বাদে আজ এই প্রশ্নটা প্রথম তাঁর মনে জাগল।

কিন্তু দিব্বোক, আজ তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে বলে দিলে, এই বিপদের মুখে সেই সমাজের লোকদের তুমি ছেড়ে চলে যাবে। আর তা একটা মাত্র ছেলের প্রাণের জন্য!

উনছলি কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতটা দিব্বোকের মাথার চুলগুলি নিয়ে খেলা করে চলেছিল। দিব্বোক তাঁর সেই হাতটা তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি যে এ সব কথা নিয়ে এমন করে ভাব, আমি তো কখনও তা ভাবতে পারিনি উনছলি।

উনছলি উত্তর দিলেন, কেন ভাবব না, আমি যে তোমারই ছায়ায় ছায়ান বেড়ে উঠেছি।

এর পর দুজনেই কতক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে রইলেন।

একটু পরে দিব্বোক জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে উনছলি!

ঘুমাও। কাল সারারাত একটুও তো ঘুমাও নি!

উনছলি তার বন্দী হাতটাকে টেনে নিতে চাইল, কিন্তু পারল না, দিব্বোক শক্ত করে চেপে ধরে আছেন।

তারপর দিন খবর ছড়িয়ে পড়ল, রাজা তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নিয়েছেন, অন্যান্য বারের মত এবারও নরবলি হবে। মানুষগুলি এ কয়দিন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, খবরটা পাবার সংগে সংগেই চাংগা হয়ে উঠল সবাই। ওলান ঠাকুরের কৃপায় রাজার সুমতি হয়েছে। জয়, ওলান ঠাকুরের জয়! বরেন্দ্রীতে আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল।

পর দিন সকাল বেলা অনেক লোক এসে জড় হয়েছিল, ওরা রাজাকে সামনে নিয়ে মিছিল করে ওলান ঠাকুরের বটতলায় যাবে। কিন্তু একটু বাদেই ভিতর থেকে খবর এল, রাজা কালই গৌড়ে চলে গেছেন। এমন একটা কথা কেউ ভাবতেও তো পারেনি। এ কেমন হোল! লোকগুলি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পনেরো

ওরা পায়ে পায়ে বহু তীর্থ ভ্রমণ করে এল। এ দেশে কত তীর্থ আর কত রকমের দেব দেবী! দেব দেবীরা জাতে কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ জৈন, আবার এমন অনেকে আছেন—তাদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—যাদের জাতের ঠিকানা খুজে পাওয়া ভার। তাদের মধ্যে কেউ বনবিহারী, কেউ বৃক্ষ বিশেষে অধিষ্ঠান করেন, কেউ গহ্বরে, কেউ বা বিশেষ কোন প্রস্তরখণ্ডে—এই ভাবে জলে স্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। তারা প্রকৃতির মতই খেয়ালী—তাদের এক হাতে সৃষ্টি, অপর হাতে ধ্বংসের খেলা। তারা প্রসন্ন হলে প্রাচুর্যে ভাসিয়ে দেন, আবার ক্রুদ্ধ হলে সর্বনাশ বর্ষণ করেন। মানুষ এদের কথা স্মরণ করে ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করে।

এই বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর কোন জাত বিচার নাই। এরা সব তীর্থে গিয়েই মাথা নোয়ালেন, সবাইকেই পূজা দিলেন, তীর্থে তীর্থে বিচরণ করে সব ধর্মের, সব বর্ণের, আর সব জাতের মানুষের সংগেই মেলা মেশা করলেন, ক্ষণিকের এই আনন্দ মেলায় তাদের হাসি কান্নার ভাগ নিলেন।

এক দিন শংখদেবী বলেছিলেন, শোন হরিগুপ্ত আমি একটা কথা ভাবছিলাম। আমরা তো নির্বিচারে সব দেবতাকেই পূজো দিয়ে চলেছি। কিন্তু এর ফলে তাঁরা আমাদের উপর তুষ্ট হচ্ছেন না রুষ্ট হচ্ছেন? আমরা ভাল মানুষ, সবাইকেই সম দৃষ্টিতে দেখছি কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে রেশারেশি আর প্রতিযোগিতার অন্ত নেই। এক জাতের মানুষ আর এক জাতের মানুষকে যতটা সহ্য

করতে পারে, এরা তাও পারে না। এ বিষয়ে এরা আমাদের সভ্য জাতগুলির চেয়েও অসহিষ্ণু আর বর্বর।

দেবতাদের সম্পর্কে শংখদেবী সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ। হিন্দুই হোক বা বৌদ্ধই হোক বা যে কোন ধর্মের দেবতাই হোক, তাদের নিয়ে তিনি সব সময়ই লঘুচিত্ততার সংগে কথা বলে থাকেন। সুযোগ পেলে খোঁচা মারতে ছাড়েন না। হরিগুপ্ত গোড়া থেকেই এটা লক্ষ্য করে আসছেন। শংখ দেবী একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, তার সেই শিক্ষাদাতা পিতৃব্য তাঁর কৈশোরের নরম মনে এর বীজ বুনে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম এ ধরনের কথা শুনে হরিগুপ্তের কেমন একটু অস্বস্তি লাগত। অবাক হয়ে ভাবতেন, ওর কি কিছুই মুখে বাধে না! কিন্তু পরে শুনে শুনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তখন তার নিজের মুখও এ বিষয়ে কিছুটা অসংলগ্ন হয়ে এসেছে, আপনার অজান্তে তিনিও মাঝে মাঝে এই সব অসংগত আলোচনায় যোগ দিয়ে বসেন। কিন্তু কিছু দিন থেকে শংখ দেবীর স্বভাবের মধ্যে একটা নুতন রূপ ফুটে উঠেছে, যেটা আগে ছিল না।

হরিগুপ্ত মৃদু হেসে বললেন আমাদের সভ্য জাতিগুলি সম্পর্কে সম্প্রতি তুমি কিছুটা প্রখর হয়ে উঠেছ দেখতে পাচ্ছি। অসহিষ্ণু কথাটা না হয় নাই ধরলাম, কিন্তু তাই বলে বর্বর? সভ্য আর বর্বর এই দুটো কথা কি পরস্পর বিরোধী নয়?

এই সংসারটাই তো পরস্পর বিরোধী, উত্তর দিলেন শংখদেবী, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ আর পাপ পুণ্যের বিচিত্র সমাবেশ এই সংসারে, এ কথাটা কি অস্বীকার করতে পার? আমার পিতৃব্য এক দিন বলেছিলেন, আমাদের এই বর্বর সভ্যতা! কথাটা কেমন করে মনে রয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথাটার মর্ম গ্রহণ করবার মত শক্তি আমার ছিল না। অবশেষে তোমার দয়াতেই এই কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

১৮—

হরিগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার দয়ায় ? তার মানে ? আমি কি করলাম ?

তুমি কি করেছ, শুনবে হরিগুপ্ত ? রাজপ্রাসাদের বন্দিনী আমি সমস্ত জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধ হয়ে ছিলাম। তোমার দয়ায় এই পৃথিবীকে দেখছি, আর দেখছি এই পৃথিবীর সত্যিকার মানুষদের।

সত্যিকার মানুষদের ?

হ্যাঁ, সত্যিকার মানুষদের যারা এই মাটির সন্তান। আমার মনের মধ্যে কিসের খেলা চলছে, তার সব কথা আজ তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। এত দিন আমার শূন্য প্রাণকে কতগুলো আবর্জনা দিয়ে ভরে রেখেছিলাম। তোমাকে পেয়ে সেই আবর্জনা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি, আর দিন দিনই ভরে উঠছে আমার মন। তোমাকে পেয়ে আমি পেয়েছি এই অনন্ত নীল আকাশকে যেখানে ঘর ছাড়া পাখীরা উড়ে বেড়ায়, পেয়েছি চোখ-জুড়ানো মন-জুড়ানো এই শ্যামলা পৃথিবীকে, পেয়েছি অন্তহীন চলার পথকে আর পেয়েছি এই মাটির সন্তান সরল সহজ মানুষগুলিকে। এরা সবাই মিলে আমার চোখের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে। আর সেই দৃষ্টি দিয়েই গৌড়ের নগর সভ্যতার সত্যিকার রূপটা আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। হরিগুপ্ত, আমার কথা বুঝতে পারছ তো ?

কিছু কিছু পারছি, সবটা নয়। মনে আছে বহুদিন আগে, পদ্মনাভের মুখে ঠিক এই রকমই একটা কথা শুনেছিলাম।

পদ্মনাভ, কে পদ্মনাভ ? মহাসন্ধিবিগ্রহিক ? তিনি বলেছিলেন একথা বল কি তুমি ?

হ্যাঁ আমার বেশ মনে আছে। তিনি মাঝে মাঝে এমনি এক একটা বিচিত্র কথা বলতেন। কিন্তু আমরা সেই কথাটার অর্থ সেদিন বুঝতে পারি নি।

এখন কোথায় তিনি ? শংখদেবী প্রশ্ন করলেন।

কোথায় তিনি ? সে কথা কে বলবে ? এই যুদ্ধের ফলে কে কোথায় ভেসে গেছে, তার ঠিক আছে কিছু, বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, তাই বা কে জানে !

ঘুরতে ঘুরতে ওরা বৌদ্ধ গয়ায় এসে পড়লেন। এখানে এসে নতুন খবর শুনতে পেলেন ওরা। পক্ষকাল আগে রাজা রামপালদেব সদলবলে এখানে এসেছিলেন।

রাজা রামপাল দেব ! শূরপালদেবের কি হয়েছে ? ওরা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

শূর পালদেব সম্পর্কে নানা জনে নানা রকম কথা বলছে। কেউ বলেন, তিনি নাকি শিকার করতে গিয়েছিলেন। শিকারের পিছন পিছন ধাওয়া করতে গিয় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারপর থেকে আর তার সংবাদ পাওয়া যায়নি। কেউ বলেন, তা নয়, শুনেছি তিনি সংসার বিরাগী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কে জানে হয়তো বা রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মতই একদিন বুদ্ধ হয়ে ফিরে আসবেন। এ ছাড়া আরও এক রকম কথা শোনা গেল। কয়েকদিন হয় রাজধানী থেকে কে একজন লোক এসেছে। সে এসে বলেছে, রাজধানীর মধ্যে নাকি কানাকানি চলেছে যে শূরপাল দেবের এ ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার পিছনে রামপালদেবের হাত আছে। অবশ্য অধিকাংশ লোকই এ কথা বিশ্বাস করে না। তারা বলে রামপালদেবের মত লোকের পক্ষে এ কাজ কখনোই সম্ভব নয় !

শংখ দেবী হরিগুপ্তকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

শূরপাল আর রামপাল এই দুজনকে এই সিংহাসনে ধরবে না। দু' জনের এক জনকে এই সংসার থেকে সরে পড়তেই হবে।

হরিগুপ্ত আঁতকে উঠে বললেন, ছি ছি, এসব কি বলছ শংখ ! এ তোমার খুবই অন্যায়। নিজের ছেলের সম্পর্কে এমন করে কথা বলছ !

শংখ দেবী বললেন, মা বলেই তো ভিতরের অনেক খবর আমার জানা আছে। তা ছাড়া আমি তো সাধারণ মা নই। আমি এ জন্য প্রধানত রামপালকে দায়ী করছি না। তার শৈশব থেকেই এক দিকে তার মা শংখ দেবী, আর এক দিকে তার মাতুল মথনদেব তার কানে কানে মন্ত্র দিয়ে এসেছে, তোমাকে রাজা হতে হবে। এই কথা শুনতে শুনতেই বড় হয়ে উঠেছিল সে। রাজা হবার উচ্চাশা তার ছিল। তুমি জান না, অনেকেই জানে না, মহীপাল বৃথাই তাকে কারারুদ্ধ করে রাখেনি। আর যে যাই বলুক, আমি মহীপালকে এ জন্য দোষ দিতে পারি না। মহীপাল নানা ভাবে আমার সংগে দুর্ব্যবহার করেছে, এ কথা সবাই বলে। কিন্তু আমি কি তার সংগে সদ্ব্যবহার করেছি? রাজবংশের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এই সিংহাসন তারই প্রাপ্য। আর তাকে তার এই ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার জন্য এমন কোন ষড়যন্ত্র বা দুষ্কৃতি নাই যাতে আমি অংশ গ্রহণ করিনি। হরিগুপ্ত, তুমি গৌড়ের সুসভ্য নাগরিক হলেও তোমার মন এই মাটির সন্তানদের মতই পবিত্র আর বিশুদ্ধ। এ সব কথা তুমি ভাবতে পার না। কিন্তু তোমার এই শংখ বাইরে শংখ ধবল হলেও অন্তরে অন্তরে কলংকিনী।

হরিগুপ্ত বাধা দিয়ে বললেন, থাক, ও কথা এখন থাক।

কিন্তু শংখ দেবীকে থামানো গেল না। তিনি বলে চললেন, রাজপ্রসাদ ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে তুমি আমাকে রামপালের কাছে ফিরে যাবার জন্য বার বার বলে আসছ। কিন্তু আমি যাইনি, এই কটা বছর ছদ্মবেশে তোমার সংগে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তা হলে কি হোত জান? এই আমিই হয়তো মথনদেবের দক্ষিণহস্ত হয়ে শূরপালকে হত্যা করবার জন্য রামপালকে প্ররোচনা দিতাম, উৎসাহিত করে তুলতাম। সেই দুষ্কৃতি থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি।

এ কথা বিশ্বাস করি না আমি, হরিগুপ্ত দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন।

বিশ্বাস কর না? কেন কর না? আরও বলতে যাচ্ছিলেন শংখ দেবী। কিন্তু বলতে পারলেন না। হরিগুপ্ত তার প্রশস্ত করতল দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে ধরেছেন।

কিন্তু রাজা রামপালদেব এমন সময় হঠাৎ গয়ায় এসেছিলেন কেন? খবর নিয়ে জানা গেল, কয়েক বছর ধরে বহু অনুসন্ধানের পর মায়ের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে মা কৈবর্তদের হাতে মারা গেছেন। হিন্দু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে এসেছিলেন। সেই সংগে বুদ্ধ মন্দিরেও পূজা দিয়ে গিয়েছেন।

খবরটা শুনে হরিগুপ্ত বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, আর শংখ দেবী হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কৈশোরের সেই হাসির চাপল্য এখনও তাকে ছেড়ে যায় নি।

মুক্ত, এবার মুক্ত আমি, ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন শংখ দেবী, রামপাল এবার আমায় মুক্তি দিয়েছে। রাজপ্রাসাদের সংগে যেটুকু বন্ধন অবশিষ্ট ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে গেল। আজ আমার নবজন্ম।

হরিগুপ্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার রহস্য বুঝতে পারি না শংখ। একি তোমার কাছে এতই আনন্দের কথা?

শংখ দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, কেন নয়? রাজমাতার মৃত্যু হয়েছে, তার প্রেতাত্মার সদ্‌গতি ঘটল। আমি নূতন করে জন্ম নিলাম। আজ একমাত্র তুমি ছাড়া আমার উপর কারু কোন দাবী দাওয়া নেই।

ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর পথেরও শেষ নেই, চলারও ক্ষান্তি নেই। গত দশ দিন তারা একটানা চলা চলতে চলতে পীঠিরাজ্যে এসে পৌঁছলেন।

প্রাচীন মগধের দক্ষিণাংশ তখন পীঠিরাজ্য নামে পরিচিত। রাজার নাম দেবরক্ষিত। রাজা ধর্মে বৌদ্ধ।

পীঠিনগরে পৌঁছেই তাঁরা দেখলেন, নগরী উৎসবসজ্জায় সেজেছে, পথে পথে লোকের ভিড়। কি ব্যাপার, কিসের এই উৎসব, কৌতুহলী হয়ে খোঁজ করতে জানলেন, রাজার আমন্ত্রণে গৌড়রাজ পীঠিভ্রমণে এসেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এই আয়োজন। পীঠিরাজ আর গৌড়রাজ একই রথে বসে নগরী পরিভ্রমণ করবেন। তাঁদের দেখবার জন্য দলে দলে নর নারী পথের দু ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

শংখ দেবী সশংক চিত্তে বলে উঠলেন, সর্বনাশ, রামপাল। হরিগুপ্ত, ফের, ফের, আর এক মুহূর্ত নয়।

হরিগুপ্তের মুখে আকর্ণ হাসি ভেসে উঠল। বললেন, রামপালের মার মৃত্যু হয়েছে, তাঁর আত্মা সদ্‌গতি লাভ করেছে। তুমি নবজাত, রামপাল তোমার কেউ নয়, তবে তুমিই বা তার জন্য এমন দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়লে কেন?

শংখ দেবীও হেসে বললেন, পূর্বসংস্কার যে এমন করে পিছন পিছন ধাওয়া করে ফিরবে, সে কথাটা আগে বুঝিনি।

তা নেই বুঝলে, কিন্তু গৌড় যে আমাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে, সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? অতএব গৌড়রাজ বলতে বর্তমানে রামপালকে বোঝায় না, বোঝায় দিব্বোককে।

শংখ দেবী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তাই তো, এমন ভুল কি করে করলাম!

হরিগুপ্ত বললেন, ভালই হয়েছে, ঠিক সময়-মতই আমরা এখানে এসে পৌঁছেচি। এত দিন ধরে নাম শুনে আসছি দিব্বোকের, একবার স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা ছিল। গৌড়ে গিয়ে দেখব, সে সুযোগ তো আর হবে না। গৌড় বর্তমানে আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

হ্যাঁ, গৌড় আজ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেজন্য তোমার মনে দুঃখ আছে হরিগুপ্ত? শংখ দেবী প্রশ্ন করলেন।

দুঃখ? একটু দুঃখ থাকবে বই কি। যেখানে জন্মগ্রহণ করলাম,

আর সারাটা জীবন যেখানে কাটালাম, সেখানকার জন্য একটু মায়া হবে না ?

শংখ দেবী বললেন, আমার কিন্তু গৌড়ের নামে আতংক। গৌড় আমার কারাগার। সেই কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমার সামনে বিপুল পৃথিবীর দরজা খুলে গেছে। আর আমি সেখানে ফিরতে চাই না। বাইরে এসে আমি শান্তি পেয়েছি। সেখানে গেলে স্মৃতির দাহে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

হরিগুপ্ত হেসে বললেন, রামপালদেব বৃথাই তার মায়ের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে এলেন, তাঁর আত্মার সদগতি হয় নি। শংখ, তুমি কি ও সব কথা কিছুতেই ভুলে যেতে পার না ?

না, পারি না। দেখছি, মরেও আমার রেহাই নাই।

হরিগুপ্ত ইচ্ছা করেই আলাপের মোড়টা ঘুরিয়ে দিলেন, কিন্তু শংখ, এই পীঠিরাজ্য কি এক দিন গৌড়ের অধীনস্থ সামন্তরাজ্য ছিল না ?

হ্যাঁ, তাই ছিল।

কিন্তু ওরা এত সহজেই কৈবর্তদের বশ্যতা স্বীকার করল ? এ পর্যন্ত আর কোন রাজ্য এদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে তো শুনিনি।

শংখ দেবী বললেন, তুমি ভুল করছ হরিগুপ্ত, এরা কৈবর্তদের বশ্যতা স্বীকার করে নি। সম্রাট মহীপালের পতনের সুযোগ নিয়ে এরা নিজেদের স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেছে। কৈবর্তদের গৌড় এখন পীঠির মিত্ররাজ্য। তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে, কৈবর্তদের গৌড় আক্রমণের সময় এই পীঠিরাজ দেবরক্ষিতই তাদের অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা শুনেছিলাম বটে। কিন্তু এত সব কথা আমার মনে থাকতে চায় না। কিন্তু সভ্য অসভ্যের এই মিলন—এমন অঘটন কি করে ঘটল ?

এ সংসারে বহু অঘটনই ঘটে থাকে, উত্তর দিলেন শংখ দেবী, তা না হলে তুমি আর আমি যে এমন করে হাতে হাত ধরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটাই বা কেমন করে সম্ভব হোল ?

আসছেন, আসছেন, ওই যে আসছেন, বহু কণ্ঠের কোলাহল জেগে উঠল। হরিগুপ্ত বললেন, চল, শংখ আমরা ওই দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই।

দেখতে দেখতে অশ্ববাহিত সুসজ্জিত রথ ঘর্ঘর শব্দে তাদের চোখের সামনা দিয়ে চলে গেল। দু পার্শ্বের দর্শকেরা উচ্চ কণ্ঠে মহারাজ দেবরক্ষিতের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। রথ চলে যাবার সংগে সংগেই ভিড় ভাংগতে লাগল। নানা জনে নানা কথা বলে চলেছে।

দেখেছিস্, কি কালো আর কি কুচ্ছিত! আর আমাদের মহারাজ কিনা না ওর সংগেই হাতে হাত ধরে বসেছিলেন। দু জন দুজনের একেবারে বিপরীত—যেন দিন আর রাত্রি।

বিপরীত হলে কি হবে, দিন আর রাত্রি তো এমনি ভাবে পাশাপাশিই থাকে, একজন মন্তব্য করল।

কিন্তু এই হোল গৌড়ের রাজা! কোথায় সম্রাট মহীপালদেব আর কোথায় এই কৈবর্ত দিব্বোক। আমাদের মহারাজের সবই ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একটা অবিবেচনার কাজ করে বসেন! এই বর্বর কৈবর্তকে আমন্ত্রণ করে আনবার আর এভাবে সম্মান দেখাবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? এর ফলে সমস্ত সভ্য সমাজের মধ্যে তাঁর মর্যাদাহানি ঘটল। শুধু তাই নয় রাজ্যশুদ্ধ অপমান। যে কৈবর্তেরা এত কাল ধরে দাস বলেই গণ্য হয়ে আসছিল, আমরা কিনা তাকেই মাথায় তুলে নিলাম! পীঠির এই কলংক কোন দিন মুছবে না।

শুনেছি সেনাপতি ভীমযশের নাকি প্রথম থেকেই এ বিষয়ে

ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু মহারাজ তাঁর কথায় আমল দেন নি। কিন্তু সেনাপতি এই বর্বর কৈবর্তের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াতে রাজী নন। তাই কাল থেকেই অসুস্থতার নাম করে তিনি শয্যা নিয়েছেন, এ পর্যন্ত একবারও ঘর থেকে বার হন নি। কিন্তু তাঁর এই রোগের মূল কোথায়, সে কথা বুঝতে কারু বাকী নাই।

শুনছ, এরা কি সব বলাবলি করছে? হরিগুপ্ত বললেন।

শুনছি বই কি। এইটাই তো স্বাভাবিক। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি রাজা দেবরক্ষিতকে দেখে কেমন হৃদ্যতার সংগে দিব্বোকের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বসেছিলেন তিনি, যেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু! অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ হয় তো এর পিছনে রয়েছে, কিন্তু তা হলেও তাঁর মুখে আন্তরিকতার ভাব লক্ষ্য করেছি। যাই বল, দিব্বোকের মুখে কিন্তু অসাধারণত্বের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। যে কোন এক জন সাধারণ কৈবর্তের মতই। বোকা বোকা চেহারা।

কিন্তু এই সাধারণ চেহারার মধ্যে একটি আসাধারণ মানুষ বিরাজ করছে। কে জানে হয়তো তাঁর এই বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী চেহারা প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট করতে সহায়তাই করেছে।

সত্যি কথাই বলেছ তুমি, শংখ দেবী সমর্থন করে বললেন, এই বর্বর কৈবর্ত গৌড়ের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞদের নিয়ে কি খেলাই না খেলেছেন! গৌড় আক্রান্ত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বরাহস্বামীর মত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এই দিব্বোককে নিজের হাতের লোক বলেই মনে করে এসেছেন। এর চেয়ে আশ্চর্য কথা আর কি হতে পারে?

হরিগুপ্ত বললেন, আশ্চর্য শুধু সেইটাই নয়। সবাই মনে করে ছিল, আমাদের নিজেদের দলাদলির ফলেই এমন অভাবিত একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু ক'দিন ওরা টিকে থাকতে পারবে! এই মূর্খ বর্বররা রাজ্য শাসনের কি জানে! আর সবার মত আমার

মনেও সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু এই ক'বছরে কি দেখতেপাচ্ছি? ওরা ভেংগে পড়বে দূরে থাক, আরও দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আরও শুনতে পাচ্ছি ওদের সুশাসনের ফলে প্রতিবেশী স্বেচ্ছায় ওদের রাজ্যের সংগে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

শংখ দেবী তার এই কথায় সায় দিয়ে বললেন, অসম্ভব নয়। তোমার মনে আছে, বরেন্দ্রীর কৈবর্তেরা শিমূলতলীয় গোয়ালদের এই উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিল। ওরা তোমার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিল, আর তুমি—

হ্যাঁ, আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে আমার।

শংখ দেবী হেসে বললেন, এত দিন তারা হয়তো আর আমাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই। কিন্তু বিচিত্র সব কাহিনী, এমন যে ঘটতে পারে এ তো কল্পনাও করতে পারি নি কোন দিন। কে যে সভ্য আর কে যে বর্বর, সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

তারা নিজেদের কথার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন, আর কোন দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা ডাক শুনে চমকে উঠলেন। চেয়ে দেখলেন ইতিমধ্যে লোকের ভিড় কেটে গিয়ে পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ইতস্তত দু চার জন লোক যাতায়াত করছে। আর দেখলেন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের মত পীতবসনধারী এক ভিক্ষু। কাছাকাছি আর কেউ নাই, কাজেই বোঝা গেল ইনিই ডেকেছেন।

ভিক্ষু প্রশ্ন করলেন, আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা গৌড়ের অধিবাসী। আমার অনুমান কি ঠিক?

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, না, হ্যাঁ, আমরা গৌড়ের অধিবাসীই বটে।

তবে গৌড়ের সংগে আমাদের সম্পর্ক বহু কাল আগেই কেটে গেছে।

এখন কোত্থেকে আসছেন আপনারা?

আমরা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি, সম্প্রতি বুদ্ধগয়া থেকে আসছি।

ভিক্ষু খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ, আপনাদের মুখ থেকে অনেক দেশের অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে। চলুন আমাদের বিহারে। অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে আছেন। এখানে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে নিন। আপনাদের পেলে আমাদের এখানকার সবাই খুব খুশী হবেন।

শংখ দেবীর মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখা দিল। হরিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়, কতদূরে আপনাদের বিহার ?

শংখ দেবী হরিগুপ্তকে চোখের ইংগিতে কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু হরিগুপ্ত কিছু বুঝলেন কিনা বোঝা গেল না।

দূরে নয়, এই তো, এই যে হলদে রংগের উঁচু বাড়ীটা। চলুন।

হরিগুপ্ত বললেন, না, আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন যান। আমরা নগরটা দেখে নিয়ে তারপর আপনাদের ওখানে যাব।

ভিক্ষু সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, আমার এখন তেমন কোন কাজ নাই, চলুন, আপনাদের নগরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। গৌড়ের সংগে অবশ্য এর তুলনা হয় না, তবে ছোটর মধ্যে সুন্দর।

কিন্তু হরিগুপ্ত তাতে রাজী নন। তাদের দুজনের মত নৌকা, এতে তিন জন ধরে না। তিনি বললেন, না না, তার কোন দরকার নাই। আমরা নিজেরাই পারব, অনর্থক আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

বলেই হরিগুপ্ত অস্বাভাবিক রকম দ্রুততার সংগে পা চালিয়ে দিলেন। শংখ দেবীও গতিবেগ সংগ্রহ করে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে চললেন। ভিক্ষু বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই গতিশীল মূর্তি দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই শংখ দেবী অভিযোগ মাখা কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ তুমি কি করলে ?

কি করলাম আমি ? বিহারে যাবার কথা বলে এলে কেন ? না, সে কিছুতেই হবে না। তোমাকে কতদিন বলেছি—

হরিগুপ্ত হেসে বললেন, আহা, বলেছি বলেই কি বিহারে যাচ্ছি নাকি? খোলা আকাশের তলায় থেকে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে, এখন আর একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া আর কোন সময় চালার নীচে মাথা গুঁজতে ইচ্ছা করে না।

ও, তা হলে যাচ্ছ না ওখানে, বাঁচালে! শংখ দেবী পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বাঃ, দিব্যি সুন্দর মিছে কথা বলতে শিখে গেছ দেখছি। মনে আছে, আগে একটা মিছে কথা বলতে হলে তোমাকে দশ বার ঢোক গিলতে হত?

ওটা সংসর্গগুণে! পরলোকে এ জন্য যদি কোন জবাবদিহি করতে হয় তোমাকে দেখিয়ে দেব। বলব, আমি কিছু জানি না, যা বলবার ইনিই বলবেন।

বেশ তাই বোলো। এক বোঝা পাপ মাথায় নিয়ে চলেছে, তার সংগে তোমার এটুকু যোগ দিলে আমার কিই বা এসে যাবে? কিন্তু ও কথা থাক এখন। চল তাড়াতাড়ি পালাই, নইলে ওদের হাতে ধরা পড়ে যেতে হতে পারে।

পিছনে পড়ে রইল পীঠি নগর। আঁকা বাঁকা গ্রামের পথ ছাড়িয়ে শস্যে ভরা প্রান্তর, তার পর নির্জন নিষ্পাদপ কঠিন কংকরময় ভূমি, তার পর আবার গ্রাম—এমনি করে সামনে, আরও সামনে এগিয়ে চললেন তাঁরা। রাত্রি বেলা নৌকায় করে নদী পাড়ি দিয়ে চললেন। সারা রাত ধরে নৌকো চলবে, পর দিন অজানা অচেনা এক রাজ্যে পৌঁছে দেবে। ভোর হতে না হতে ঘুম ভেংগে যাবে অপর এক দেশের পাখীর কলতানে। আকাশের বুকে অজস্র তারা। তার নীচে অসীম নিস্তব্ধতা। এর তুলনা নেই। শংখ দেবী মাঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন এ নদীর নাম কি মাঝি?

মাঝি উত্তর দিল, দিস্তাং।

দিস্তাং! বাঃ সুন্দর নাম তো। শুনেছ হরিগুপ্ত, দিস্তাং!

হরিগুপ্ত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সাধারণ লোকেরা তাই বলে। তবে আমাদের সভ্য লোকেরা এর নাম দিয়েছেন ত্রিস্রোতা।

হায় ভগবান, এই সেই ত্রিস্রোতা? ত্রিস্রোতার নাম তো গৌড়ে বসেই শুনেছি। দিস্তাংই বল আর ত্রিস্রোতাই বল, দুটোই আমার মিষ্টি লাগে। আমি ভাবি নদীগুলি তাদের নাম কি নিজেরাই তাদের সংগে করে নিয়ে আসে? তা না হলে এমন মিষ্টি নাম মানুষ কোথা থেকে খুঁজে পায়?

দিস্তাং নাম কি এতই মিষ্টি? আসল কথা মানুষ তার মনের মাধুর্য যার উপর ঢেলে দেয়, তাই মধুর হয়ে ওঠে। দেখ না শংখ, কি আর এমন একটা নাম, কিন্তু আমার কাছে—

থাক থাক, শংখ দেবী একটি মিষ্টি ধমক দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

হরিগুপ্ত, যদি আজ সেই বিহারে রাত কাটাতে হোত, তা হলে কি আর এমন করে—

থেমে গেলেন শংখদেবী।

কি এমন করে?

এমন করে তোমাকে কাছে পেতাম? শুধু আমার পাশে থাক, আর কিছু আমি চাই না।

অনেক রাত্রিতে প্রায় একই সংগে দুজনে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন। উঠে বসতেই শংখ দেবী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

এ কি, কি হয়েছে, নৌকাটা এমন করে দুলছে কেন? তিনি ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন। হরিগুপ্ত অতি সন্তর্পণে তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, শুনছো না, ভীষণ ঝড় হচ্ছে।

তাই তো, কি প্রচণ্ড তার গর্জন! মনে হচ্ছে যেন এক দল দানব প্রলয় হুংকারে ধেয়ে আসছে। বুঝি দৈবী মায়ায় কোন গিরি গহ্বরের বন্দীশালায় শৃংখলিত হয়ে পড়ে ছিল। আজ কেমন করে সেই শৃংখল ছিঁড়ে, বন্দীশালার দরজা ভেংগে বেরিয়ে পড়েছে।

আজ আর ওরা কিছু রাখবে না, বিধাতার সৃষ্টিকে খান খান করে ভেংগে ফেলবে। তাদের ক্রুদ্ধ-হিংস্র ভয়াবহ গর্জন এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে যেন একই সংগে চারিদিক থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। ঝড়? এর নাম ঝড়?

শংখ দেবী তাঁর জীবনে ঝড় কি কোন দিন দেখেন নি? অনেক দেখেছেন। রাজপ্রাসাদের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ঝড়কে কতই না উপভোগ করেছেন। ঝড়ের গর্জন তাঁর মন ময়ূরের মত পেখম মেলে নেচে উঠত। কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের নীচে আর উন্মত্ত নদীর বুকে তার যে বিভীষিকাময়ী মূর্তি, এ মূর্তি আর কোন দিন দেখেননি। এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

মাঝি, মাঝি, নৌকা কূলের দিকে নিয়ে যাও, হরিগুপ্ত চীৎকার করে উঠলেন।

মাঝি কি তার চেষ্টার ক্রটি করছে! কিন্তু নৌকা এখন আর তার আয়ত্তের মধ্যে নাই, ঝড়ের মুখে তৃণের মত ছুটে চলেছে। কোথায় কত দূরে কূল তাই বা কে জানে।

ভয় করছে শংখ?

ভয়? না, ঠিক ভয় নয়, এ এক বিচিত্র অনুভূতি। এর কি নাম দেব, বুঝতে পারছি না।

ক্ষেপে গিয়েছে দিস্তাং। মত্ত ঢেউগুলি একটু বাদেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেই আঘাতে নৌকাটা থর থর করে কেঁপে উঠছে।

সাঁতার জান শংখ?

না।

হরিগুপ্ত নিজের এই প্রশ্নের উপর নিজেই হেসে উঠে বললেন, নদী যেই ক্ষেপা ক্ষেপেছে, তাতে সাঁতার জানা আর না জানার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

মাঝি এবার হতাশ হয়ে উচ্চ স্বরে দেবতার নাম করছে। তার

মাঝখানে সে একবার ডেকে বলল সাধুবাবা, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করুন। যদি তাঁরা দয়া করেন, একমাত্র তবেই রক্ষা পাওয়া যাবে। আপনারা সাধু, মহাপুরুষ, আপনাদের প্রার্থনায় কাজ হতে পারে।

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ নৌকাটা সোঁ করে ঘুরে গেল। সংগে সংগেই নৌকাটা এক দিকে কাত হয়ে যেতেই নৌকার মধ্যে ঝলকে ঝলকে জল উঠতে লাগল।

কি, কি হল মাঝি? নৌকাটা হঠাৎ এমন করে ঘুরে গেল কেন? হরিগুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

মাঝি উত্তর দিল, দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে দাঁড়টা নদীর জলে ভেসে চলে গেছে। আমার আর কিছুই করবার নাই।

আমরা কি মরতে চলেছি হরিগুপ্ত? শংখ দেবী শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

লক্ষণগুলো দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে, সেই রকম শান্ত সুরেই উত্তর এল। তবে কাছে এস আরও কাছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হব না।

আর মৃত্যুর পরে?

কি জানি, সেখানকার খবর আমার জানা নাই।

× × ×

এ অঞ্চলে এমন সাংঘাতিক ঝড় শীগ্‌গির নাকি হয়নি। বুড়োবুড়ীরা বলে, তাদের ছোট বয়সে এ রকম ঝড় এক বার হয়েছিল। ঝড়ে ঘর বাড়ী গাছপালা ভেংগে চুরে মিশমার করে দিয়েছে। বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছে।

এত সব কাণ্ড কারখানার পর নদী এখন শান্ত, লক্ষ্মীশ্রী। গত রাত্রিতে এত যে মাতামতি করেছে, এখন তাকে দেখে সে কথা কে বুঝবে!

নদীর গা ঘেঁষা চন্দ্রকোণা গ্রাম। নদীর ঘাটে এই গ্রামের লোকদের কয়েকখানা নৌকা বাঁধা ছিল। তাদের মধ্যে একখানাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের নৌকা তারা ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছিল। তাদের মধ্যে এক জনের নজরে পড়ল, নদীর জলে বস্তার মত কি একটা ভেসে আসছে। ওর মধ্যে কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া যেতে পারে মনে করে চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে সামনে টেনে নিয়ে এল। কিন্তু কাছে আনতেই আঁতকে উঠল সে—এ কি কাণ্ড কোথায় বস্তা। এ যে এক ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর মৃতদেহ। দুজনের শরীর একটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মহাঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

ষোল

কাল ব্যাধি দিব্বোকের ভিতরটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছিল। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে সে কথা জানা ছিল না। জানার মধ্যে এক জানতেন চিকিৎসক বৃদ্ধ লক্ষ্মণদাস, আর জানতেন উনছলি। লক্ষ্মণদাস অনেক দিন থেকে শেষ বয়সের নানা ব্যাধিতে ভুগে ভুগে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। তিনি যে আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারবেন, সে আশা কম। চিকিৎসক আরও আছে দেশে। তারা কাঁধের ক্ষতটাকে সারাবার জন্য নানা রকম জড়িবটি এবং মলমজাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকেন। তাতে যে একেবারেই কাজ হয় না, তা নয়, কিন্তু কয়েক দিন বাদে আবার যে সেই। যে সেই বললেও ঠিক বলা হয় না। তার কারণ রোগের রকমটা দিন দিনই খারাপ হয়ে চলেছে। কিন্তু রোগীর কথাবার্তা আর চলন এমন যে চিকিৎসকরা রোগের গুরুত্ব ধরতে পারেন না। একমাত্র বুঝতে পারেন উনছলি। কিন্তু কি করবেন তিনি! যদি সেবা দিয়েই সব রোগ সারানো যেত, উনছলি চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। কিন্তু এ যে তার হাতের বাইরে। তাই মাঝে মাঝে তার মনটা বড় বেশী উতলা হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

যতই দিন যাচ্ছে দিব্বোকের কাজ ততই বেড়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে কাজ দিয়ে তিনি তার রোগযন্ত্রনাটাকে চেপে রাখতে চান। বাইরের লোকের কাছে চাপা দিলে কি হবে, উনছলির চোখে ধুলো দিতে পারেন না। উনছলি কেমন করে তা টের পেয়ে যান, ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না তাঁর।

সে কি তবে দূরে বসেও তার প্রতিটি হৃদস্পন্দন অনুভব করতে

১৯—

পারে? যেদিন প্রথম ওকে ভালবেসেছিলেন সেদিনও উনছলি তার কাছে ছিলেন অতল রহস্যময়ী। আর এত কাল একত্রবাসের পর আজও যেন মনে হয় যে তিনি ওর রহস্যের তল খুঁজে পাচ্ছেন না। এত দিন কাজের মধ্যে এমন করে মত্ত হয়ে ছিলেন, ওর কথা মনে থাকত না, কিন্তু সে তার সংগে সংগেই ফিরত, ছায়ার মত। অনুসরণ করে চলত। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছেই পেয়ে এসেছেন। কিন্তু ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন নি এক বার। যে কথা মনে করে অনুশোচনায় ভরে আসে মন। শুধু অনুশোচনা নয় আরও কত কি ফিরে আসছে! গভীর আবেগ আর তুর্বার আকর্ষণ। এ আকর্ষণ এত দিন কোথায় ছিল? এক দিন নিজের মনে মনেই ভাবছিলেন, এত দিন বাদে সময় হারিয়ে এই উন্মাদনা কেমন করে ফিরে এল? তবে কি বাতিটার তেল ফুরিয়ে আসছে? নিভে যাবার আভাস পেয়ে সে কি তবে একবার পূর্ণ শিখায় জ্বলে উঠতে চায়? তবে জ্বলে উঠুক, উঠুক জ্বলে শেষবারকার মত।

উনছলি ভেবে পান না, সেই দুর্দান্ত ছেলেটা এত দিন কোথায় বন্দী হয়ে ছিল, কেমন করেই বা ছাড়া পেয়ে ফিরে এল? প্রমত্ত নদী তরংগের মতই সে তার বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিষেধ মানে না, বাধা মানে না, সেদিনকার সেই অবুঝ ছেলেটার মতই।

উনছলি তার সেই আদর সোহাগের অত্যাচার আনন্দ-উজ্জ্বল চিত্তে গ্রহণ করে, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন একটু শংকাও জাগে।

এক দিন মত্ততার এক চরম মুহূর্তে উনছলি বাধা দিয়ে বলল, না, না, তুমি অসুস্থ। এ তোমার শরীরে সইবে না।

পূর্ণ সুরাপাত্র সে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু অবুঝ শিশুর মত দিব্বোক সেই নিষেধ মানলেন না, আবেগের তোড়ে বাধা ভাসিয়ে নিতে চাইলেন।

ভেসেই যাচ্ছিল উনছলি, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজের মনটাকে শক্ত করে নিয়ে সে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল।

এই সুস্পষ্ট প্রত্যাখানে ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায়, দিব্বোক আড়ষ্ট কঠিন হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দেখা গেলে দেখতে পেতেন উনছলির ব্যথা-ঘন দৃষ্টি থেকে প্রিয়ার প্রেম আর জননীর সশংক স্নেহ একই সংগে ঝরে পড়েছে। কিছুক্ষণ বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন দিব্বোক, কিন্তু উনছলির চোখে ঘুম এল না।

তারপর থেকে দিব্বোক আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়লেন কাজে। কাজ-কাজ-কাজ, কাজের কি আর অন্ত আছে! ছোট ভাই রুদোকের হাতে গৌড়ের ভার ছেড়ে দিয়ে বেশীর ভাগ সময় তিনি বরেন্দ্রীতেই কাটান। কৈবর্তদের শক্তির মূল উৎস গৌড়ে নয়, বরেন্দ্রীতে। এ কথা তিনি বোঝেন, শত্রুরাও বোঝে। তাই তারা এই বরেন্দ্রীর উপরেই দু দু বার আক্রমণ করেছে। দু বারই তাদের হটে যেতে হয়েছে। ওদের নানা রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা ভাড়াটে সৈন্যেরা দুর্ধর্ষ কৈবর্ত যোদ্ধাদের সংগে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে নি। কৈবর্তদের মেয়েরা পর্যন্ত ওদের বল-বীর্যের কথা নিয়ে হাসাহাসি করে।

কিন্তু দিব্বোক জানেন, ওদের তুচ্ছ করলে পরিণামে বিপদে পড়তে হবে। এ যুদ্ধ ওরা দীর্ঘ কাল ধরে চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ এই দু পক্ষের এক পক্ষ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। কোন পক্ষ নিশ্চিহ্ন হবে, একমাত্র ভবিষ্যৎই সেকথার উত্তর দিতে পারে। বরেন্দ্রী আর গৌড়ে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে গেলে শুধু অর্থ ব্যয় করলেই চলে না, উপযুক্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন। পীঠিরাজ্য থেকে বন্ধু দেবরক্ষিত সেই অভাবটা কিছুটা পূরণ করলেন।

শেষ পর্যন্ত কোচরা তাদের সংগে প্রকাশ্যে ও পুরোপুরি যোগ দিয়েছে। তারাও দিব্বোককে তাদের রাজা বলেই মেনে নিয়েছে। কৈবর্তদের মতই সোজা সরল বুদ্ধির মানুষ, যে কথা মুখে বলে সহজে তরে নড়চড় হয় না। শুধু কোচরাই নয়, ছোট ছোট উপজাতি যারা

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে ছিল, তারাও তাদের সংগে যোগ দিতে লাগল। বরেন্দ্রীর সীমা ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলল। রাজ্য যতই বাড়ছে, দিব্বোকের কাজের দায়িত্ব ততই বেড়ে চলেছে। নানারকম লোকের নানারকম সমস্যা! আর সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য সবাই তাঁরই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকে। ফলে একটু অবসর নেই তাঁর।

উনছিল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাঁর ক্লান্ত মুখের দিকে তাকান, আর মাঝে মাঝে বলেন, তুমি কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নাও। তোমার এই শরীরে এত খাটুনি সইবে না।

দিব্বোক অগ্রাহ্যের ভংগিতে তার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিশ্রাম? বিশ্রাম নেবার সময় কোথায় এখন? একেবারেই বিশ্রাম নেব, যখন বিশ্রাম নেবার দিন আসবে। কথাটার মধ্যে কেমন একটা অশুভ ইংগিত নিহিত রয়েছে। দিব্বোকের স্বাস্থ্যহীন মুখের দিকে তাকিয়ে উনছলি শিউরে ওঠেন।

শরীরের উপর এত অত্যাচার আর বেশী দিন সইল না। রাজা দেবরক্ষিতের আমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য পীঠিরাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ রোগটা গুরুতর রূপ ধারণ করল। পীঠির বৈদ্যেরা তাঁর শরীর পরীক্ষা করে বললেন, সর্বনাশ, আপনার শরীরে যে কিছুই নেই। আপনি কিসের উপর নির্ভর করে চলছিলেন?

রাজবৈদ্য তাঁর রোগের সমস্ত ইতিহাসটা শুনে নিয়ে বললেন, আপনার কাঁধের যেখানে বাণটা ফুটেছিল, সেখানে কি এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়?

দিব্বোক মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, এখনও হচ্ছে।

বৈদ্য বললেন, আমার সন্দেহ হয়, সেই বাণের ফলায় এমন কিছু মিশানো ছিল, যা আপনার রক্তকে দূষিত করে তুলেছে। সেই দোষটা যখনই একটু উপলক্ষ পায় মাথা জাগিয়ে ওঠে। আর ভিতরে ভিতরে তা আপনাকে খেয়ে চলেছে।

রাজা দেবরক্ষিত রাজবৈদ্যকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রোগের চিকিৎসা কি ?

ধন্বন্তরীর অসাধ্য এই রোগ, উত্তর দিলেন বৈদ্য, এই বিষ এত দিন ধরে ভিতরে ভিতরে কাজ করে এসেছে। খুব শক্ত ধাতের মানুষ বলেই এত দিন দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু আর পারবেন না। যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা থেকে মনে হয়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসবে। বড় জোর আর বছর খানেক টিকে থাকতে পারেন, তার বেশী নয়।

বরেন্দ্রী আর পীঠিরাজ্য পরস্পর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু দিব্বোকহীন বরেন্দ্রীর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, বরেন্দ্রীর পরবর্তী নেতাদের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলা কত দূর সম্ভব হবে, এই চিন্তা দেবরক্ষিতের মনকে আলোড়িত করে তুলল।
বর্বর কৈবর্তদের সংগে হাত মিলিয়েছেন বলে প্রতিবেশী রাজারা তাঁর সম্পর্কে বিরূপ। গুপ্তদূতেরা সংবাদ নিয়ে আসছে, রামপালদেব পীঠিরাজ্য আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এদিকে সেনাপতি ভীমযশ এই একই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে চলেছেন। সব জেনে শুনেও কোন কিছু করবার উপায় নেই। এমন সময় এই সংবাদটা প্রচণ্ড আঘাতের মত তাঁর উপরে এসে নামল।

এর কোনই প্রতিকার নেই ? দেবরক্ষিত শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

বৈদ্য উত্তর দিলেন, সর্বশক্তিমান ভগবান যদি করেন একমাত্র তিনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। এর প্রতিকার আমাদের শক্তির বাইরে।

খোলাখুলি ভাবে তাঁর সামনে এ কথা কেউ তাঁকে বলেনি। কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে বাকী রইল না দিব্বোকের। কিছু দিন আগে থেকেই তিনি ভিতরে ভিতরে অনুভব করতে পারছিলেন যে, তার সময় এগিয়ে এসেছে। এখন মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন বরেন্দ্রীতে।

বরেন্দ্রীতে ফিরে আসবার কিছুদিন পর আবার শয্যা নিতে হোল তাঁকে। সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠবার সুযোগ পেলেন না।

অবস্থাটা বুঝতে এখন আর কারও বাকী ছিল না। দিব্বোকের সংগে যারা পীঠিতে গিয়েছিল, সেখানকার রাজবৈদ্যের চূড়ান্ত অভিমত তারাই বহন করে নিয়ে এসেছে। সে কথা লোকের মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বরেন্দ্রী আর গৌড় শোকের ছায়ায় মুহ্যমান।

তুমি আমাকে বিশ্রাম নেবার কথা বলেছিলে উনছলি, তোমার কথাই রইল। দিব্বোক হাসিমুখে উনছলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন। উনছলি করুণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, এর উত্তরে কোন কথাই বলতে পারল না। সেকি এই ভাবে বিশ্রাম নেবার কথা বলেছিল! ওর সেই বোবা দৃষ্টি দিব্বোকের বুকে যেন তীরের মতই বিঁধল। ওর দিকে তাকালে মন তীব্র অনুশোচনায় ভরে আসে। মনে হয়, এতদিন তিনি একে যেন উপেক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু উনছলি তাই নিয়ে কোন দিন ভুলেও কোন অভিযোগ করেনি। প্রথম যৌবনের সেই রংগীন দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়। তিনি কেমন ওর কাছ থেকে যেন দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু উনছলি এখনও সেই উনছলিই আছে। চিরদিনই ছিল। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যায় তাঁর। অতি তুচ্ছ সামান্য সেই সব কথা মনের প্রান্তে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে ছিল, সেগুলি এখন বিশেষ রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে।

এক দিন ওর দুটো হাত ধরে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, আমাকে মাপ কর, মাপ কর উনছলি।

উনছলি তার বেদনাঘন ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে বলল, এ কি কথা বলছ তুমি?

অনেক দিন অনেক অন্যায় করেছি তোমার উপর।

না না, কোন দিন না, আমার উপর কোন অন্যায় তুমি করনি। তুমি কি তেমন মানুষ? তুমি কি কারুর উপর কোন অন্যায় করতে পার?

কিন্তু উনছলির কথায় মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। সমাজের সমস্ত মানুষের কথা ভেবে এসেছেন তিনি, শুধু একজনের কথা ছাড়া। আর সেই এক জন, যে চিরদিন তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিল। মনের মধ্যে যে সব কথা জমে উঠেছে, তার কোন কিছুই বলা হয় না। শুধু মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে, আমার মাথাটা একটু বুলিয়ে দাও উনছলি।

আর এইটুকু কথার মধ্য দিয়ে উনছলি যেন অনেক কিছুই পেয়ে যায়।

কিন্তু এর নাম বিশ্রাম? লোকের পর লোক আসছে তাঁকে দেখতে। পুরুষেরা আসে, মেয়েরা আসে—সব বয়সের মানুষই আসে। ওরা এত দিন যে সব দেবতাকে পূজা দিয়ে আসছে, তাদের চোখে দেখা যায় না। আর যে দেবতাকে চোখে দেখা যায়, ওরা এখন তাঁকেই পূজো দিতে আসে। আসে, প্রণাম করে চলে যায়। রোগীর কাছে এত ভীড় ভাল নয়, এ কথা সবাই বলে, আবার সবাই আসে। উনছলি মাঝে মাঝে এই নিয়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু দিব্বোকের চোখে এমন নিঃশব্দ মিনতি ফুটে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

রোগীর কক্ষ যখন তখন মন্ত্রণাকক্ষে পরিণত হয়ে যায়। গৌড় থেকে মাঝে মাঝে তাঁর নির্দেশ নেবার জন্য লোক আসে। বরেন্দ্রীর রাজপুরুষরাও আসে। নানা জায়গার নানা সমাজের দলপতিরাও আসে। রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে, তাদের মুখ থেকে খুঁটে খুঁটে সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করে নেন তিনি।

এক দিন পরভু এসে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিল, রামপালদেবের মাতুল মথনদেব পীঠিরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।

তার পর? তার পর? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন দিব্বোক।

তার পর? ওরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছে। বলে একটু থামল পরভু তার পর আবার বলল, আমি তো আপনাকে প্রথমেই

বলেছিলাম, ওদের কথায় কোন বিশ্বাস নেই, ওরা আজ যা বলে, কালই তা উলটে দিতে পারে। তা ছাড়া ওদের নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়াঝাটি থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের কৈবর্তদের বিরুদ্ধে ওরা একজোট হয়ে যাবেই। মুখে যে যাই বলুক ওরা সবাই সমান।

দিব্বোক পরভূর এই কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, না না, রাজা দেবরক্ষিত তেমন লোক নন। তুমি তো সব কথা জান না, তাঁর সেনাপতি আর রাজ্যের অধিকাংশ লোক তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। রাজা দেবরক্ষিত অবশ্য মুখ ফুটে সে কথা আমাকে বলেননি। কিন্তু লক্ষণ দেখে আমার কাছে সেই রকমই মনে হয়েছিল। শুনেছি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা সেনাপতি ভীমযশ কোন দিনই ভাল চোখে দেখেন নি। আমার মনে হয় রাজা দেবরক্ষিত যাই করে থাকুন, বাধ্য হয়েই করেছেন।

অন্য সময় হলে পরভু চুপ করে এ কথাটা মেনে নিত না। কিন্তু দিব্বোকের শরীরের অবস্থার কথা বিবেচনা করে কোন প্রতিবাদ করল না।

কিছু দিন বাদে পরভুই এসে খবর দিল আবার, দেবরক্ষিতের সংগে মথনদেবের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু এইটুকুই বলল, পরভু, এই প্রসংগে আর কোন কথা বলল না। কিন্তু তার বলার মধ্যে যে ইংগিতটা ছিল তা যাকে বলা হোল তিনি ভাল করেই বুঝলেন। সংবাদটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। পীঠি ওদের হস্তগত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এটা ওদের প্রথম পদক্ষেপ। এবার গৌড় আর বরেন্দ্রীর পালা।

পীঠিরাজ্যের আত্মসমর্পণের সংবাদটা শোনার পর থেকেই কথাটা তাঁর মনে জেগেছে। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয় নি। এত বড় মারাত্মক ভুল তিনি কেমন করে করলেন ? ডেকে বললেন, পরভু শোন এখনই গৌড়ে সংবাদ পাঠাও, তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। ওরা যে কোন সময় চলে আসতে পারে। আর তোমরাও, হ্যাঁ

তোমরাও তৈরী হও। সবাইকে খবর দাও। সৈন্য যারা, তারা তো আছেই, তা ছাড়া রাজ্যের সমস্ত সমর্থ পুরুষ, যার যার হাতিয়ার আছে, তা যেন ঘসে মেজে সারাই করে রাখে। এবার কিন্তু ওরা দলে ভারী হয়ে আসবে। সবাইকে বলবে, এবার ওদের এমন করে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে যেন শীগগির আর এ মুখো হতে সাহস না করে। আর সমস্ত রাজ্যের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে জানিয়ে দেবে যদি প্রয়োজন হয় তবে মেয়েদেরও নামতে হবে।

পরভু হেসে বলল, আমাদের মুখ থেকে এই কথাই তো ওরা শুনতে চায়। তারপর এই নিয়ে পরামর্শ চলল দুজনে।

বছর খানেক ধরে একটানা শান্তি চলছে, যুদ্ধ বিগ্রহের নাম গন্ধ নাই, বড় একঘেয়ে আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল পরভুর। এবার সে একটু চাংগা হয়ে উঠল।

যাবার আগে দিব্বোক তাকে বলে দিলেন, কোচদের সমাজের মাথা যারা তাদের ক'জনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আর তোমরা ওদের জওয়ান ছেলেদের সংগে মিশে ঠিক করে নাও ওদের। তোমাদের আর ওদের মধ্যে যেন কোন ফাঁক না থাকে।

সারা রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে এই নিয়েই আলোচনা। এখানে ওখানে লড়াইয়ের মহড়া চলছে। বড়দের দেখাদেখি বাচ্চারাও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। ঘোড়সওয়ার সৈন্যেরাও মাঠে ময়দানে তাদের ঘোড়াগুলিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘোড়াগুলিও যেন যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সারা দেশ জুড়ে বয়ে চলেছে উত্তেজনার ঢেউ। কৈবর্তেরা চিরদিনই উৎসবপ্রিয়। এও যেন তাদেব একটি উৎসব।

দিব্বোক বলেছিলেন, ওরা আক্রমণ করতে আসছে। সমস্ত দেশের মানুষ কথাটাকে সুনিশ্চিত সত্য হিসাবেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। দিব্বোক যখন বলেছেন তখন আসবেই। দিব্বোক এ পর্যন্ত যে সব কথা বলেছেন, তার কোনটা মিথ্যা হয়েছে, এমন কথা কেউ স্মরণ

করতে পারে না। দেখতে দেখতে দু দুটো মাস কেটে গেল। কিন্তু কোথায় আক্রমণ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। প্রতীক্ষার দুঃসহ ভারে অস্থির হয়ে উঠল মানুষ। এত প্রস্তুতি, এত আয়োজন, এই হোল তার পরিণতি! এ ভাবে কত দিন চলে! শক্ত করে আঁটা ধনুকের গুণের মত উত্তেজিত মানুষগুলি সময়ের সংগে সংগে ঢিলে হয়ে আসতে লাগল। বড় মনঃক্ষুণ্ণ হোল পরভু। তার মত আরও অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হোল।

দিব্বোক তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এই সব কথাই ভাবছিলেন। আজও সকালে পরভু হতাশ কণ্ঠে তাঁর মনের দুঃখ জানিয়ে গিয়েছে, কই, এল না তো ওরা? এই হতাশার সংগে মৃদু একটু অভিযোগের সুরও মিশে আছে, সে কথা বুঝতে বাকী ছিল না তাঁর। তিনি হেসে বললেন, না আসাটাই তো ভাল। পরভু এ কথার কোন উত্তর দিল না। কিন্তু না আসাটা যে ভাল, তার মুখ দেখে সে কথাটা মনে হোল না।

পরভুর কথাটা শুধু পরভুরই কথা নয়, এটা যে তাঁরও নিজের মনের কথা। দিব্বোক মনে মনে এই নিয়েই জল্পনা কল্পনা করছিলেন। ওরা যখন আক্রমণ করবেই তখন এ রকম প্রস্তুত অবস্থার মধ্যে সেটা হয়ে গেলেই ভাল। এখানকার মানুষের মনোবল এমন উঁচু স্তরে আর কোন দিন ওঠে নি, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও সেই কথাটা তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। আয়ুর সূত্রটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, কখন একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে ছিঁড়ে যাবে কে জানে! তার আগে শক্তি পরীক্ষাটা দেখে যাবার জন্য ভিতরে ভিতরে খুবই আগ্রহ ছিল তাঁর।

এমন সময় ডুব ডুব করে ঢোলের শব্দ ভেসে এল। উনছলি পাশে বসে মাথায় বাতাস করছিলেন। ও কিসের শব্দ উনছলি? দিব্বোক জিজ্ঞাসা করলেন।

উনছলি উত্তর দিল, আর ক'দিন বাদেই যে ওলান ঠাকুরের পরব।

ও, হো, আর কদিন বাদেই ওলান ঠাকুরের পরব। কি আশ্চর্য,

সে কথা যে মনেই ছিল না তাঁর। আর কেউ মনে করিয়েও দেয় নি।

পরবের কথা মনে করতে গিয়েই হঠাৎ সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল, যাকে তিনি প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। সে কথাটা মনে করতেই প্রাণটা কেমন অস্থির হয়ে উঠল। চোখ বুজে শুয়েছিলেন, সেই অবস্থাতেই ডাকলেন, উনছলি ?

উনছলি ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, কি ? কি বলছ ?

এবার ওরা বলির জন্য যে মানুষ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে, সে কি বয়স্ক না কমবয়সী ?

উনছলির মনে পড়ল, আসল কথাটাই তো বলা হয় নি। সে বলল, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, এবার থেকে নরবলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই জন্যই কোন মানুষ নিয়ে আসা হয় নি। কথাটা আজই আমি শুনলাম।

দিবেবাক চমকে উঠে বললেন বলছ কি তুমি, নরবলি বন্ধ করে দেওয়া হবে ? কিন্তু কেন ? কেন ? বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তিনি উনছলির মুখের দিকে তাকালেন।

উনছলি ধীরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, তোমার আপত্তি আছে বলে, তুমি দুঃখ পাও বলে।

দিবেবাক আবার তাঁর দু চোখ বুজলেন। তিনি কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। একটু পরেই তাঁর নিজের অজান্তে তাঁর দু চোখ থেকে দু ফোঁটা জল বেরিয়ে এল। উনছলি অবাক হয়ে দেখলেন, দিবেবাকের চোখে জল ! তার জীবনে এমন আর কখনও দেখেননি। পরম স্নেহে তার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে উনছলি প্রশ্ন করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

কষ্ট ? কই না তো।

তবে তোমার চোখে জল কেন ?

চোখে জল ? ও কিছু না। উনছলি, আজ আমার কি আনন্দের দিন ! এত আনন্দ আমি ধরে রাখতে পারছি না, তাই বুঝি চোখের জল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা উনছলি, আমি দুঃখ পাই বলে ওরা এত দিনের নরবলি বন্ধ করে দিল ! এত ভালবাসে ওরা আমাকে? উনছলি উত্তর দিল, তোমাকে ভালবাসবে না তো কাকে ভালবাসবে ? তোমার মত আপন লোক ওদের আর কে আছে ?

শুয়ে শুয়ে পরবের কথা ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তাঁর চিন্তাটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর এগোতে পারলেন না। গৌড়ে প্রথম পরব অনুষ্ঠানের সময়কার একটা ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল—রাজধানীতে পরবের প্রথম অনুষ্ঠানের সময় রাজপথে যে দৃশ্য দেখেছিলেন। দেখেছিলেন মেয়ে পুরুষ মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, কেউ বা ভাল-মন্দ বোধ বিবেচনা হারিয়ে পাগলের মত মাতামাতি করছে। শুধু দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই একই ছবি। এটাই কৈবর্তদের চিরাচরিত প্রথা, চলে আসছে। সেদিন ওদের এই অবস্থায় দেখে তার মনে হয়েছিল, শত্রুপক্ষের কাছে এ কথা তো অজানা নয়, কৈবর্তদের তারা ভাল করেই চেনে। এই সুযোগ নিয়ে ওরা যদি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কে তাদের প্রতিরোধ করবে !

এত দিন শত্রুরা বিপর্যস্ত ছত্রভংগ হয়ে ছিল, হয়তো সেইজন্যই এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারেনি। কিন্তু এবার ওরা ভাল করে আঁট ঘাট বেধেই আসছে। তার ওপর পীঠিরাজ্যের সৈন্যবল এবার ওদের পক্ষে। কৈবর্তদের শক্তি কোথায় আর দুর্বলতার স্থানই বা কোথায়, পীঠিরাজ্যের সেনাপতির কাছে তার কোন কথাই অজানা নেই। কে জানে হয়তো সেই জন্যই তারা এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আসছে।

এই আশংকাটা বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল তাঁর মনে। এমন আকস্মিক যে মনে হোল এটা তাঁর নিজের চিন্তা নয়, আকাশ থেকে

দৈববাণীর মতই নেমে এসেছে। যা ছিল কল্পনা, তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেল। দলপতিদের ডাকিয়ে এনে বললেন, আমার বিশ্বাস এই পরবের দিনটিকে বেছে নিয়েই ওরা আক্রমণ করবে। সেই জন্য সৈন্য যারা, আর যারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে চায় তারা যেন একমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু মদই খায়, তার বেশী খেয়ে মাতাল হয়ে না পড়ে। শত্রু যখনই আসুক, তারা যেন আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায়।

বিশ্বাস করবার শক্তি সবার নয়। দু' মাস কাল অপেক্ষা করে করে ওদের মনের বাঁধুনিটা একটু আলগা হয়ে এসেছে। এ কথা সবাই স্বীকার করল, সে দিনটায় আক্রমণ হলে বিপদের কথাই। কিন্তু এত ভেবে কি ওরা কাজ করবে? বছরের এমন একটা দিন অপ্রমত্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতে হবে, এ যে কি কঠিন পরীক্ষা কৈবর্ত ছাড়া এ কথা আর কে বুঝবে! কিন্তু তা হলেও মৃত্যুপথযাত্রী নেতার এই শেষ ইচ্ছা ওরা অপূর্ণ রাখবে না। তাঁর কথায় ওরা সবাই সম্মতি জানিয়ে গেল।

নতুন করে যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়ে গেল আবার। তারই ডামাডোলের আড়ালে পরবের ঢোলের ডুমুডুমু শব্দ চাপা পড়ে গেল। দিবেবাকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কারও কারও উপর মন্ত্রের মতই কাজ করছে। রাজা যখন বলেছেন, তখন না হয়ে পারে না। পরবের আর ক' দিন বাকি, তারা অধীরভাবে গুণে চলে। প্রতিবারেই এমনি করেই গোণে কিন্তু অন্যবারের সংগে এবারের তুলনা হয় না।

রাজার কথা কখনও মিথ্যা হয় না, এ বারেও সেই কথাটাই প্রমাণ হয়ে গেল। পরবের আগের দিন বিকাল বেলা উনছলি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, ওরা আসছে! আক্রমণ করতে আসছে!

ওরা কারা, সে প্রশ্ন করা বাহুল্যমাত্র। ওরা বললে কাদের বোঝায় বরেন্দ্রীর শিশুরাও তা জানে।

উঠে বসবার শক্তি ছিল না দিবেবাকের, কিন্তু খবরটা শোনার সংগে

সংগেই কেমন করে উঠে বসলেন। উঠে দাঁড়াতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু পা দুটো ফুলে বিষম ভারী হয়ে গেছে, তারা তার নির্দেশ মানল না। এ কি, এ কি, কি করছ! বলে উনছলি ব্যাকুল পক্ষিণীর মত দুই ডানা মেলে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তার পর আস্তে করে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে তার শিয়রের কাছে বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে পরভু আর তার দুজন সংগী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। ওদের চোখে মুখে প্রবল উত্তেজনা। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওরাও সেই একই কথা বলে উঠল, ওরা আসছে। ওরা আসছে।

সতের

পরাজিত শত্রুরা ছত্রভংগ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। রাজধানী গৌড় আর বরেন্দ্রীতে একই দিনে ওরা আক্রমণ করেছিল। দু জায়গা থেকেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছে। রাজা দিব্বোকের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আক্রমণের জন্য ওলান ঠাকুরের পরবের দিনটাকেই ওরা বাছাই করে নিয়েছিল। কিন্তু ওরা যে আশা করেছিল, সে আশায় ছাই পড়েছে। গৌড় আর বরেন্দ্রীর কৈবর্তেরা ওদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। শত্রুপক্ষের প্রচুর সৈন্য হত হয়েছে। কৈবর্তেরা ওলান ঠাকুরের প্রাপ্য নরবলি এবারকার মত স্থগিত রেখেছিল, কিন্তু সে জন্য ওলান ঠাকুরের মনঃক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটেনি, পরের দিন বহু নরবলি পড়েছে এবার। কিন্তু কৈবর্তদের যা ক্ষতি হয়েছে তাও কম নয়। এ ঘা শুকোতে বেশ কিছু কাল সময় লাগবে। তবে এই বিপুল সাফল্যের মুখে তাই নিয়ে কেই বা মন খারাপ করে বসে থাকতে পারে!

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও উৎসব তেমন করে জমল না। সব কিছুর মূলে যিনি, তাঁর জীবনপ্রদীপ একটু একটু করে নিভে আসছে। এ বাতি যখন নিভে যাবে, তারপর? লোকে বলাবলি করে, রাজা দিব্বোক কি মানুষ? তিনি নর দেহে দেবতা। কখন কি ঘটবে না ঘটবে, তিনি দূরে বসেও তা দেখতে পান। শত্রুদের মনের গোপন কথাও তাঁর কাছে অজানা থাকে না। তাঁর জোরেই কৈবর্তদের জোর। তাঁর অবর্তমানে কি গতি হবে তাদের? আসন্ন শোকের ছায়া দীর্ঘায়ত হয়ে নেমে আসছে বরেন্দ্রীর বুকে।

গৌড় থেকে রুদোক, তার ছেলে ভীম আর বিশিষ্ট লোকেরা শুধু

যুদ্ধ জয়ের শুভ সংবাদ দেবার জন্যই যে এসেছেন, তা নয়, দিব্বোককে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। প্রতি দিনের সূর্য দিনশেষে অস্ত যায়, রাত্রি অন্তে আবার তার উদয় হয়। কিন্তু এ সূর্য যদি অস্ত যায় আর তার উদয় হবে না। আর দিব্বোকহারা কৈবর্ত সমাজের অবস্থা যে সূর্যহারা পৃথিবীর মতই করুণ।

রুদোকের ছেলে তারুণ্যের প্রতিমূর্তি ভীম। এ বংশের একমাত্র বাতি। সকলের আদরের ধন, নয়নের মণি। এবারকার গৌড়ের যুদ্ধে তার খুবই সুনাম হয়েছে। দিব্বোকের কাছে বসে যুদ্ধের সেই কাহিনীই সে শোনাচ্ছিল। জীবনের এই সন্ধি সময়ে সিংহের মাথায় কেশর গজায়, ময়ূরের পেখমে বর্ণচ্ছটা জেগে উঠে, আর মানুষ তার নিজের কৃতিত্ব আর গৌরবের কথা নানা ভাবে প্রকাশ করতে চায়। সবাই করে থাকে। ভীমও তাই করছিল। দিব্বোক ধৈর্য ধরে তার কথা শুনছিলেন, আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। গৌড় থেকে যারা এসেছেন, তাঁরাও গোল হয়ে বসে শুনছিলেন। দিব্বোক নিঃসন্তান, ভবিষ্যতে এ রাজ্যের শাসনভার তারই হাতে আসবে, এ বিষয়ে ভীম যে খুবই সচেতন, তার কথার মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত।

দেশরক্ষা সম্পর্কে তার নানা রকম পরিকল্পনা আছে। তারই একটা নিয়ে সে আপাতত আলোচনা করছিল। বলছিল, সমস্ত রাজ্যটাকে একটা প্রশস্ত আর উঁচু জাংগাল তুলে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। জাংগালের ওপারেই থাকবে পরিখা। এ ভাবে একবার রাজ্যকে সুরক্ষিত করে তুলতে পারলে তখন আর শত্রুদের আক্রমণের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না।

যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে একজন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, এ কি কখনও সম্ভব ? প্রাচীর তুলে নগরীকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা সর্বত্রই আছে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত রাজ্যকে জাংগাল দিয়ে ঘিরে রাখা, এমন কথা কেউ কোন দিন শোনেনি।

ভীম এ কথার প্রতিবাদ করে বলল, যা কোন দিন হয়নি, তা যে

কখনোই হবে না, হতে পারে না, এ কি একটা কথা হোল? ওদের গৌড় যে কোন দিন আমাদের হাতে আসবে, আর আমাদের লাথি খেয়ে ওরা কুকুরের মত পালিয়ে যাবে এমন কথাই কি কেউ কোন দিন ভাবতে পেরেছিল? আমরাও না, ওরাও না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হোল? যা কেউ ভাবতে পারেনি, তেমন ঘটনা ঘটিয়ে ছাড়লাম তো আমরা। তবে?

ভীম সমর্থনের আশায় দিব্বোকের মুখের দিকে তাকাল।

ভীমের উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে দিব্বোকের মায়া লাগল। তিনি বললেন, কোন দিন হয় নি বলে যে তা হতে পারে না, এটা সত্য নয়, ভীম ঠিকই বলেছে কথাটা। ভবিষ্যতে এ রকম জাংগাল তোলা যদি সম্ভব হয় আর সেটা সত্যসত্যই কাজে আসে, তবে তা করবে না কেন? কিন্তু ভীম, এই জাংগালের চেয়েও শক্তিশালী মানুষের জাংগাল, সে কথাটা ভুলে যেও না যেন। সব চেয়ে বেশী নজর রাখতে হবে তার দিকে।

মানুষের জাংগাল! সে আবার কি? ভীম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, মনের সংগে মন গেঁথে গেঁথে এই মানুষের জাংগাল গড়ে তুলতে হয়। আমরা কৈবর্ত, কোচ এবং আরও অন্যান্য জাতের মানুষদের মন গেঁথে গেঁথে এই জাংগাল তুলতে পেরেছিলাম বলেই, ওরা এই জাংগাল ভেদ করে ঢুকে পড়তে পারেনি। কিন্তু আরও অনেক দৃঢ়, অনেক সুগঠিত করে তুলতে হবে একে। মাটি-পাথরে গড়া জাংগালের চেয়েও এই জাংগালের শক্তি অনেক বেশী। যত দিন এই জাংগাল ঠিক থাকবে, তত দিন আমাদের ভয় নেই।

ভীম এ কথার তাৎপর্য কতটুকু বুঝল, বোঝা গেল না। রুদোক দিব্বোকের কথায় সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এই শক্তিই যে সব চেয়ে বড় শক্তি সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। বরেন্দ্রী আর গৌড়ের মানুষ এবার যে একতার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। ওরা

এবার ভাল করেই বুঝে গেছে, আমাদের মধ্যে কোন ফাঁক নেই, এখানে প্রবেশ করতে হলে মাথা ঠুকে মরাই সার হবে।

ভুল, ভুল বলছ রুদোক, আজ না হয় ফাঁক নেই, তাই বলে সব সময়ই ঠিক এমনি থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে? আর আমরা যে যাই ভাবি না কেন, ওই পরাজয়কে ওরা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে না। ওরা সব সময় চেষ্টা করে চলবে যাতে আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ বাঁধিয়ে তুলে ফাটলের সৃষ্টি করে তুলতে পারে। আমরা যদি এ বিষয়ে সব সময় সতর্ক না থাকি, এই প্রাচীর ধ্বসে পড়তে সময় লাগবে না। এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না, কুটবুদ্ধি আর ধূর্ততার দিক দিয়ে ওদের তুলনায় আমরা নিতান্ত শিশু।

যুদ্ধ জয়ের পর একে একে অনেকেই তার সংগে দেখা করতে এল। কিন্তু এবারকার বরেন্দ্রীর যুদ্ধে যাদের ভূমিকা সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য সেই দুইজনই আসেনি। একজন পরভু। তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় দারুণভাবে জখম হয়েছিল সে। প্রাণে বেঁচেছে এই ভাগ্য। তার সেরে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

আর এক জন আকন। সবাই বলে, আকনই এবার যুদ্ধের শেষ রক্ষা করেছে। সে না থাকলে কি যে হোত বলা যায় না। পরভু যখন সামনের সারিতে যুদ্ধ করতে করতে জখম হয়ে পড়ল, শত্রুসৈন্য উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, আর সমস্ত কৈবর্ত সৈন্য পরভুকে পড়ে যেতে দেখে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে পড়ল। পরভু নেই, কে তাদের পরিচালনা করবে? সেই সংকটমুহূর্তে কোথা থেকে ছুটে এল আকন, পরভুর শূন্য জায়গাটা দখল করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। তরোয়ালের মুখে বিদ্যুৎ শিখার সঞ্চার করে আগুনের হলকার মত সে শত্রু সৈন্যের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। এই দুঃসাহসিক আক্রমণে ওরা কেমন বিহ্বল হয়ে দু দিকে সরে গেল, ফলে ব্যূহের মধ্যে একটা ভাঙনের সৃষ্টি হোল। ইতিমধ্যে কৈবর্তেরা তাদের সম্বিত ফিরে

পেয়েছে। তাদের উন্মত্ত সেনাপতির মত তারাও উন্মত্ত হয়ে সেই রন্ধ্র পথ ধরে ছুটে চলল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে ওদের ব্যূহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেংগে গেল।

এমন দ্রুত এমন একটা পরিণতি ঘটে যেতে পারে, এটা কোন পক্ষই ধারণা করতে পারে নি। সেই থেকে আকনের নাম সকলের মুখে মুখে।

আকন নিজে থেকে এল না। দিব্বোক একে ওকে দিয়ে খবর পাঠালেন, তবু সে এল না। এ কেমন মানুষ, অবাক হয়ে ভাবলেন দিব্বোক। কত লোক আসছে তার হাত থেকে পুরস্কার নেবার জন্য, তার মুখের প্রশংসা শুনবার জন্য, আর আকনকে খবর দিয়েও আনানো যায় না, যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আকনের নাম তার কাছে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে পরভুর মুখে ওর অনেক প্রশংসা শুনেছেন। তরোয়াল পরিচালনায় ওর মত দক্ষ হাত নাকি এখানে দ্বিতীয় একটি নেই। আর তার হাতের তীর অব্যর্থ।

এমন একটা যোদ্ধা অথচ তার সংগে আলাপ পরিচয় হওয়া দূরে থাক, এক দিনের জন্যও দেখা হয়নি! এটাই বা কেমন করে হোল? এত মানুষের সংগে তার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কিন্তু আকনের মত লোকের সংগে তার পরিচয় নেই, এরই বা কারণ কি?

তাঁর পীড়াপীড়ির ফলে এক দিন কয়েক জন মিলে তাকে যেন ধরে বেঁধে নিয়ে এল। আকন চোখ তুলে তাকাতে চায় না, মুখ ফুটে কথা বলতে চায় না। কয়েক বার প্রশ্ন করবার ফলে সে শুধু এইটুকুই বলল, ওদের ঘর থেকে চলে যেতে বলুন।

দিব্বোক বুঝলেন, এর পিছনে অবশ্য কোন গভীর রহস্য আছে। তাঁর নির্দেশে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তাতেও মন মানল না আকনের। সে উঠে গিয়ে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে দিব্বোকের শয্যার পাশে খালি মেঝের উপর বসে পড়ল।

ওখানে নয়, ওই যে আসন রয়েছে, ওখানে উঠে বসো আকন। দিব্বোক স্নেহের স্বরে বললেন।

আকন যেমন ছিল তেমনি বসে রইল, একটু নড়ল না পর্যন্ত। দিব্বোক লক্ষ্য করলেন, সে যেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মাথা নীচু করে বসে আছে, তাঁর চোখের সংগে চোখ মিলাতে চাইছে না। তাঁর কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল।

তার এ-রকম ব্যবহারের কারণ কি সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে তিনি বললেন, আকন, সবাই বলছে, এবারকার যুদ্ধে তোমার কৃতিত্বই সব চেয়ে বেশী, সব চেয়ে বড় সম্মান তোমারই প্রাপ্য। তুমিই বল, কি পুরস্কার তোমাকে দিতে পারি। আকন মাথা তুলল না, ওই ভাবেই বলল, যদি দিতে চান, আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিন।

চমকে উঠলেন দিব্বোক। পাগল হয়ে গেল নাকি ছেলেটা! এ কি বলছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন, এ অদ্ভুত প্রার্থনা কেন তোমার ?

আমি জঘন্য অপরাধে অপরাধী। অপরাধের দণ্ড না পাওয়া পর্যন্ত আমি তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে মরছি। এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না।

দিব্বোক লক্ষ্য করলেন, তার গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে।

এমন কি অপরাধ করেছ তুমি ? সব কথা খুলে বল আমাকে।

আকন মাথা তুলে কি বলতে গেল, কিন্তু কোন কথা না বলে আবার মুখ নীচু করল।

বল, বল, আমার কাছে বলতে দ্বিধা কোরো না। আমি মৃত্যুপথযাত্রী। আজ আছি কাল নাই, আমার কাছে কোন কথা বলতে সংকোচ কোরো না।

এই কথার উপর ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল আকন। এমন একটা পরিস্থিতির জন্য দিব্বোক একেবারেই প্রস্তুত

ছিলেন না। তিনি হতবুদ্ধির মত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ, শেষে বললেন, কি হয়েছে আকন ?

আপনার এই অবস্থা আমারই দুষ্কর্মের ফলে। সে কথা আপনি জানেন না, কেউ জানে না, শুধু জানি আমি। বুদ্ধির ভুলে, যে কাজ করে বসেছি আমি, এখন কেমন করে তাঁর প্রতিকার করব। সারা দেশের মানুষ যে আজ কেঁদে মরছে, সে তো আমার জন্যই। আমি পাপী, মহাপাপী।

কি বলতে চাইছে আকন, দিব্বোক তখনও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে একটা সন্দেহ জাগল। তিনি ডাকলেন, কাছে এসো আকন, আমি জোরে কথা বলতে পারছিনে।

আকন তার মাথার কাছে এগিয়ে এসে বসল।

সেই বাণটা কি তুমিই মেরেছিলে আকন ?

আকন খাটটার উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দিব্বোক এই কান্নার মধ্য দিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন।

কিন্তু তুমি কোন অন্যায় কর নি।

অন্যায় করিনি ? আকন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

মোটেই না। তোমার বিবেক যেটা ন্যায় বলে মনে করেছিল, তুমি সে দিন তাই করেছিলে। তবে তুমি বুঝতে ভুল করেছিলে, কিন্তু সে দোষও তোমার নয়। এমন ক্ষেত্রে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু সেই অজানা লোকটির কথা বহুদিন. ভেবেছি। বিশ্বাস করবে তুমি, আমার মনে তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। ভীষণ আগ্রহ ছিল তাকে দেখবার। কত দিন কত লোককে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ বলতে পারে নি।

কেমন করে বলবে। আমার একটি মাত্র বন্ধু ছিল যে এই কথাটা জানত। সে দিন সেও আমার সংগেই ছিল। কিন্তু গৌড় অধিকারের সময় যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সে মারা যায়।

দিব্বোক বললেন, জান আকন, আমি কি আগ্রহ নিয়ে তোমাকে

খুঁজছিলাম। মরবার আগে তোমার দেখা পেয়ে বড় সুখী হোলাম। কিন্তু ওসব কথা ভুলে যাও তুমি।

ভুলে যাব? কেমন করে ভুলে যাব? আমার সেই বন্ধু আমাকে তীরের মুখে বিষ মাখাতে নিষেধ করেছিল, কেন আমি তার কথা শুনলাম না! তা হলে তো এমন হোত না। সেই কথা ভেবে ভেবে আমার অন্তর বলে যাচ্ছে, এই জীবন আমি আর বইতে পারছি না। এর পর থেকে যখনই আমি যুদ্ধে গিয়েছি, প্রতিবারই মরার সংকল্প নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, ডাইনে-বাঁয়ে কত লোক মরে, কিন্তু আমি কিছুতেই মরি না! এ কেমন প্রাণ আমার!

মরবার জন্য এমন অস্থির হয়ে উঠেছ কেন আকন? তুমি ছিলে, তাই এবার বরেন্দ্রী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এ কথা সবাই বলছে। তোমাদের মত বীরের উপর নির্ভর করছে বরেন্দ্রী আর কৈবর্তদের ভবিষ্যৎ। ও সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেশের জন্য কাজ কর। আমার অসমাপ্ত কাজের ভার বুঝে নাও তোমরা, তাহলে মরবার আগে তোমাদের দিকে চেয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে পারব।

বুকের মধ্যে এমন জ্বালা নিয়ে মানুষ কাজ করতে পারে! আমি তা পারব না। এত কাল যা গোপন করে এসেছি, আমি এখন তা সমাজের সকলের কাছে প্রকাশ করে বলব। তারাই আমার বিচার করুক।

না না, তা হবে না। দিব্বোক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। আকন, তুমি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাই না?

হ্যাঁ, উত্তর দিল আকন।

তবে তার পরিবর্তে আমি তোমার জীবন চাই।

আমার জীবন দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

বেশ, ভাল কথা তোমার জীবন নিয়ে নিলাম আমি। তোমার জীবন এখন থেকে আর তোমার নয়, আমার। আমার আদেশ রইল,

এই জীবন তুমি দেশের কাজে বিলিয়ে দেবে। আর যে গোপন কথা তুমি আজ আমার কাছে প্রকাশ করলে, তা তোমার আর আমার মধ্যেই থাক, আর কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার একথা তুমি রাখবে।

আকন কথার কোন উত্তর দিল না।

দিব্বোক গভীর স্বরে বললেন, আকন, কথা শোন। বিশ্বাস কর, সত্যসত্যই আমি মরতে চলেছি। এই শেষবার, আর কোনদিন তোমাকে কোন অনুরোধ করতে পারব না। প্রতিজ্ঞা কর, আমার এ কথা তুমি রাখবে।

আকন এবার আর নিঃশব্দ হয়ে থাকতে পারল না, বলল, হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যা বললেন, আমি সেই মতই করব।

দাও, এবার দরজাটা খুলে দাও। ওরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, ঘরের ভিতরে চলে আসুক।

...বাংলাদেশের বরেন্দ্রী বলতে যা বোঝায় তার নাম ছিল এককালে কট্টলি। কট্টলি আর সূর্যের সন্তান বরেন্দ্রীর কৈবর্তরা। কৈবর্তদের বাহুতেজের আগুনকে ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়ার জন্য এদের সঙ্গে এক অলিখিত চুক্তি করেছিলেন পরম ভট্টারক প্রথম বিগ্রহপাল। কিন্তু রাজনীতির কৌশলে এই চুক্তি প্রথা রদ হয়ে গিয়েছিল। ভেদনীতি দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ কৈবর্তদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরবর্তী গৌড়াধিপতিরা চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছিল।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে গৌড়ে তখন ভাঙনের প্লাবন। নির্বিষ কৈবর্তরা এই ভাঙনের মুখে যেন দাবানল ছড়িয়ে দিল। প্রধান অমাত্যর হাতের পুতুল মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভীষণ আত্মকলহ বঙ্গভূমির প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা মহীপালের প্রধান অমাত্য হিন্দু বরাহস্বামী তাতে ইন্ধন দান করেছিলেন।

গৌড়ের আর্যরক্ত বংশোদ্ভবদের বিরুদ্ধে কৈবর্তর হুঙ্কার। সঙ্গে পীঠিরাজের ষড়যন্ত্র মহীপালের বিরুদ্ধে। চারদিকে একটা চাপা অরাজকতা। এই অরাজকতার সুযোগে কৈবর্ত হৃদয়রাজ দিব্বোক আঘাত হানলেন কঠিন। আর্য নীল রক্ত অঝোরে ঝরল। বহুদিনের বঞ্চিত মানুষরা ইতিহাসের নিয়মানুসারে মিনারের মাথায় হাত রাখল। এ যেন এক অসম্ভব সম্ভব হওয়া।

বঞ্চিত মানুষ কৈবর্তদের জীবন সংগ্রাম আর গৌড়বাসীদের অত্যাচারে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ রাজার তরুণী পত্নীর পরকীয়া প্রেম। জীবনের উপান্তে এসে যে প্রেম দেখল পলাশের গাছে গাছে আগুনের নেশা। সেই নেশায় মাতাল শঙ্খদেবী ও রাজবৈদ্য হরিগুপ্ত।

বাংলা দেশের ইতিহাসে কৈবর্তদের অভ্যুত্থান নিয়ে রচিত এই উপন্যাস এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ওপার বাংলার কথা সাহিত্যিক সত্যেন সেন তাঁর ক্ষমতার নতুন সংযোজন দেখিয়েছেন গ্রন্থটিতে। উত্তেজনাময় শাণিত বুদ্ধিদীপ্তিতে ভাস্বর এমন ঐতিহাসিক রচনা খুবই বিরল। আশা করি বিদ্রোহী কৈবর্ত আপনাদের বিদগ্ধ পাঠক মনে এক বিশেষ রেখাপাত করতে সক্ষম হবে।...